দৃষ্টি প্রদীপ

বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়

দৃষ্টিপ্রদীপ

বিভুতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ ১ ॥

জ্যাঠামশায়দের রান্নাঘরে খেতে বসেছিলাম আমি আর দাদা। ছোট কাকীমা ডাল দিয়ে গেলেন, একটু পরে কি একটা চচ্চড়িও নিয়ে এলেন। শুধু তাই দিয়ে খেয়ে আমরা দু'জনে ভাত প্রায় শেষ ক'রে এনেছি এমন সময় ছোট কাকীমা আবার এলেন। দাদা হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে—কাকীমা, আজ মাছ ছিল যে, মাছ কই?

আমি অবাক হয়ে দাদার মুখের দিকে চাইলাম, লজ্জা ও অস্বস্তিতে আমার মুখ রাঙা হয়ে উঠল। দাদা যেন কি! এমন বোকা ছেলে যদি কখনো দেখে থাকি! আমার অনুমানই ঠিক হ'ল, কাকীমা একটু অপ্রতিভের স্বরে বললেন—মাছ যা ছিল, আগেই উঠে গেছে বাবা, ওই দিয়ে খেয়ে নাও। আর একটু ডাল নিয়ে আসবো?

দাদার মুখ দেখে বুঝলাম, দাদা যেন হতাশ হয়েচে। মাছ খাবার আশা করেছিল, তাই না পেয়ে। মনটায় আমার কষ্ট হ'ল। দাদা দেখেও দেখে না, বুঝেও বুঝে না—দেখছে এখানে আমরা কি অবস্থায় চোরের মত আছি, পরের বাড়ি, তাদের হাত-তোলা দু মুঠো ভাতে কটি ভাইবোন কোনরকমে দিন কাটিয়ে যাচ্চি, এখানে আমাদের না আছে জোর, না আছে কোন দাবি—তবুও দাদার চৈতন্য হয় না, সে আশা ক'রে বসে থাকে যে এই বাড়ির অন্যান্য ছেলেদের মত সেও যত্ন পাবে, খাবার সময়ে ভাগের মাছ পাবে, বাটি-ভরা দুধ পাবে, মিষ্টি পাবে। তা পায়ও না, না পেয়ে আবার হতাশ হয়ে পড়ে, আশাভঙ্গের দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক চায়—এতে আমার ভারি কষ্ট হয়, অথচ দাদাকেও আসল অবস্থাটা খুলে বলতে পারিনে তাতেও কষ্ট হয়।

দাদা বাইরে এসে বললে—মাছ তো কম কেনা হয়নি, তার ওপর আবার মাঠের পুকুর থেকে মাছ এসেছিল—এত মাছ সব হারু আর ভুন্টিরা খেয়ে ফেলেচে! বাবারে, রাক্কোস্ সব এক-একটি! একখানা মাছও খেতে পেলাম না।

দাদাকে ভগবান এমন বোকা ক'রে গড়েছিলেন কেন তাই ভাবি।

সীতা এ-সব বিষয়ে অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। এই সে-দিনও তো দেখেছি সীতা রান্নাঘরে খেতে বসেচে—সামনেই জ্যাঠাইমাও খেতে বসলেন। জ্যাঠাইমাকে ভুবনের মা এক কাঁসি মাছের তরকারি দিয়ে গেল, বড় বড় দাগা মাছ আট-দশখানা তাতে—আর সীতাকে দিলে তার বরাদ্দমত একটুকরো—জ্যাঠাইমা মাছ যত পারলেন খেলেন, বাকীটা কাঁসিতেই রেখে দিলেন, সেই পাতে তাঁর ভাগ্নে-বৌ বসবে। সীতার পাতে তো একখানা মাছও নিজের পাত থেকে দিতে পারতেন! কিন্তু কই, তা নিয়ে সীতা তো কখনো কিছু বলে না, দুঃখ করে না, নালিশ করে না! আমি জানতে পারলাম এই জন্যে যে, আমি সে-সময় নিতাইকাকার জন্যে আগুন আনতে রান্নাঘরে গিয়েছিলাম—সীতা কোন কথা আমায় বলেনি। এ বাড়ির কাণ্ডই এ রকম, আজ এক বছরের ওপর তো দেখে আসচি। অবিশ্যি নিজের জন্য আমি গ্রাহ্যও করিনে, আমার দুঃখ হয় ওদের জন্যে।

মায়ের দুঃখও এ বাড়িতে কম নয়। অত খাটুনির অভ্যেস মায়ের ছিল না কোন কালে। এই শীতকালে মাকে গোছা গোছা বাসন নিয়ে ভোরে পুকুরের জলে নামতে হয়, মা'কে আর সীতাকে। খিড়কি পুকুরের জল সকালে থাকে ঠাণ্ডা বরফ, রোদ তো পড়ে না জলে কোন

কালেই, চারিধারে বড় বড় আম আর সুপুরির বাগান। এতটুকু রোদ আসে না ঘাটে, সেই কন্‌কনে হিমজলে বসে বাসন মাজা, যেমন তেমন ক'রে মাজলে তো এ বাড়িতে চলবে না, কোথাও দাগ থাকবার জো নেই একটু, জ্যাঠাইমা দেখে নেবেন নিজে। সে যে কি কষ্ট হয় মায়ের, মা মুখ বুজে কাজ করে যান, বলেন না কিছু, আমি তো বুঝতে পারি! ও-সব কাজ কি মা করেছেন কখনো?

সকলের চেয়ে কাজ বাড়ে পুজো-আচ্চার দিনে—এ বাড়িতে বারো মাসের বারোটা পূর্ণিমাতে নিয়মিত ভাবে সত্যনারায়ণের সিন্নি হয়। গৃহদেবতা শালগ্রামের নিত্যপূজা তো আছেই। তা ছাড়া লক্ষ্মীপূজা মাসে একটা লেগেই থাকে। এ-সব দিনে সংসারের দৈনিক বাসন বাদে পুজোর বাসন বেরোয় ঝুড়িখানেক। এঁদের সংসার অত্যন্ত সাত্ত্বিক গোঁড়া হিন্দুর সংসার—পুজো-আচ্চার ব্যাপারে পান থেকে চুন খসবার জো নেই। সে ব্যাপারের দেখাশুনো করেন জ্যাঠাইমা স্বয়ং। ফলে ঠাকুরঘরের কাজ নিয়ে যাঁরা খাটাখাটুনি করেন, তাঁদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে ওঠে।

পুজোর বাসন যে-দিন বেরোয়, মা সে-দিন সীতাকে সঙ্গে নিয়ে যান ঘাটে। সে যতটা পারে মাকে সাহায্য করে বটে, কিন্তু একে সে ছেলেমানুষ, তাতে ও-সব কাজ তার অভ্যেস নেই একেবারেই। জ্যাঠাইমার পছন্দমত পুজোর বাসন মাজতে সক্ষম হওয়া মানে অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া—বরং বোধ হয় শেষেরটাই কিছু সহজ। জ্যাঠাইমা বলবেন,—কোষাকুষি মাজবার ছিরি কি তোমার সেজোবৌ? কতদিন ব'লে দিইচি তামার পাত্তরে তেঁতুল নেবু না দিলে ম্যাড়ম্যাড় করবেই—শুধু বালি দিয়ে ঘষলে কি আর—ঠাকুরদেবতার কাজগুলোও তো একটু ছেদ্দা ক'রে লোকে করে? সবতাতেই খিরেস্টানি—

মা জবাব খুঁজে পান না। যদি তিনি বলতে যান—"না বড়দি, নেবু ঘষেই তো ঠাকুরঘরের তামার বাসন বরাবরই—"

জ্যাঠাইমা বাধা দিয়ে বলবেন,—আমার চোখে তো এখনো ঢ্যালা বেরোয়নি সেজবৌ? অম্বলতা দিয়ে বাসন মাজলে অমনি ছিরি হয় বাসনের? কা'কে শেখাতে এসেচ? কি বলব, ভুবনের মা হেঁসেলের কাজ সেরে সময় করতে পারে না, নইলে বাসন-মাজা কা'কে বলে—

জ্যাঠাইমা নিজের কথার প্রতিবাদ সহ্য করতে পারেন না, আর কেনই বা পারবেন, তিনিই যখন এ বাড়ির কর্ত্রী, এ বাড়ির সর্ব্বেসর্ব্বা, পুত্রবধূরা, জায়েরা, ভাগ্নেবৌ, মাসীর দল, পিসির দল, সবাই যখন মেনে চলে—ভয় করে।

আমার ইস্কুলের পড়াটা শেষ হয়ে গেলে বাঁচি, এদের হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে অন্য কোথাও চলে যাই তা'হলে।

ভুবনের মা সকালে আমাকে ডেকে বলল, জিতু, তুমি যখন ইস্কুলে যাও, ভুবনকেও নিয়ে যেও না? ওর লেখাপড়া তো হ'ল না কিছু, আমি মাসে মাসে আট আনা মাইনে দিতে পারি, জিজ্ঞেস করে এসো তো ইস্কুলে, তাতে হয় কিনা?

আমি বললাম—দেবেন কাকীমা, ওতেই হয়ে যাবে, ওর তো নিচু ক্লাসের পড়া, আট আনায় খুব হবে।

ভুবনের মা আঁচল থেকে একটা আধুলি বের ক'রে আমায় দিতে গেল। বললে—তাহ'লে নিয়ে রেখে দাও, আর আজ ভাত খাওয়ার সময়ে ভুবনকে ডেকে খেতে বসিও। ও আমার কথা শোনে না—তুমি একবার ইস্কুলে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে গিয়ে ভর্ত্তি ক'রে দিলে তারপর

থেকে ভয়ে ভয়ে আপনি যাবে। মাথার ওপর কেউ নেই, বেজায় বেয়াড়া হয়ে উঠচে দিন দিন।

তারপর আমার হাত দুখানা খপ করে ধরে ফেলে মিনতির সুরে বললে, এই উব্গারটুকু তোমাকে করতে হবে বাবা জিতু—আমার কেউ নেই, কাউকে বলতে পারি নে, বৌ মানুষ, কপালই না হয় পুড়েচে, কিন্তু কি ব'লে যার-তার সঙ্গে কথা কই বলো তো বাবা? ব'লো একটু ভুবনকে বুঝিয়ে।

এই ভুবনের মা এ বাড়িতে কি রকমে ঢুকলো, মার মুখে সে কথা আমি শুনেচি। এই গাঁয়েই ওর বাড়ি। ওর এক সতীন আছে, স্বামী মারা যাওয়ার পরে সম্পত্তির অর্দ্ধেক ভাগ পাছে দখল করতে না পেরে ওঠে, এই ভয়ে জ্যাঠামশায়ের নামে বুঝি লেখাপড়া ক'রে দেয়। কথা থাকে, এরা ওদের দুজনকে চিরকাল খেতে পরতে দেবে। কিন্তু এ বাড়িতে ভুবনের মা আছে চাকরানীরও অধম হয়ে। রাঁধুনীকে রাঁধুনী, চাকরানীকে চাকরানী। আর এত হেনস্থাও সবাই মিলে করে ওকে!

ভুবনের মা হয়েচে এ সংসারে অমঙ্গলের থার্মোমিটার। অর্থাৎ মঙ্গল যখন আসে, তখন ভুবনের মায়ের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই—অমঙ্গল এলেই কিন্তু ভুবনের মায়ের দোষ। জ্যাঠাইমা অমনি বলবেন—যেদিন থেকে ও আমার বাড়ি ঢুকেচে, সেইদিন থেকেই জানি এ বাড়ির আর শান্তি নেই। সাত কুল খেয়ে যে আসে, তার কি আর—তখুনি কর্ত্তাকে বলেছিলাম ও পাপ ঢুকিও না সংসারে, তা কাঙালের কথা বাসি হ'লে মিষ্টি লাগে!

আমি নিজের কানে কতদিন এ ধরনের কথা শুনেচি। মা বলেন, ভুবনের মায়ের মত বোকা লোক তিনি কখনো দেখেননি।

চৈত্র মাসের গোড়ার দিকে মেজকাকার ছেলে সলিল বললে—জানো জিতুদা, মঙ্গলবারে আমাদের বাড়িতে গোপীনাথ জীউ ঠাকুর আসবেন? ও-পাড়ায় মেজ-জ্যাঠামশায়দের বাড়ি ঠাকুর এখন আছেন, মঙ্গলবারে আসবেন, দু-মাস থাকবেন, তারপর আবার হরিপুরের বৃন্দাবন মুখুয্যের বাড়ি থেকে তারা নিতে আসবে। বছরে এই দু-মাস আমাদের পালা।

দাদাও সেখানে ছিল, বললে,—খুব খাওয়ান-দাওয়ান হবে?

সলিল বললে—যে-দিন আসবেন, সে-দিন তো গাঁয়ের সব ব্রাহ্মণের নেমন্তন্ন, তা ছাড়াও রোজ বিকেলে শেতল হবে, রাত্তিরে ভোগ—সে ভারি খাওয়ার মজা।

দাদা ও আমি দু-জনেই খুশী হয়ে উঠি। মঙ্গলবার সকাল থেকে বাড়িতে বিরাট হৈ-চৈ পড়ে গেল, ঠাকুরঘর ধোওয়া শুরু হ'ল, বাসন-কোসন কাল বিকেল থেকেই মাজাঘষা চলচে, ভুবনের মা রাত থাকতে উঠে রান্নাঘরে ঢুকেচে, পাড়ার অনেক ঝি-বৌ অবিশ্যি যথেষ্ট কাজে সাহায্য করচে, একটি দল তো কাল রাত থেকে তরকারি কুটচে একরাশ।

কাকীমারা কাল বিকেল থেকে ক্ষীরের সন্দেশ ও নারকেলের লাড়ু গড়তে ব্যস্ত আছেন। ঝিটকিপোতার গোলাবাড়ি থেকে গাড়িখানেক আখ, শশা, কলা, নারকোল এসেচে, সেগুলো কাটা, ছাড়ানো ব্যাপারে বাড়ির ছোট ছোট মেয়েদের নাইয়ে ধুইয়ে ধোওয়া কাপড় পরিয়ে লাগানো হয়েচে।

বাড়ির ছেলেমেয়েরা সকাল সকাল স্নান সেরে ধোয়া ধুতি-চাদর গায়ে ঠাকুর আনতে গেল কর্ত্তাদের সঙ্গে, তাঁরাও গরদের জোড় পরে আগে আগে চলেচেন। ছেলেরা কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়ে বেলা দশটার সময় তাঁদের সঙ্গে ঠাকুর নিয়ে ফিরলো। জ্যাঠাইমা জলের ঝারা দিতে

দিতে দরজা থেকে এগিয়ে গিয়ে ঠাকুরকে অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে এলেন। মেয়েরা শাঁখ বাজাতে লাগলেন। ধূপধূনোর ধোঁয়ায় ঠাকুরঘরের বারান্দা অন্ধকার হয়ে গেল। আমি এ-দৃশ্য কখনো দেখিনি—আমার ভারি আনন্দ হ'ল, ইচ্ছে হ'ল আর একটু এগিয়ে গিয়ে ঠাকুরঘরের দোরে দাঁড়িয়ে দেখি, কিন্তু ভয় হ'ল পাছে জ্যাঠাইমা বকুনি দেন, বলেন—তুই এখানে দাঁড়িয়ে কেন? কি কাপড়ে আছিস্ তার নেই ঠিক, যা সরে যা।

এমন অনেকবার বলেচেন—তাই ভয় হয়।

বেলা একটা পর্য্যন্ত আমাদের পেটে কিছু গেল না। বাড়ির অন্যান্য ছেলেমেয়েদের কথা স্বতন্ত্র—তাদেরই বাড়ি, তাদেরই ঘরদোর। তারা যেখানে যেতে পারে, আমরা তিন ভাই-বোনেই লাজুক, সেখানে আমরা যেতে সাহস করি না, কারুর কাছে খাবার চেয়েও খেতে পারিনে। মা ব্যস্ত আছেন নানা কাজে, অবিশ্যি হেঁসেলের কাজে তাঁকে লাগানো হয় না এ বাড়িতে, তা আমি জানি। কিন্তু ঝিয়ের কাজ করতে তো দোষ নেই! বাড়ির অন্যান্য মেয়েরা কোনদিনই আমাদের খাওয়াদাওয়ার খোঁজ করেন না, আজ তো সকলেই মহাব্যস্ত।

বেলা যখন দেড়টা আন্দাজ, রান্নাঘরের দিকে একটা গোলমাল ও জ্যাঠাইমার গলার চীৎকার শুনে ব্যাপার কি দেখতে গেলাম ছুটে। গিয়ে দেখি, রান্নাঘরের কোণে ছেঁচ্‌তলার কাছে দাদা একটা লাউপাতা হাতে দাঁড়িয়ে। জ্যাঠাইমা বকচেন—ওই ঝাড় তো, আর কত ভাল হবে তোমাদের? এখনো বামুন-ভোজন হ'ল না, দেবতার ভোগ রইল পড়ে, উনি এসেছেন ভোগের আগে পেরসাদ পেতে,—দেবতা নেই, বামুন নেই, ওর শুয়োর-পেট পোরালেই আমার স্বগ্‌গে ঘণ্টা বাজবে যে! বুড়ো দামড়া কোথাকার—ও-সব খিরিস্টান চাল এ বাড়িতে চলবে না বোলে দিচ্ছি, মুড়ো ঝাঁটা মেরে বাড়ি থেকে বিদেয় ক'রে দেবো জানো না? আমার বাড়ি বসে ও সব অনাচার হবার জো নেই, যখন করেচ তখন করেচ।

মা কোথায় ছিলেন আমি জানিনে। পাছে তিনি শুনতে পান এই ভয়ে দাদাকে আমি সঙ্গে করে বাইরে নিয়ে এলাম। দাদা লাউপাতাটা হাতে নিয়েই বাইরে চলে এল। আমি বললাম—ওখানে কি কচ্ছিলে?

দাদা বললে—কি আবার করবো? ভুবনের মা কাকীমার কাছে দুখানা তিলপিটুলি ভাজা চাইছিলাম—বড্ড খিদে পেয়েচে তাই। জ্যাঠাইমা শুনতে পেয়ে কি বকুনিটাই—

ব'লেই লজ্জা ও অপমান ঢাকবার চেষ্টায় কেমন এক ধরনের হাসলে। হয়তো বাড়ির কোন ছেলেই এখনো খায়নি, কিন্তু আমরা জানি দাদা খিদে মোটে সহ্য করতে পারে না, চা-বাগানে থাকতেও ভাত নামতে-না-নামতে সকলের আগে ও পিঁড়ি পেতে রান্নাঘরে খেতে বসে যেত। বয়সে বড় হ'লে কি হবে, ও আমাদের সকলের চেয়ে ছেলেমানুষ।

আজকার সমস্ত অনুষ্ঠানের উপর আমার বিতৃষ্ণা হ'ল। এদের দয়ামায়া নেই, এই যে ঠাকুর-পূজোর ধুমধাম, এর যেন কোথায় গলদ আছে। কোথায়—তা বোঝা আমার বুদ্ধিতে কুলোয় না, কিন্তু গোটা ব্যাপারটাই যেন কেমন মনের সঙ্গে খাপ খেলো না আদৌ।

আর কিছুদিন পরে একটু বয়স হলে আমি বুঝেছিলাম যে, এদের ভক্তির উৎসের মূলে এদের বিষয়-বুদ্ধি ও সাংসারিক উন্নতি। ভগবান এদের উন্নতি করেচেন, ফসল বাড়াচ্চেন, মান খাতির বাড়াচ্চেন—এঁরাও ভগবানকে তোয়াজ করচেন—ভবিষ্যতে আরও যাতে বাড়ে। প্রতি পূর্ণিমায় ঘরে সত্যনারায়ণ পূজো হয়, সংক্রান্তিতে সংক্রান্তিতে দুটি ব্রাহ্মণ খাওয়ানো হয়, শুধু তাই নয়—একটি গরিব ছাত্রকে জ্যাঠাইমা বছরে একটি টাকা দিয়ে থাকেন বই কেনার জন্যে। শ্রাবণ মাসে তাঁদের আবাদ থেকে বছরের ধান, জালাভরা কই মাছ, বাজরাভরা

হাঁসের ডিম, তিল, আকের গুড়, আরও অনেক জিনিস নৌকো বোঝাই হয়ে আসতো। ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে তাঁরা প্রতিবার এই সময় পাঁঠাবলি দিয়ে মনসা পূজো করতেন ও গ্রামের ব্রাহ্মণ খাওয়াতেন। এদের সত্যনারায়ণ পুজো ঘরের স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি করার জন্যে, লক্ষ্মীপুজো ধনধান্য বৃদ্ধির জন্যে, গৃহ-দেবতার পুজো, গোপীনাথ জীউর পূজো—সবারই মূলে—হে ঠাকুর, ধনেপুত্রে যেন লক্ষ্মীলাভ হয় অর্থাৎ তা হ'লে তোমাকেও খুশী রাখবো।

বাবার মুখে শুনেচি, এ সমস্ত বাড়িঘর আমার ঠাকুরদাদা গোবিন্দলাল মুখুয্যের তৈরি। ঠাকুরদাদা যখন মারা যান, বাবার তখন বয়স বেশী নয়। তিনি মামার বাড়িতে মানুষ হন এবং তারপর চাকরি নিয়ে বিদেশে বার হয়ে যান। জ্যাঠামশাইয়ের বাবা নন্দলাল মুখুয্যে নায়েবী কাজে বিস্তর পয়সা রোজগার করেছিলেন এবং আবাদ অঞ্চলে একশো বিঘে ধানের জমি কিনে রেখে যান। আবাদ-অঞ্চল মানে কি, আমি এতদিনেও জানতাম না, এই সেদিন জ্যাঠামশাইদের আড়তের মুহুরী যদু বিশ্বাসকে জিজ্ঞেস ক'রে জেনেছি।

জ্যাঠামশাই পাটের ব্যবসা ক'রে খুব উন্নতি করেছে। এঁদের বর্ত্তমান উন্নতির মূলেই এঁদের পাটের ও ধানের কারবার। জ্যাঠামশাইরা তিন ভাই—সবাই এই আড়তের কাজেই লেগে আছেন দেখতে পাই। এঁরা বাবার খুড়তুত ভাই, বাবাই ঠাকুরদাদার একমাত্র ছেলে ছিলেন। বাবা কোনো কালেই এ-গাঁয়ে বাস করেননি, জমিজমা যা ছিল তাও এখন আর নেই, বাবা বেঁচে থাকতে জ্যাঠামশায়কে বলতে শুনেছিলাম যে, সব নাকি রোডসেস্ নীলামে বিক্রি হয়ে গেছে। সে-সব কি ব্যাপার যত বুঝি আর না বুঝি, এটুকু আজকাল বুঝেছি যে, এখানে আমাদের দাবি কিছু নেই এবং জ্যাঠামশাইদের দয়ায় তাঁদের সংসারে মাথা গুঁজে আমরা আছি।

জ্যাঠাইমাকে আমার নতুন নতুন ভারি ভাল লাগতো, কিন্তু এতদিন আমরা এ বাড়িতে এসেচি, একদিনের জন্যও আমাদের সঙ্গে তিনি ভাল ব্যবহার করেননি—আমাকে ও দাদাকে তো নখে ফেলে কাটেন এমনি অবস্থা। অনবরত জ্যাঠাইমার কাছ থেকে গালমন্দ অপমান খেয়ে খেয়ে আমারও মন বিরূপ হয়ে উঠেচে। আজকাল আমি তো জ্যাঠাইমাকে এড়িয়ে চলি, সীতাও তাই, দাদা ভালমন্দ কিছু তেমন বোঝে না, ও নবান্নের দিন বাটি হাতে জ্যাঠাইমায়ের কাছে নবান্ন চাইতে গিয়ে বকুনি খেয়ে ফিরে আসবে—পুকুরের ঘাটে নাকি জ্যাঠাইমা নেয়ে উঠে আসছিলেন, ও সে-সময় ঝাঁপিয়ে জলে পড়ার দরুন জল ছিটিয়ে তাঁর গায়ে লাগে, সেজন্যে মার খাবে—বাসি কাপড়ে জ্যাঠাইমার ঘরে ঢুকে এই সে-দিনও মার খেতে খেতে বেঁচে গিয়েচে। কেন বাপু যাওয়া ?

কিন্তু না গেলেই যে বিপদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় তা নয়, এক সংসারে থাকতে গেলে ছোঁয়াছুঁয়ি ঠেকাঠেকি না হয়ে তো পারে না, অথচ হ'লেই আর রক্ষে নেই।

জ্যাঠাইমাদের রোয়াকে বসে আমি আর ভুবন খেলছি—এমন সময় জ্যাঠাইমা ওপরের দালান থেকে ঝিণ্টু, বাদল, ঊষা, কাতু—ওদের ডাক দিলেন। ডাকলেন কেন, আমি তা জানি, খাবার খাওয়ার জন্যে—আমি আর ভুবন যে সেখানে আছি, তা দেখেও দেখলেন না। আমি ভুবনকে বসতে ব'লে মায়ের কাছ থেকে বড় এক বাটি মুড়ি নিয়ে এসে দু'জনে খেতে লাগলাম। কাতু ফিরে এলে বললাম—ভাই, এক ঘটি জল নিয়ে আয় না খাবো! খাবার খাওয়া সেরে আমরা আবার খেলা করচি, এমন সময়ে জ্যাঠাইমা সেখানে এলেন কাপড় তুলতে। রোয়াকের ধারে আমাদের মুড়ির বাটিটার দিকে চেয়ে বললেন—এ বাটিতে হাত ধুয়েচে কে ?

এ ঠিক জিতুর কাজ, নইলে এমন মেলেচ্ছো এ বাড়ির মধ্যে তো আর কেউ নেই।

কি ক'রে ফেলেচি না জানি! ভয়ে ভয়ে বললাম—কি হয়েচে জ্যাঠাইমা?

জ্যাঠাইমা মারমুখী হয়ে বললেন—কি হয়েচে দেখতে পাচ্চো না? দুকুরবেলা কাপড়খানা কেচে আলনায় রেখে গিইচি, কাচা কাপড়খানা জল ছিঁটিয়ে এঁটো ক'রে বসে আছো?

মেজকাকীমার এক পিসি.না মাসী এ বাড়িতে থাকে, বুড়ী ভারি ঝগড়াটে আর জ্যাঠাইমার খোশামুদে। বয়স পঞ্চাশ ষাট হবে, কালো, একহারা দড়িপাকানো গড়ন—সীতা আর আমি আড়ালে বলি—তাড়কা রাক্কুসী। নানা ছুতোনাতায় মাকে অনেকবার বকুনি খাইয়েচে জ্যাঠাইমা-কাকীমাদের কাছে। ওকে দু-চক্ষে আমরা দেখতে পারিনে। জ্যাঠাইমার গলার স্বর শুনে রান্নাঘরের উঠোন থেকে বুড়ী ছুটে এল।—কি হয়েচে বৌমা, কি হয়েচে?

জ্যাঠাইমা বললেন—সন্দেবেলা আহ্নিক ক'রবো বলে কাপড়খানা কেচে আল্‌নায় দিয়ে রেখেচি মাসী—আর বুড়ো ধাড়ী ছোঁড়া করেচে কি, এখেনে মুড়ি খেয়ে সেই বাটিতেই জল দিয়ে হাত ধুয়েচে, আর এই রোয়াকের ধারেই তো কাপড়—তুমি কি বলতে চাও কাপড়ে লাগেনি জলের ছিটে?

বুড়ী অবাক হয়ে ভান ক'রে বললে—ওমা সে কি কথা! লাগেনি আবার, একশো বার লেগেচে।

আমি ভাবলাম, বারে! এতে আর হয়েচে কি? জল যদি লেগেই থাকে, দু-চার ফোঁটা লেগেচে বই তো নয়? জ্যাঠাইমাকে বললাম—জল তো ওতে লাগেনি জ্যাঠাইমা, আর যদিও একটু লেগে থাকে, এখনও রোদ রয়েচে, এক্ষুনি শুকিয়ে যাবে'খন।

বুড়ী বললে—শোন কথা! ও ছোঁড়ার জ্ঞান-কাণ্ড একেবারেই নেই—একেবারেই মেলেচ্ছো—ওর মাও তাই। হিঁদুয়ানি তো শেখেনি কোনোদিন—

—তোমরা শোন মাসী, আমি শুনে শুনে হদ্দ হয়ে গিয়েচি। ঘরে ঠাকুর রয়েচেন, আর এই সব অনাচার কি ক'রে বরদাস্ত করি বল তো তুমি? আমার কোনো ছেলেমেয়ে ওরকম করবে? অত বড় ধাড়ী ছেলে হ'ল, মুড়ির বাটিতে জল ঢাললে যে সকড়ি হয় সেও জানে না! শুনবে কোথা থেকে, মেলেচ্ছো খিরিস্টানের মধ্যে এতকাল কাটিয়ে এসেচে, ভালো শিক্ষে দিয়েচে কে? হিঁদুর বাড়িতে কি এ সব পোষায়? বল তো তুমি—

বুড়ী বললে—ওর মা জানে না তো ও জানবে কোথা থেকে? সেদিন ওর মা করেচে কি, পুকুরঘাটে তো বড় নৈবিদ্যির বারকোশখানা ধুতে নিয়ে গিয়েচে—যেদিন ঠাকুর এলেন (বুড়ী দু-হাত জোড় ক'রে নমস্কার করলে) তার পরের দিন—আমি দাঁড়িয়ে ঘাটে, কাপড় কেচে যখন উঠলি তখন ধোওয়া বারকোশখানা আর একবার জলে ডুবো—না ডুবিয়েই অমনি উঠিয়ে নিয়ে যাচ্চে। আমি দেখে বলি, ও কি কাণ্ড বউ? ভাগ্যিস দেখে ফেললাম তাই তো—

মায়ের দোষ দেওয়াতেই হোক, বা আমাকে আগের ওই-সব কথা বলাতেই হোক, আমার রাগ হ'ল। তা ছাড়া আমার মন বললে এতে কোন দোষ হয়নি—মুড়ির বাটিতে জল ঢালার দরুনে মুড়ির বাটি অপবিত্র হবে কেন? মা বারকোশ ধুয়ে জলের ধারে রেখে স্নান সেরে উঠে যদি সে বারকোশ নিয়ে এসে থাকেন, তাতে মা কোন অন্যায় কাজ করেননি। বললাম—ওতে দোষ কি জ্যাঠাইমা, মুড়িও খাবার জিনিস, জলও খাবার জিনিস—দুটোতে মেশালে খারাপ হবে কেন, ছুঁতে থাকবেই বা না কেন?

জ্যাঠাইমা অগ্নিমূর্ত্তি হয়ে উঠলেন—তোর কাছে শাস্তর শুনতে আসিনি, ফাজিল ছোঁড়া কোথাকার—তোরা তো খিরিস্টান, হিঁদুর আচারব্যাভার তোরা জানিস কি, তোর মা-ই বা

জানে কি? ওইটুকু ছেলে গলা টিপলে দুধ বেরোয়, উনি আবার আমায় শাস্তর বোঝাতে আসেন! শিখবি কোত্থেকে, তোর মা তোদের কি কিছু শিখিয়েচে, না কিছু জানে? পয়সা রোজগার করেচে আর দু-হাতে উড়িয়েচে তোর বাবা—মদ খেয়ে খিরিস্টানি কোরে—

বুড়ী বললে—মোলোও সেই রকম। যেমন-যেমন কম্মফল তেমন-তেমন মিত্যু! দশেধম্মে দেখলে সবাই, যে কম্মের যে শাস্তি—ঘর থেকে মড়া বেরোয় না, ও-পাড়ার হরিদাস না এসে পড়লে ঘরের মধ্যেই পড়ে থাকতো—

বাবার মৃত্যু সম্পর্কে এ কথা বলাতে আমার রাগ হ'ল। তাঁর মরণের পরে এখন তাঁর কথা ভেবে আমার কষ্ট হয়, যদিও সে কথা কাউকে বলিনে। বললাম—ভাল মরণ আর মন্দ মরণ নিয়ে বাহাদুরি কি দিদিমা? এই তো মাঘ মাসে ওই তেঁতুলতলায় যাদের বাড়ি, ওই বাড়ির সেই বুড়ো গাঙ্গুলীমশায় মারা গেলেন, তিনি তো খুব ভালমানুষ ছিলেন সবাই বলে, পুকুরের ঘাটে এক বেলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আহ্নিক করতেন, তবে তিনি পেন্‌সন্ আনতে গিয়ে ও-রকম ক'রে সেখানে মারা গেলেন কেন? সেখানে কে তাঁর মুখে জল দিয়েচে, কে মড়া ছুঁয়েচে, কোথায় ছিল ছেলেমেয়ে, ও-রকম হ'ল কেন?

আমার বোকামি, আমি ভেবেছিলাম ঠিকমত যুক্তি দেখিয়ে বুড়ীকে তর্কে হারাবো, কিন্তু তার ধরনের ঝগড়ায় মজবুত পাড়াগাঁয়ের মেয়ে যে অত সহজে হার মেনে নেবে, এ ধারণা করাই আমার ভুল হয়েছিল। সে যুক্তির পথে গেলই না।

—মরুক বুড়ো গাঙ্গুলী, তবুও খবর পেয়ে তার ছেলেজামাই গিয়ে তাকে এনে গঙ্গায় দিয়েছিল, তোর বাবার মত দোগেছের মাঠে ডোবার জলে আধ-পোড়া ক'রে ফেলে রেখে আসেনি! আমি সব জানি, আমায় ঘাঁটাসনে, অনেক আছিনাড়ির কথা বেরিয়ে যাবে। কাঠ জোটেনি, খেজুরের ডাল দিয়ে পুড়িয়েছিল, সব শুনেচি আমি। দোগেছের মাঠে সন্দের পর লোক যায় না, সবাই বলে এখনও ভূত হয়ে—

কথা সবই সত্যি, শেষেরটুকু ছাড়া। ঐটুকুর ওপরই জোর দিয়ে বললাম—মিথ্যে কথা, বাবা কখ্‌খনো,—তার যুক্তির অকাট্যতা প্রমাণ করবার জন্যে এমন একটা কথা ব'লে ফেললাম যা কখনো কারুর কাছে বলিনি বা খুব রেগে মরীয়া না হয়ে উঠলে বলতামও না এদের কাছে। বললাম—জানেন, আমি ভূত দেখতে পাই, অনেক দেখেচি, বাবাকে তা হলে নিশ্চয়ই দেখতে পেতাম, জানেন? চা-বাগানে থাকতে আমি কত—

এই পর্য্যন্ত বলেই আমি চুপ করে গেলাম। দিদিমা খিল খিল ক'রে হেসেই খুন।—হি হি, এ ছোঁড়াও পাগল ওর বাপের মত—হি হি—শুনেচো বউমা, হি হি—কি বলে শুনেচো একবার—

জ্যাঠাইমা বললেন—যা এখান থেকে এই মুড়ির বাটি তুলে ধুয়ে নিয়ে আয় পুকুর থেকে এখানটা গাড়ুর জল দিয়ে ধুয়ে দে। আমার কাপড়খানাও কেচে নিয়ে আয় অমনি, তোর সঙ্গে কে এখন সন্দে অবধি তক্কো করে? তবে ব'লে দিচ্ছি, হিঁদুর ঘরে হিঁদুর মত ব্যাভার না করলে এ বাড়িতে জায়গা হবে না। পষ্ট কথায় কষ্ট নেই। কই আমাদের বুলু, ভুন্টি, হাবু কি সতীশ তো কখনো এমন করে না, যা বলি তখুনি তাই তো শোনে, কই এক দিনের জন্যেও তো—

দিদিমা বললেন—ওমা; বুলু, হাবু, সতীশের কথা ব'লো না, তারা আমার বেঁচে থাক, সোনার চাঁদ ছেলেমেয়ে সব। তারা হিঁদুয়ানির যা জানে ওর মা তা জানে না তো ও! সে দিন সতীশকে বলচি, সতু দাদাভাই, তেলের ভাঁড়টা বাইরের উঠোনে নিমু কলুকে দিয়ে এসো

তো? তো বলচে—আমার বিছানার কাপড়, আমি তো ভাঁড় ছোঁব না। আমি মনে মনে ভাবলাম যে, দ্যাখো শিক্ষের গুণ দ্যাখো—কেমন ঘরে মানুষ তারা। আহা বেঁচে থাক্—সব বেঁচে থাক্—

মনে মনে সতীশের প্রশংসা করতে চেষ্টা করলাম। সতীশ যে স্বীকার করেচে তার কাপড় বাসি, এটা অবিশ্যি প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু বাসি কাপড়ে কিছু ছোঁয়া যে খারাপ কাজ, এ বিশ্বাস যার নেই, তাকেই বা দোষ দেওয়া যায় কি ক'রে, এ আমি বুঝতে পারিনে। যেমন এখনই আমার মনে একটা প্রশ্ন এসেছে যে, নিমু কলু কি কাচা, ধোয়া, শুদ্ধ গরদের জোড় প'রে তেল বেচতে এসেছিল? সতীশের ভেবে দেখবার ক্ষমতা ও বুদ্ধির চেয়ে যদি কারুর বুদ্ধি ও বুঝবার শক্তি বেশী থাকে, তার জন্যে তাকে কি নরকে পচে মরতে হবে?

॥ ২ ॥

তিন বছর এখনও হয়নি, আমরা এ গাঁয়ে এসেছি। তার আগে ছিলাম কার্সিয়ঙের কাছে একটা চা-বাগানে, বাবা সেখানে চাকরি করতেন। সেখানেই আমি ও সীতা জন্মেছি, (কেবল দাদা নয়, দাদা জন্মেছে হনুমান-নগরে, বাবা তখন সেখানে রেলে কাজ করতেন) সেখানেই আমরা বড় হয়েছি, এখানে আসবার আগে এত বড় সমতলভূমি কখনো দেখিনি। আমরা জানতাম চা-ঝোপ, ওক আর পাইনের বন, ধুপী গাছের বন, পাহাড়ী ঝালিয়ার বন, ঝর্ণা, কন্‌কনে শীত, দূরে বরফে ঢাকা বড় বড় পাহাড়-পর্ব্বতের চূড়া, মেঘ, কুয়াশা, বৃষ্টি। এখানে প্রায়ই মাঝে মাঝে চা-বাগানের কথা, আমাদের নেপালী চাকর থাপার কথা, উম্‌প্রাঙের ডাক-রানার খড়্গা সিং যে আমাদের বাংলোতে মাঝে মাঝে ভাত খেতে আসতো—তার কথা, মিস নর্টনের কথা, পচাং বাগানের মাসীমার কথা, আমাদের বাগানের নীচের সেই অদ্ভুত রাস্তাটার কথা, মনে হয়।

সেই সব দিনই আমাদের সুখে কেটেচে। দুঃখের শুরু হয়েছে যে-দিন বাংলা দেশে পা দিয়েছি। এই জন্যে এই তিন বছরেও বাংলা দেশকে ভাল লাগলো না—মন ছুটে যায় আবার সেই সব জায়গায়, চা-বাগানে, শেওলা-ঝোলা বড় বড় ওকের বনে, উম্‌প্রাঙের মিশন হাউসের মাঠে—যেখানে আমি, সীতা, দাদা কতদিন সকালে ফুল তুলতে যেতাম, বড়দিনের সময় ছবির কার্ড আনতে যেতাম, কেমন মিষ্টি কথা বলতো, ভালবাসতো মিস নর্টন। ভাবতে বসলে এক একটা দিনের কথা এমন চমৎকার মনে আসে!···

শীতের সকাল।

বাড়ির বার হয়েই দেখি চারিধারে বনে জঙ্গলে পাহাড়ের ঢালুর গায়ে পাইন গাছের ফাঁকে বেশ রোদ। আমি উঠতাম খুব সকালেই, সীতা ও দাদা তখন লেপের তলায়, চা না পেলে এই হাড়কাঁপানো শীতে উঠতে কেউ রাজী নয়।

শীতও পড়েছে দস্তুরমত। আমাদের বাগানের দক্ষিণে কিছু দূরে যে বড় চা-বাগানটা নতুন হয়েছে, যার বাংলোগুলোর লাল টালির ঢালু ছাদ আমাদের এখান থেকে দেখা যায় পাইন গাছের ফাঁকে, আজ তাদের লোকজনেরা চায়ের চারাগাছ খড়ের পালুটি দিয়ে ঢেকে দিচ্ছে বোধ হয় বরফ পড়বার ভয়ে। আকাশ পরিষ্কার, সুনীল, কোনোদিকে এতটুকু কুয়াশা

নেই ; বরফ পড়বার দিন বটে।

একটু পরে সীতা উঠল। সে রোগা, ফর্সা, ছিপছিপে। সে ও দাদা খুব ফর্সা, তবে অত ছিপছিপে আর কেউ নয়। সীতা বললে, থাপা কোথায় গেল দাদা? আজ ও সোনাদা যাবে? বাজার থেকে একটা জিনিস আনতে দেবো।

আমি বললাম—কি জিনিস রে?

সীতা দুষ্টুমের হাসি হেসে বললে, বলবো কেন? তোমরা যে কত জিনিস আনাও, আমায় বলো?

একটু পরে থাপা এল। সে হপ্তায় দু-দিন সোনাদা বাজারে যায় তরকারি আর মাংস আনতে। সীতা চুপি চুপি তাকে কি আনতে ব'লে দিলে, আড়ালে থাপাকে জিজ্ঞেস ক'রে জানলাম জিনিসটা একপাতা সেফটিপিন্। এরই জন্যে এতো!

একটু বেলায় বরফ পড়তে শুরু হ'ল। দেখতে দেখতে বাড়ির ছাদ, গাছপালার মাথা, পথঘাট যেন নরম থোকা থোকা পেঁজা কার্পাস তুলোতে ঢেকে গেল। এই সময়টা ভারি ভাল লাগে, আগুনের আংটাতে গনগনে আগুন—হাড়কাঁপানো শীতের মধ্যে আগুনের চারিধারে বসে আমি দাদা ও সীতা লুডো খেলতে শুরু ক'রে দিলাম।

এই সময় বাবা এলেন আপিস থেকে। ম্যানেজারের কুঠীর পাশেই আপিস-ঘর, আমাদের বাংলো থেকে প্রায় মাইলখানেক, কি তার একটু বেশী। বাবা বেলা এগারোটার সময় ফিরে খাওয়া-দাওয়া ক'রে একটু বিশ্রাম করেন, তিনটের পরে বেরোন, ওদিকে রাত আটটা-ন'টায় আসেন।

বাবা আমাদের সকলকে নিয়ে খেতে ভালবাসতেন। সীতাকে ডেকে বললেন—খুকী, থাপাকে বলে দে নাইবার জন্যে জল গরম করতে—আর তোরা সব আজ আমার সঙ্গে খাবি—নিতুকে বলিস নইলে সে আগেই খাবে।

মা রান্নাঘরে ব্যস্ত ছিলেন। সীতা গিয়ে বললে—মা, দাদাকে আগে ভাত দিও না, আমরা সবাই বাবার সঙ্গে খাবো।

সীতার কথা শেষ না হ'তে দাদা গিয়ে রান্নাঘরে হাজির। দাদা খিদে মোটে সহ্য করতে পারে না—তাই আমাদের সকলের আগে মা তাকে খেতে দিতেন। এদিকে আমাদের ক' ভাই-বোনের মধ্যে বাবা সকলের চেয়ে ভালবাসতেন দাদাকে ও সীতাকে। দাদাকে খাওয়ার সময়ে কাছে বসে না খেতে দেখলে তিনি কেমন একটু নিরাশ হতেন, যেন অনেকক্ষণ ধরে যেটা চাইছিলেন সেটা হ'ল না।

সীতা বললে—দাদা তুমি খেও না, বাবা আজ সকলকে নিয়ে খাবেন। বাবা নাইচেন, এক্ষুনি আমরা খেতে বসবো—

দাদা কড়া থেকে মাকে একটুক্‌রো মাংস তুলে দিতে বললে এবং গরম টুক্‌রোটা মুখে পুরে দিয়ে আবার তখুনি তাড়াতাড়ি বার ক'রে ফেলে বার-দুই ফুঁ দিয়ে আবার মুখে পুরে নাচতে নাচতে চলে গেল। দাদাকে আমরা সবাই ভালোবাসি, দাদা বয়সে সকলের চেয়ে বড় হলেও এখনো সকলের চেয়ে ছেলেমানুষ। ও সকলের আগে খাবে, সকলের আগে ঘুমিয়ে পড়বে। ঘুরিয়ে কথা বললে বুঝবে না, অন্ধকারে একলা ঘরে শুতে পারবে না—ওর বয়স যদিও বছর চোদ্দ হ'ল, কিন্তু এখনও আমাদের চেয়ে ও ছেলেমানুষ, প্রথম সন্তান ব'লে বাপ-মায়ের বেশী আদর ওরই ওপর।

আমরা সবাই একসঙ্গে খেতে বসলাম। বাবা সীতাকে একপাশে ও দাদাকে আর একপাশে

নিয়ে খেতে বসেচেন। মাংসের বাটি থেকে চর্ব্বি বেছে বেছে ফেলে দিতেই সীতা বললে—বাবা আমি খাবো—

দাদা বললে—তুই সব খাস্‌নে, আমাকে হু'খানা দে সীতা—

বাবা অত চর্ব্বি ওদের খেতে দিলেন না। ওদের এক এক টুকরো দিয়ে বাকি টুকরোগুলো বেড়ালদের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। আমায় বললেন—জিতু, গায়ের মাপটা দিস তো তোর, ওবেলা সায়েবের দর্জ্জি আসবে, তার কাছে তোর জামা করতে দেবো—

সীতা বললে—আমার আর একটা জামা দরকার বাবা—

—তবে তুইও দিস গায়ের মাপটা,—ওই সঙ্গেই দিস—

মা বললেন—তার দরকার কি, তুমি তাকে বাসায় পাঠিয়ে দিও না। আমি সব দেখে-শুনে দেবো—আরও করবার জিনিস রয়েচে—নিতুর মোটে হুটো জামা, ওর ওভারকোটটা পুরনো হয়ে ছিঁড়ে গিয়েছে—যেমন শীত পড়েছে এবার, ওর একটা ওভারকোট করে দাও—

বিকেলে মেমেরা মাকে পড়াতে এল।

মাইল তুই দূরে মিশনারীদের একটা আড্ডা আছে। আমি একবার মেমসাহেবের সঙ্গে সেখানে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে খোসালডি চা-বাগানে যে রাস্তাটা পাহাড়ের ঢালু বেয়ে নেমেচে—তারই ধারে ওদের বাংলো। অনেকগুলো লাল টালির ছোট বড় ঘর, বাঁশের জাফ্‌রির বেড়ায় ঘেরা কম্পাউণ্ড, এই শীতকালে অজস্র ডালিয়া ফোটে, বড় বড় ম্যাগ্‌নোলিয়া গাছ। আমাদের বাগানে ও বড় সাহেবের বাংলোতে ম্যাগ্‌নোলিয়া গাছ আছে।

এরা মাকে পড়ায়, সীতাকেও পড়ায়। মিস্‌ নর্টন দিনাজপুরে ছিল, বেশ বাংলা বলতে পারে। নানা ধরনের ছবিওয়ালা কার্ড, লাল সবুজ রঙের ছোট ছোট ছাপানো কাগজ, তাতে অনেক মজার গল্প থাকে। দাদার পড়াশুনোয় তত ঝোঁক নেই, আমি ও সীতা পড়ি। একবার একখানা বই দিয়েছিল—একটা গল্পের বই—'সুবর্ণবণিক পুত্র'। এ কথায় আমি বুঝেছিলাম বণিকপুত্র সোনা দিয়ে গড়া অর্থাৎ সোনার মত ভালো। পাপের পথ থেকে উক্ত বণিকপুত্র কি করে ফিরে এসে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করলে, তারই গল্প। অনেক কথা বুঝতে পারতাম না, কিন্তু বইখানা ভালো লাগতো!···

মেম আসতো দু-জন। একজনের বয়স বেশী—মায়ের চেয়েও বেশী। আর একজনের বয়স খুব কম। অল্পবয়সী মেমটির নাম মিস্‌ নর্টন—একে আমার খুব ভালো লাগতো—নীল চোখ, সোনালী চুল, আমার কাছে মিস্‌ নর্টনের মুখ এত সুন্দর লাগতো, বার বার ওর মুখের দিকে চাইতে ইচ্ছে করত, কিন্তু কেমন লজ্জা হ'ত—ভালো করে চাইতে পারতাম না—অনেক সময় সে অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে থাকবার সময় লুকিয়ে এক চমক দেখে নিতাম। তখনি ভয় হ'ত হয়ত সীতা দেখছে—সীতা হয়ত এ নিয়ে ঠাট্টা করবে। ওরা আসতো বুধবারে ও শনিবারে। সপ্তাহের অন্য দিনগুলো যেন কাটতে চাইতো না, দিন গুনতাম কবে বুধবার আসবে, কবে শনিবার হবে। মিস্‌ নর্টনের মত সুন্দরী মেয়ে আমি কখনো দেখিনি—আমার এই এগারো-বারো বছরের জীবনে।

কিন্তু মাঝে মাঝে এমনি হতাশ হ'তে হ'ত। দিন গুনে গুনে বুধবার এল, কিন্তু প্রৌঢ়া মেমটি হয়তো সেদিন এল একা, সঙ্গে মিস্‌ নর্টন নেই—সারা দিনটা বিস্বাদ হয়ে যেতো, মিস্‌ নর্টনের ওপর মনে মনে অভিমান হ'ত, অথচ কেন আজ মিস্‌ নর্টন এল না সে কথা কাউকে জিজ্ঞেস করতে লজ্জা হ'ত।

মেমেরা এক-একদিন আমাদের ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে শেখাতো। মা তখন

থাকতেন না। আমি, সীতা ও দাদা চোখ বুজতাম—মিস্ নর্টন ও তার সঙ্গিনী চোখ বুজতো। 'হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা সদাপ্রভু'—সবাই একসঙ্গে গম্ভীর সুরে আরম্ভ করলুম। হঠাৎ চোখ চেয়ে দেখতাম সবাই চোখ বুজে আছে, কেবল সীতা চোখ খুলে একবার জিব বার করেই আমার দিকে চেয়ে একটু দুষ্টুমির হাসি হাসলে—পরক্ষণেই আবার প্রার্থনায় যোগ দিলে।

সীতা ঐ রকম, ও কিছু মানে না, নিজের খেয়াল-খুশীতে থাকে, যাকে পছন্দ করবে তাকে খুবই পছন্দ করবে, আবার যাকে দেখতে পারবে না তার কিছুই ভাল দেখবে না। ওর সাহসও খুব, দাদা যা করতে সাহস করে না, এমন কি আমিও যা অনেক সময় করতে ইতস্ততঃ করি—ও তা নির্ব্বিচারে করে। আমাদের বাংলো থেকে খানিকটা দূরে বনের মধ্যে একটা দেবস্থান আছে—পাহাড়ীদের ঠাকুর থাকে। একটা বড় সরল গাছের তলায় কতকগুলো পাথর—ওরা সেখানে মুরগী বলি দেয়, ঢাক বাজায়। সবাই বলে ওখানে ভূত আছে, জায়গাটা যেমন অন্ধকার তেমনি নির্জ্জন—একবার দাদা তর্ক তুলে বললে আমরা কখনোই ওখানে একা যেতে পারবো না। আমি ভেবে উত্তর দেওয়ার আগেই সীতা বাংলোর বার হয়ে চ'লে গেল একাই—কোনো উত্তর না দিয়েই ছুট দিলে পাহাড়ীদের সেই নির্জ্জন ঠাকুরতলার দিকে।…ওই রকম ওর মেজাজ।…

মিস্ নর্টন সীতাকে খুব ভালবাসে। মাঝে মাঝে সীতাকে সঙ্গে নিয়ে যায় ওদের মিশন বাড়িতে, ওকে ছবির বই, পুতুল, কেক, বিস্কুট কত কি দেয়—ছবি আঁকতে শেখায়, বুনতে শেখায়—এরই মধ্যে সীতা বেশ পশমের ফুল তুলতে পারে, মানুষের মুখ, কুকুর আঁকতে পারে। ওরা আমাকেও অনেক বই দিয়েচে—মথি-লিখিত সুসমাচার, লুক-লিখিত সুসমাচার, যোহন-লিখিত সুসমাচার, সদাপ্রভুর কাহিনী—আরো অনেক সব। যীশু একটুকরো মাছ ও আধখানা রুটিতে হাজার লোককে ভোজন করালেন—গল্পটা পড়ে একবার আমার হঠাৎ মাছ ও রুটি খাবার সাধ হ'ল। কিন্তু মাছ এখানে মেলে না—মা ভরসা দিলেন খাওয়াবেন, কিন্তু দু মাসের মধ্যেও সেবার মাছ পাওয়া গেল না; আমার শখও ক্রমে ক্রমে উবে গেল।

বাবার বন্ধু দু-একজন বাঙালী মাঝে মাঝে আমাদের এখানে এসে দু-একদিন থাকেন। মেমেরা মাকে পড়াতে আসে, এ ব্যাপারটা তাঁদের মনঃপূত নয়। বাবাকে তাঁরা কেউ কেউ বলেছেনও এ নিয়ে। কিন্তু বাবা বলেন—ওরা আসে, এজন্যে এক পয়সা নেয় না—অথচ সীতাকে ছবি আঁকা, সেলাইয়ের কাজ শেখাচ্ছে—কি ক'রে ওদের বলি তোমরা আর এসো না? তা ছাড়া ওরা এলে মেয়েদের সময়ও ভালোই কাটে, ওদের কেউ সঙ্গী নেই, এই নির্জ্জন চা-বাগানের একপাশে পড়ে থাকে—একটা লোকের মুখ দেখতে পায় না, কথা বলবার মানুষ পায় না—ওরা যদি আসেই তাতে লাভ ছাড়া ক্ষতি কি?

মায়ের মনের একটা গোপন ইচ্ছা ছিল, সেটা কিন্তু পূর্ণ হয়নি। বাবা অত্যন্ত মদ খান—এবং যেদিন খুব বেশী ক'রে খেয়ে আসেন, সেদিন আমাদের বাংলো ছেড়ে পালাতে হয়। নইলে সবাইকে অত্যন্ত মারধোর করেন। সে সময়ে তাঁকে আমরা যমের মত ভয় করি—এক সীতা ছাড়া। সীতা আমাদের মত পালায় না—চা-ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থাকতে চায় না। সে বাংলোতে থাকে, বলে—মারবে বাবা?… না হয় মরে যাবো—তা কি হবে? রোজ এ রকম ছুটোছুটি করার চেয়ে মরে যাওয়া ভালো। বাবার এই ব্যাপারের জন্যে আমাদের সংসারে শান্তি নেই—অথচ বাবা যখন প্রকৃতিস্থ থাকেন, তখন তাঁর মত মানুষ খুঁজে পাওয়া ভার—এত শান্ত মেজাজ। যখন যা চাই এনে দেন, কাছে ডেকে আদর করেন, নিয়ে খেলা করেন, বেড়াতে যান—কিন্তু মদ খেলেই একেবারে বদলে গিয়ে অন্য মূর্ত্তি ধরেন, তখন বাংলো থেকে

পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর আমাদের অন্ত উপায় থাকে না।

মা'র ইচ্ছে ছিল মেমেদের ধর্ম্মের এই বই পড়ে যদি বাবার মতিগতি ফেরে। মেমেরা মগুপানের কুফলের বর্ণনাসূচক ছোট ছোট বই দিয়ে যেতে—মা সেগুলো বাবার বিছানায় রেখে দিতেন—কে জানে বাবা পড়তেন কিনা—কিন্তু এই দেড় বৎসরের মধ্যে আমাদের মাসের মধ্যে তিন-চারবার চা-ঝোপের আড়ালে লুকনো বন্ধ হয়নি।

প্রায়ই আমি আর সীতা কার্ট রোড ধরে বেড়াতে বেরুই। আমাদের বাগান থেকে মাইল দুই দূরে একটা ছোট ঘর আছে, আগে এখানে পোস্ট আপিস ছিল, এখন উঠে যাওয়াতে শুধু ঘরটা পড়ে আছে—উমপ্রাঙের ডাক-রানার ঝড়-বৃষ্টি বা বরফপাতের সময়ে এখানে মাঝে মাঝে আশ্রয় নেয়। এই ঘরটা আমাদের ভ্রমণপথের শেষসীমা, এর ওদিকে আমরা যাই না যে তা নয়, কিন্তু সে কালেভদ্রে, কারণ ওখান থেকে উমপ্রাং পর্য্যন্ত খাড়া উৎরাই নাকি এক মাইলের মধ্যে প্রায় এগারো শ ফুট নেমে গিয়েচে, মিস্ নর্টনের মুখে শুনেচি—যদিও বুঝি নে তার মানে কি। আমাদের অত দূরে যাওয়ার প্রয়োজনও ছিল না, যা আমরা চাই তা পোস্ট আপিসের ভাঙা ঘর পর্য্যন্ত গেলেই যথেষ্ট পেতাম—দু-ধারে ঘন নির্জ্জন বন। আমাদের বাগানের নীচে গেলে আর সরল গাছ নেই—বনের তলা আর পরিস্কার নেই, পাইন বন নেই, সে বন অনেক গভীর, অনেক নিবিড়, যেমন দুষ্প্রবেশ্য তেমনি অন্ধকার, কিন্তু আমাদের এত ভাল লাগে! বনে ফুলের অন্ত নেই—শীতে ফোটে বুনো গোলাপ, গ্রীষ্মকালে রডোডেণ্ড্রন বনের মাথায় পাহাড়ের দেওয়ালে লাল আগুনের বন্যা আনে, গায়ক পাখীরা মার্চ মাসের মাঝামাঝি থেকে চারিধারের নির্জ্জন বনানী গানে মুখরিত ক'রে তোলে। ঝর্ণা শুকিয়ে গেলে আমরা শুকনো ঝর্ণার পাশের পথে পাথর ধ'রে ধ'রে নীচের নদীতে নামতাম—অতি সন্তর্পণে পাহাড়ের দেওয়াল ধ'রে ধ'রে, সীতা পেছনে, আমি আগে। দাদাও এক-একদিন আসতো, তবে সাধারণত সে আমাদের এই সব ব্যাপারে যোগ দিতে ভালবাসে না।

এক-একদিন আমি একাই আসি। নদীর খাতটা অনেক নীচে—তার পথ পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে নীচে নেমে গিয়েছে—যেমন পিছল তেমনি দুর্গম—নদীর খাতে একবার পা দিলে মনে হয় যেন একটা অন্ধকার পিপের মধ্যে ঢুকে গিয়েচি। দু-ধারে খাড়া পাহাড়ের দেওয়াল উঠেচে—জল তাদের গা বেয়ে ঝরে পড়ছে জায়গায় জায়গায়—কোথাও অনাবৃত, কোথাও গাছপালা, বনফুল, লতা—মাথার ওপরে আকাশটা যেন নীল কার্ট রোড—ঠিক অতটুকু চওড়া, ঐ রকম লম্বা, এদিকে-ওদিকে চলে গিয়েচে, মাঝে মাঝে টুকরো মেঘ কার্ট রোড বেয়ে চলেচে, কখনও বা পাহাড়ের এ-দেওয়াল ও-দেওয়াল পার হয়ে চলে যাচ্ছে—মেঘের ঐ খেলা দেখতে আমার বড় ভাল লাগত। নদী-খাতের ধারে একখানা শেওলা ঢাকা ঠাণ্ডা পাথরের ওপর ব'সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মুখ উঁচু ক'রে চেয়ে চেয়ে দেখতাম—বাড়ি ফিরবার কথা মনেই থাকত না।

মাঝে মাঝে আমার কি একটা ব্যাপার হ'ত। ওই রকম নির্জ্জন জায়গায় কতবার একটা জিনিস দেখেচি।...

হয়তো দুপুরে চা-বাগানের কুলীরা কাজ সেরে সরল গাছের তলায় খেতে বসেচে—বাবা ম্যানেজারের বাংলোতে গিয়েচেন, সীতা ও দাদা ঘুমুচ্ছে—আমি কাউকে না জানিয়ে চুপি চুপি বেরিয়ে কার্ট রোড ধ'রে অনেক দূরে চলে যেতাম—আমাদের বাসা থেকে অনেক দূরে উমপ্রাঙের সেই পোড়ো পোস্ট আপিস ছাড়িয়েও চলে যেতাম—পথ ক্রমে যত নীচে নেমেচে, বনজঙ্গল ততই ঘন, ততই অন্ধকার, লতাপাতার জড়াজড়ি ততই বেশী—বেতের বন, বাঁশের বন শুরু হ'ত—ডালে ডালে পরগাছা ও অর্কিড ততই ঘন, পাখী ডাকত—সেই ধরনের একটা

নিস্তব্ধ স্থানে একা গিয়ে বসতাম।

চুপ ক'রে বসে থাকতে থাকতে দেখেছি অনেক দূরে পাহাড়ের ও বনানীর মাথার ওপরে নীলাকাশ বেয়ে যেন আর একটা পথ—আর একটা পাহাড়শ্রেণী—সব যেন মৃদু হলুদ রঙের আলো দিয়ে তৈরি—সে অন্য দেশ, সেখানেও এমনি গাছপালা, এমনি ফুল ফুটে আছে, হলুদ আলোর বিশাল জ্যোতির্ম্ময় পথটা এই পৃথিবীর পর্ব্বতশ্রেণীর ওপর দিয়ে শূন্য ভেদ ক'রে মেঘরাজ্যের ওদিকে কোথায় চলে গিয়েছে—দূরে আর একটা অজানা লোকালয়ের বাড়িঘর, তাদের লোকজনও দেখেছি, তারা আমাদের মত মানুষ না—তাদের মুখ ভাল দেখতে পেতাম না—কিন্তু তারাও আমাদের মত ব্যস্ত, হলুদ রঙের পথটা তাদের যাতায়াতের পথ। ভাল করে চেয়ে চেয়ে দেখেছি সে-সব মেঘ নয়, মেঘের ওপর পাহাড়ী রঙের খেলার ধাঁধা নয়—সে-সব সত্যি, আমাদের এই পৃথিবীর মতই তাদের বাড়িঘর, তাদের অধিবাসী, তাদের বনপর্ব্বত, সত্যি—আমার চোখের ভুল যে নয় এ আমি মনে মনে বুঝতাম, কিন্তু কাউকে বলতে সাহস হ'ত না—মাকে না, এমন কি সীতাকেও না—পাছে তারা হেসে উঠে সব উড়িয়ে দেয়।

এ রকম একবার নয়, কতবার দেখেছি। আগে আগে আমার মনে হ'ত আমি যেমন দেখি, সবাই বোধ হয় ওরকম দেখে। কিন্তু সেবার আমার ভুল ভেঙে যায়। আমি একদিন মাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—আচ্ছা মা, পাহাড়ের ওদিকে আকাশের গায়ে ও-সব কি দেখা যায়?···

মা বললেন—কোথায় রে?

—ওই কার্ট রোডের ধারে বেড়াতে গিয়ে এক জায়গায় বসেছিলাম, তাই দেখলাম আকাশের গায়ে একটা নদী—আমাদের মত ছোট নদী নয়—সে খুব বড়, কত গাছপালা—দেখনি মা?

—দূর পাগ্‌লা—ও মেঘ, বিকেলে ওরকম দেখায়।

—না মা, মেঘ নয়, মেঘ আমি চিনিনে? ও আর একটা দেশের মত, তাদের লোকজন পষ্ট দেখেছি যে—তুমি দেখনি কখনও?

—আমার ওসব দেখবার সময় নেই, ঘরকন্না তাই ঠেলে উঠতে পারিনে, নিতুটার আবার আজ প'ড়ে পা ভেঙে গিয়েচে—আমার মরবার অবসর নেই—ও-সব তুমি দেখগে বাবা।

বুঝলাম মা আমার কথা অবিশ্বাস করলেন। সীতাকেও একবার বলেছিলাম—সে কথাটা বুঝতেই পারলে না। দাদাকে কখনো কিছু বলিনি।

আমার মনে অনেকদিন ধ'রে এটা একটা গোপন রহস্যের মত ছিল—যেন আমার একটা কি কঠিন রোগ হয়েছে—সেটা যাদের কাছে বলছি, কেউ বুঝতে পারছে না, ধরতে পারছে না, সবাই হেসে উড়িয়ে দিচ্ছে। এখন আমার সয়ে গিয়েছে। বুঝতে পেরেছি—ও সবাই দেখে না—যারা দেখে, চুপ ক'রে থাকাই তাদের পক্ষে সব চেয়ে ভালো।

আমাদের বাসা থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা সব সময়ই চোখে পড়ে। জ্ঞান হয়ে পর্য্যন্ত দেখে আসচি বহুদূর দিক্‌চক্রবালের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্য্যন্ত তুষারমৌলি গিরিচূড়ার সারি—বাগানের চারিধারের পাহাড়শ্রেণীর যেন একটুখানি ওপরে ব'লে মনে হ'ত—তখনো পর্য্যন্ত বুঝিনি যে ও-গুলো কত উঁচু। কাঞ্চনজঙ্ঘা নামটা অনেকদিন পর্য্যন্ত জানতাম না, আমাদের চাকর থাপাকে জিজ্ঞেস করলে বলত, ও সিকিমের পাহাড়। সেবার বাবা আমাদের সবাইকে (সীতা বাদে) দার্জ্জিলিং নিয়ে গিয়েছিলেন বেড়াতে—বাবার পরিচিত এক হিন্দুস্থানী চায়ের এজেন্ট ওখানে থাকে, তার বাসায় গিয়ে দু-দিন আমরা মহা আদর-যত্নে কাটিয়েছিলাম—তখন বাবার

মুখে প্রথম শুনবার সুযোগ হ'ল যে ওর নাম কাঞ্চনজঙ্ঘা। সীতার সেবার যাওয়া হয়নি, ওকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বাবা বাজার থেকে ওর জন্যে রঙীন গার্টার, উল আর উল বুনবার কাঁটা কিনে এনেছিলেন।

এই কাঞ্চনজঙ্ঘার সম্পর্কে আমার একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা আছে।…

সেদিনটা আমাদের বাগানের কলকাতা আপিসের বড় সাহেব আসবেন বাগান দেখতে। তাঁর নাম লিণ্টন সাহেব। বাবা ও ছোট সাহেব তাকে আনতে গিয়েচেন সোনাদা স্টেশনে—আমাদের বাগান থেকে প্রায় তিন-চার ঘণ্টার পথ। ঘোড়া ও কুলী সঙ্গে গিয়েছে। তখন মেমেরা পড়াতে আসত না, বিকেলে আমরা ভাইবোনে মিলে বাংলোর উঠোনে লাট্টু খেলছিলাম। সূর্য্য অস্ত যাবার বেশী দেরি নেই—মা রান্নাঘরে কাপড় কাচবার জন্যে সোডা সাবান জলে কোটাচ্ছিলেন, থাপা লণ্ঠন পরিষ্কার কাজে খুব ব্যস্ত—এমন সময় আমার হঠাৎ চোখে পড়ল কাঞ্চনজঙ্ঘার দূর শিখররাজির ওপর আর একটা বড় পর্ব্বত, স্পষ্ট দেখতে পেলাম তাদের ঢালুতে ছোট-বড় ঘরবাড়ি, সমস্ত ঢালুটা বনে ঢাকা, দেবমন্দিরের মত সরু সরু ঘরবাড়ির চূড়া ও গম্বুজগুলো অদ্ভুত রঙের আলোয় রঙীন—অস্তসূর্য্যের মায়াময় আলো যা কাঞ্চনজঙ্ঘার গায়ে পড়েছে তা নয়—তা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ও সম্পূর্ণ অপূর্ব্ব ধরনের। সে-দেশ ও ঘরবাড়ি যেন একটা বিস্তীর্ণ মহাসাগরের তীরে—কাঞ্চনজঙ্ঘার মাথার ওপর থেকে সে মহাসাগর কতদূর চলে গিয়েছে, আমাদের এদিকেও এসেছে, ভুটানের দিকে গিয়েছে। তার কূলকিনারা নেই; যদি কাউকে দেখাতাম সে হয়তো বলত আকাশ ওই রকম দেখায়, আমায় বোকা বলত। কিন্তু আমি বেশ জানি যা দেখছি তা মেঘ নয়, আকাশ নয়—সে সত্যিই সমুদ্র। আমি সমুদ্র কখনো দেখিনি, তাই কি, সমুদ্র কি রকম তা আমি জানি। বাবার মুখে গল্প শুনে আমি যে রকম ধারণা করেছিলাম সমুদ্রের, কাঞ্চনজঙ্ঘার উপরকার সমুদ্রটা ঠিক সেই ধরনের। এর বছর দুই পরে মেমেরা আমাদের বাড়ি পড়াতে আসে, তারা দাদাকে একখানা ছবিওয়ালা ইংরেজী গল্পের বই দিয়েছিল, বইখানার নাম রবিন্‌সন ক্রুশো—তাতে নীল সাগরের রঙীন ছবি দেখেই হঠাৎ আমার মনে প'ড়ে গেল, এ আমি দেখেছি, জানি—আরও ছেলেবেলায় কাঞ্চনজঙ্ঘার মাথার ওপর এক সন্ধ্যায় এই ধরনের সমুদ্র আমি দেখেছিলাম—কূলকিনারা নেই, অপার…ভুটানের দিকে চলে গিয়েছে…

মিস নর্টনকে এ-সব কথা বলবার আমার ইচ্ছে ছিল। অনেকদিন মিস্‌ নর্টন আমায় কাছে ডেকে আদর করেছে, আমার কানের পাশের চুল তুলে দিয়ে আমার মুখ দু-হাতের তেলোর মধ্যে নিয়ে কত কি মিষ্টি কথা বলেছে, হয়তো অনেক সময়—তখন বুড়ী মেম ছাড়া ঘরের মধ্যে কেউ ছিল না—অনেকবার ভেবেছি এইবার বলব—কিন্তু বলি-বলি ক'রেও আমার সে গোপন কথা মিস্‌ নর্টনকে বলা হয়নি। কথা বলা তো দূরের কথা, আমি সে-সময়ে মিস্‌ নর্টনের মুখের দিকে লজ্জায় চাইতে পারতাম না—আমার মুখ লাল হয়ে উঠত, কপাল ঘেমে উঠত…সারা শরীরের সঙ্গে জীবও যেন অবশ হয়ে থাকত…চেষ্টা করেও আমি মুখ দিয়ে কথা বার করতে পারতাম না। অথচ আমার মনে হ'ত এবং এখনো মনে হয় যদি কেউ আমার কথা বোঝে, তবে মিস্‌ নর্টনই বুঝবে।

মাস দুই আগে আমাদের বাড়িতে এক নেপালী সন্ন্যাসী এসেছিল। পচাং বাগানের বড়বাবু বাবার বন্ধু, তিনিই বাবার ঠিকানা দেওয়াতে সন্ন্যাসীটি সোনাদা স্টেশনে যাবার পথে আমাদের

বাসায় আসে। সে একবেলা আমাদের এখানে ছিল, যাবার সময় বাবা টাকা দিতে গিয়েছিলেন, সে নেয়নি। সন্ন্যাসী আমায় দেখেই কেমন একটু বিস্মিত হ'ল, কাছে ডেকে তার পাশে বসালে, আমার মুখের পানে বার বার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইতে লাগল—আমি কেমন একটু অস্বস্তি বোধ করলাম, তখন সেখানে আর কেউ ছিল না। তারপর সে আমার হাত দেখলে, কপাল দেখলে, ঘাড়ে কি দাগ দেখলে। দেখা শেষ ক'রে সে চুপ ক'রে রইল, কিন্তু চলে যাবার সময় বাবাকে নেপালী ভাষায় বললে—তোমার এই ছেলে সুলক্ষণযুক্ত, এ জন্মেছে কোথায়?

বাবা বললেন—এই চা-বাগানেই।

সন্ন্যাসী আর কিছু না ব'লেই চলে যাচ্ছিলেন, বাবা এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—ওর হাত কেমন দেখলেন?

সন্ন্যাসী কিছু জবাব দিল না, ফিরলও না, চলে গেল।

আমি কিছু বুঝতে পেরেছিলাম। আমি মাঝে মাঝে নির্জ্জনে যে নানা অদ্ভুত জিনিস দেখি সন্ন্যাসী সেই সম্বন্ধেই বলেছিলেন। সে যে আর কেউই বুঝবে না, আমি তা জানতাম। সেই জন্যেই তো আজকাল কাউকে ও-সব কথা বলিওনে।

পচাং চা-বাগানের কেরানীবাবু ছিলেন বাঙালী। তাঁর স্ত্রীকে আমরা মাসীমা ব'লে ডাকতাম। তিনি তাঁর বাপের বাড়ি গিয়েছিলেন রংপুরে, সোনাদা স্টেশন থেকে ফিরবার পথে মাসীমা আমাদের বাসায় মায়ের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। মা না খাইয়ে তাঁদের ছাড়লেন না, খেতেদেতে বেলা দুপুর গড়িয়ে গেল। আমাদের বাসা থেকে পচাং বাগান তিন মাইল দূরে, ঘন জঙ্গলের মধ্যবর্ত্তী সরু পথ বেয়ে যেতে হয়, মাঝে মাঝে চড়াই উৎরাই। আমি সীতা ও দাদা তাঁদের সঙ্গে এগিয়ে দিতে গেলাম—পচাং পৌঁছতে বেলা তিনটে বাজল। আমরা তখনই সবাই চলে আসছিলাম, কিন্তু মাসীমা ছাড়লেন না, তিনি ময়দা মেখে পরোটা ভেজে, চা তৈরি করে আমাদের খাওয়ালেন; রাত্রে থাকবার জন্যেও অনেক অনুরোধ করলেন, কিন্তু আমাদের ভয় হ'ল বাবাকে না বলে আসা হয়েছে—বাড়ি না ফিরলে বাবা আমাদেরও বকবেন, মাও বকুনি খাবেন। বনজঙ্গলের পথ হ'লেও আরো অনেকবার আমরা মাসীমার এখানে এসেচি। আমি একাই কতবার এসেচি গিয়েচি। আমরা যখন রওনা হই তখন বেলা খুব কম আছে। অন্ধকার এরই মধ্যে নেমে আসছে—আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, ঝড়বৃষ্টির খুব সম্ভাবনা। পচাং বাগান থেকে আধ মাইল যেতেই ঘন জঙ্গল—বড় বড় ওক্ আর পাইন—আবার উৎরাইয়ের পথে নামলেই জঙ্গল অন্য ধরনের, আরো নিবিড় গাছের ডালে পুরু কম্বলের মত শেওলা ঝুলছে, ঠিক যেন অন্ধকারে অসংখ্য ভূত-প্রেত ডালে নিঃশব্দে দোল খাচ্ছে। সীতা খুশির সুরে বললে—দাদা, যদি আমাদের সামনে ভালুক পড়ে?···হি হি—

সীতার ওপর আমাদের ভারি রাগ হ'ল, সবাই জানে এ পথে ভালুকের ভয় কিন্তু সে কথা ওর মনে করিয়ে দেওয়ার দরকার কি ছিল? বাহাদুরি দেখাবার বুঝি সময় অসময় নেই?

অন্ধকার ক্রমেই খুব ঘন হয়ে এল, আর খানিকটা গিয়ে সরু পায়ে-চলার পথটা বনের মধ্যে কোথায় হারিয়ে গেল—সঙ্গে সঙ্গে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হল—তেমনি কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া। শীতে হাত-পা জমে যাওয়ার উপক্রম হ'ল। গাছের ডালে শেওলা বৃষ্টিতে ভিজে এক ধরনের গন্ধ বার হয় এ আমরা সকলেই জানতাম, কিন্তু সীতা বার বার জোর ক'রে বলতে লাগল ও ভালুকের গায়ের গন্ধ।—দাদা আমাদের আগে আগে যাচ্ছিল, মাঝখানে সীতা, পেছনে আমি—হঠাৎ দাদা থমকে দাঁড়িয়ে গেল। সামনে একটা ঝর্ণা—তার ওপরটায় কাঠের গুঁড়ির পুল ছিল—পুলটা ভেঙে গিয়েছে। সেটার তোড় যেমন বেশী, চওড়াও তেমনি। পার হ'তে

সাহস করা যায় না। দাদা বললে—কি হবে জিতু!···চল পচাঙে মাসিমার কাছে ফিরে যাই। সীতা বললে—বাবা পিঠের ছাল তুলবে আজ না ফিরে গেলে বাসায়। না দাদা, বাড়িই চলো।

দাদা ভেবে বললে—এক কাজ করতে পারবি? পাকদণ্ডীর পথে ওপরে উঠতে যদি পারিস—ওখান দিয়ে লিণ্টন বাগানের রাস্তা। আমি চিনি, ওপরে জঙ্গলও কম। যাবি?

দাদা তা হ'লে খুব ভীতু তো নয়!

পাকদণ্ডীর সে পথটা তেমনি দুর্গম, সারা পথ শুধু বন জঙ্গল ঠেলে ঠেলে উঠতে হবে, পা একটু পিছলে গেলেই, কি বড় পাথরের চাঁই আল্‌গা হয়ে খসে পড়লে আটশ' কি হাজার ফুট নীচে প'ড়ে চুরমার হ'তে হবে। অবশেষে ঘন বনের বৃষ্টিভেজা পাতা-লতা, পাথরের পাশের ছোট ফার্নের ঝোপ ঠেলে আমরা ওপরে ওঠাই শুরু করলাম—অন্য কোনো উপায় ছিল না। কাপড়-চোপ্‌ড় মাথার চুল বৃষ্টিতে ভিজে একাকার হয়ে গেল—রক্ত জমে হাত-পা নীল হয়ে উঠল। পাকদণ্ডীর পথ খুব সরু, দুজন মানুষে কোনোগতিকে পাশাপাশি যেতে পারে, বাঁয়ে হাজার ফুট খাদ, ডাইনে ঈষৎ ঢালু পাহাড়ের দেওয়াল খাড়া উঠেছে তাও হাজার-বারোশ ফুটের কম নয়। বৃষ্টিতে পথ পিছল, কাজেই আমরা ডাইনের দেওয়াল ঘেঁষে-ঘেঁষেই উঠচি। পথ মানুষের কেটে তৈরি করা নয় ব'লেই হোক, কিংবা এ-পথে যাতায়াত নেই বলেই হোক—ছোটখাটো গাছ-পালার জঙ্গল খুব বেশী। ডাইনের পাহাড়ের গায়ে বড় গাছের ডালপালাতে সারা পথটা ঝুপ্‌সি করে রেখেছে, মাঝে মাঝে সেগুলো এত নিবিড় যে সামনে কি আছে দেখা যায় না।

হঠাৎ একটা শব্দ শুনে আমরা ক'জনেই থমকে দাঁড়ালুম। সবাই চুপ ক'রে গেলাম। আমরা বুঝতে পেরেছিলাম শব্দটা কিসের। ভয়ে আমাদের বুকের স্পন্দন বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হ'ল। সীতাকে আমি জড়িয়ে ধ'রে কাছে নিয়ে এলুম। অন্ধকারে আমরা কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না বটে, কিন্তু আমরা জানতাম ভালুক যে পথে আসে পথের ছোটখাটো গাছপালা ভাঙতে ভাঙতে আসে। একটা কোনো ভারী জানোয়ারের অস্পষ্ট পায়ের শব্দের সঙ্গে কাটকুটো ভাঙার শব্দে আমাদের সন্দেহ রইল না যে, আমরা যে-পথ দিয়ে এইমাত্র উঠে এসেছি, সেই পথেই ভালুক উঠে আসছে আমাদের পেছনে পেছনে। আমরা প্রাণপণে পাহাড় ঘেঁষে দাঁড়ালাম, ভরসা যদি অন্ধকারে না দেখতে পেয়ে সামনের পথ দিয়ে চলে যায়···আমরা কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে আছি, নিশ্বাঃস পড়ে কি না-পড়ে—এমন সময়ে পাকদণ্ডীর মোড়ে একটা প্রকাণ্ড কালো জমাট অন্ধকারের স্তূপ দেখা গেল—স্তূপটা একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে বেঁকে বেঁকে আসছে—যতটা ডাইনে, ততটা বাঁয়ে নয়—আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখান থেকে দশ গজের মধ্যে এল—তার ঘন ঘন হাঁপানোর ধরনের নিঃশ্বাসও শুনতে পাওয়া গেল—আমাদের নিজেদের নিঃশ্বাস তখন আর বইছে না·· কিন্তু মিনিটখানেকের জন্য—একটু পরেই আর স্তূপটাকে দেখতে পেলাম না—যদিও শব্দ শুনে বুঝলাম সেটা পাকদণ্ডীর ওপরকার পাহাড়ী ঢালুর পথে উঠে যাচ্ছে। আরো দশ মিনিট আমরা নড়লাম না, তারপর বাকী পথটা উঠে এসে লিণ্টন বাগানের রাস্তা পাওয়া গেল। আধ মাইল চলে আসবার পরে উমপ্লাঙের বাজার। এই বাজারের অমৃত সাউ মিঠাই দেয় আমাদের বাসায় আমরা জানতাম—দাদা তার দোকানটাও চিনত। দোরে ধাক্কা দিয়ে ওঠাতে সে বাইরে এসে আমাদের দেখে অবাক হয়ে গেল। আমাদের তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে আগুনের চারিধারে বসিয়ে দিলে—আগুনে বেশী কাঠ দিলে ও বড় একটা পেতলের লোটায় চায়ের জল চড়ালে। তার বৌ উঠে আমাদের শুকনো কাপড় দিলে পরবার ও ময়দা মাখতে বসল। রাত তখন দশটার কম নয়। আমরা বাসায় ফিরবার জন্তে ব্যাকুল হয়ে পড়েছি—বললাম—আমরা কিছু খাব না, আমরা এবার যাই। অমৃত সাউ একা আমাদের

ছেড়ে দিলে না, তার ভাইকে সঙ্গে পাঠালে। রাত প্রায় সাড়ে এগারোটার সময় বাগানে ফিরে এসে দেখি হৈ হৈ কাণ্ড। বাবা বাসায় নেই, তিনি সেদিন খুব মদ খেয়েছিলেন ; ফেরেননি, তার ওপরে আমরাও ফিরিনি, মা পচাণ্ডে লোক পাঠিয়েছিলেন, সে লোক ফিরে এসে বলেছে ছেলেমেয়েরা তো সন্ধ্যের আগেই সেখান থেকে রওনা হয়েছে ! এদিকে নাকি খুব ঝড় হয়ে গিয়েছে, আমরা আরও উঁচুতে থাকবার জন্যে ঝড় পাইনি—নীচে নাকি অনেক গাছপালা ভেঙে পড়েছে। এই সব ব্যাপারে মা ব্যস্ত হয়ে সাহেবের বাংলোয় খবর পাঠান—ছোট সাহেব চারি-ধারে আমাদের খুঁজতে লোক পাঠিয়েছে। মা এতক্ষণ কাঁদেননি, আমাদের দেখেই আমাদের জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠলেন—সে এক ব্যাপার আর কি !

কিন্তু পরদিন যে ঘটনা ঘটল তা আরও গুরুতর। পরদিন চা-বাগানে বাবার চাকরি গেল। কেন গেল তা জানি না। অনেক দিন থেকেই সাহেবরা নাকি বাবার ওপর সন্তুষ্ট ছিল না, সেল মাস্টার বাগান দেখতে এসে বাবার নামে কোম্পানীর কাছে কয়েকবার রিপোর্টও করেছিল, বাবা মদ খেয়ে ইদানীং কাজকর্ম্ম নাকি ভাল ক'রে করতে পারতেন না, এই সব জন্যে। আমরা যে-রাত্রে পথ হারিয়ে যাই, সে-রাত্রে বাবা মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়ে কুলী লাইনের কোথায় পড়ে ছিলেন—বড় সাহেব সেজন্যে ভারি বিরক্ত হয়। আরো কি ব্যাপার হয়েছিল না হয়েছিল আমরা সে-সব কিছু শুনিনি।

বাবা যখন সহজ অবস্থায় থাকতেন, তখন তিনি দেবতুল্য মানুষ। তখন তিনি আমাদের ওপর অত্যন্ত স্নেহশীল, অত ভালোবাসতে মাও বোধ হয় পারতেন না। আমরা যা চাইতাম বাবা দার্জ্জিলিং কি শিলিগুড়ি থেকে আনিয়ে দিতেন। আমাদের চোখছাড়া করতে চাইতেন না। আমাদের নাওয়ানো-খাওয়ানো গোলমাল বা এতটুকু ব্যতিক্রম হ'লে মাকে বকুনি খেতে হ'ত। কিন্তু মদ খেলেই একেবারে বদলে যেতেন, সামান্য ছল-ছুতোয় আমাদের মারধর করতেন। হয়তো আমায় বললেন—এক্সারসাইজ করিস্ নে কেন ? বলেই ঠাস্ ক'রে এক চড়। তারপর বললেন—উঠবস্ কর। আমি ভয়ে ভয়ে একবার উঠি আবার বসি—হয়তো ত্রিশ-চল্লিশ বার ক'রে ক'রে পায়ে খিল ধ'রে গেল—বাবার সেদিকে খেয়াল নেই। মা থাকতে না পেরে এসে আমাদের সাম্‌লাতেন। সেইজন্যে ইদানীং বাবা সহজ অবস্থায় না থাকলেই আমরা বাসা থেকে পালিয়ে যাই—কে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খাবে ?

এই সবের দরুন আমরাও বাবাকে ভয় যতটা করি ততটা ভালোবাসিনে।

দু-চারদিন ধরে বাবা-মায়ে পরামর্শ চলল, কি করা যাবে এ অবস্থায়। আমরা বাইরে বাইরে বেড়াই কিন্তু সীতা সব খবর রাখে। একদিন সীতাই চুপিচুপি আমায় বললে—শোনো দাদা, আমরা আমাদের দেশে ফিরে যাব বাবা বলেছে। বাবার হাতে এখন টাকাকড়ি নেই কিনা—তাই দেশে ফিরে দেশের বাড়িতে থেকে চাকরির চেষ্টা করবে। শীগগির যাব আমরা—বেশ মজা হবে দাদা—না ?···দেশে চিঠি লেখা হয়েছে—

আমরা কেউ বাংলা দেশ দেখিনি, আমাদের জন্ম এখানেই। দাদা খুব ছেলেবেলায় একবার দেশে গিয়েছিল মা-বাবার সঙ্গে, তখন ওর বয়স বছর তিনেক—সে-কথা ওর মনে নেই। আমরা তো আজন্ম এই পর্ব্বত, বনজঙ্গল, শীত, কুয়াশা, বরফ-পড়া দেখে আসছি—কল্পনাই করতে পারিনে এ-সব ছাড়া আবার দেশ থাকা সম্ভব। তা ছাড়া সমাজের মধ্যে কোনো দিন মানুষ হইনি ব'লে আমরা কোনো বন্ধনে অভ্যস্ত ছিলাম না, সামাজিক নিয়ম-কানুনও ছিল আমাদের সম্পূর্ণ অজানা। মানুষ হয়েছি এরই মধ্যে, যেখানে খুশী গিয়েছি, যা খুশী করেছি। কাজেই বাংলা দেশে ফিরে যাওয়ার কথা যখন উঠল, তখন একদিকে যেমন

অজানা জায়গা দেখবার কৌতূহলে বুক ঢিপ্ ঢিপ্ ক'রে উঠল, অন্তদিকে মনটা যেন একটু দমেও গেল।

থাপাকে বিদায় দেওয়া হ'ল। সে আমাদের মানুষ করেছিল, বিশেষ ক'রে সীতাকে। তাকে এক মাসের বেশী মাইনে, দুখানা কাপড় আর বাবার একটা পুরোনো কোট দেওয়া হ'ল। থাপা বেশ সহজ ভাবেই বিদায় নিলে, কিন্তু বিকালে আবার ফিরে এসে বললে সে আমাদের যাওয়ার দিন শিলিগুড়ি পর্য্যন্ত নামিয়ে দিয়ে তবে নিজের গাঁয়ে ফিরে যাবে। শিলিগুড়ি স্টেশনে সে আমাদের সবাইকে সন্দেশ কিনে খাওয়ালে—ওর মাইনের টাকা থেকেই বোধ হয়। মা রাঁধলেন, সে সব যোগাড় ক'রে দিলে। ট্রেন যখন ছাড়ল তখনও থাপা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে বোকার মত হাসছে।

কাঞ্চনজঙ্ঘাকে ভালবাসি, সে যে আমাদের ছেলেবেলা থেকে সাথী, এই বিরাট পর্ব্বত-প্রাচীর, ওক্-পাইনের বন, অর্কিড, শেওলা, ঝর্ণা, পাহাড়ী নদী; মেঘ-রোদ-কুয়াশার খেলা—এরই মধ্যে আমরা জন্মেছি—এদের সঙ্গে আমাদের বত্রিশ নাড়ীর যোগ।...তখন এপ্রিল মাস, আবার পাহাড়ের ঢালুতে রডোডেণ্ড্রন ফুলের বন্যা এসেছে—সারা পথ দাদা বলতে বলতে এল চুপিচুপি—কেন বাবা অত মদ খেতেন, তা নাহ'লে তো আর চাকরি যেত না—বাবারই তো দোষ!

॥ ৩ ॥

আমাদের দেশের গ্রামে পৌঁছলাম পরদিন বেলা ন'টার সময়ে। বাবার মুখে শুনেছিলাম গ্রামের নাম আটঘরা, স্টেশন থেকে মাইল দুই আড়াই দূরে, জেলা চব্বিশ পরগণা। এত বাঙালী পরিবারের বাস একসঙ্গে দেখে বড় আনন্দ হ'ল। আমরা কখনো ফসলের ক্ষেত দেখিনি, বাবা চিনিয়ে দিলেন পাটের ক্ষেত কোন্‌টা, ধানের ক্ষেত কোন্‌টা। এ ধরণের সমতলভূমি আমরা দেখিনি কখনো—রেলে আসবার সময় মনের অভ্যাসে কেবলই ভাবছিলাম এই বড় মাঠটা ছাড়ালেই বুঝি পাহাড় আরম্ভ হবে। সেটা পার হয়ে গেলে মনে হচ্ছিল এইবার নিশ্চয়ই পাহাড়। কিন্তু পাহাড় তো কোথাও নেই, জমি উঁচু-নীচুও নয়, কি অদ্ভুত সমতল! যতদূর এলাম শিলিগুড়ি থেকে সবটা সমতল—ডাইনে, বাঁয়ে, সামনে, সবদিকে সমতল, এ এক আশ্চর্য ব্যাপার। দাদা এর আগে সমতল ভূমি দেখেছে, কারণ সে জন্মেছিল হনুমান নগরে, নতুন অভিজ্ঞতা হ'ল আমার ও সীতার।

আমাদের বাড়ীটা বেশ বড়, দোতলা, কিছু পুরনো ধরনের। বাড়ির পেছনে বাগান, ছোট একটা পুকুর। আমরা যখন গাড়ি থেকে নামলাম—বাড়ির মেয়েরা কেউ কেউ দোরের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তার মধ্যে জ্যাঠাইমা, কাকীমারাও ছিলেন। মা বললেন, প্রণাম করো। পাড়ার অনেক মেয়ে দেখতে এসেছিলেন, তাঁরা সীতাকে দেখে বলাবলি করতে লাগলেন, কি চমৎকার মেয়ে দেখেছ? এমন রঙ আমাদের দেশে হয় না, পাহাড়ের দেশে ব'লে হয়েছে। দাদাকে নিয়েও তারা খুব বলাবলি করলে, দাদার ও সীতার রঙ নাকি 'দুধে-আলতা'—আমার মুখের চেয়ে দাদার মুখ সুন্দর, এ-সব কথা এই আমরা শুনলাম। চা-বাগানে এ-সব কথা কেউ বলেনি। আর একটা লক্ষ্য করলাম আমাদের গাঁয়ের মেয়েরা প্রায়ই কালো, চা-বাগানের অনেক কুলীমেয়ে এর চেয়ে ফর্সা।

আমাদের থাকবার ঘর দেখে তো আমরা অবাক্। এত বড় বাড়িতে এ-ঘরটা ছাড়া তো আরো কত ঘর রয়েছে! নীচের একটা ঘর, ঘরের ছাদে মাটির নীচের কড়িকাঠ ঝুলে পড়েছে ব'লে খুঁটির ঠেকনো। কেন ওপরে দোতলায় তো কত ঘর, এত বড় বাড়ি তো! অন্ত ঘরে জায়গা হবে না কেন? এই খারাপ ঘরটাতে আমরা থাকবো কেন?

দেখলাম বাবা মা বিনা প্রতিবাদে সেই ঘরটাতেই আমাদের জিনিসপত্র তুললেন।

দিন-চারেক পরে জ্যাঠাইমা একদিন আমায় জিজ্ঞেস করলেন—হ্যাঁ রে, তোর মাকে নাকি সেখানে মেমে পড়াতো?

আমি বললাম, হ্যাঁ, জ্যাঠাইমা।

গর্ব্বের সুরে বললাম—আমাকে, দাদাকে, সীতাকেও পড়াতো।

জ্যাঠাইমা বললেন—তাদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া ছিল নাকি তোদের?

আমি বাহাদুরি ক'রে বললাম—তারা এসে চা খেত আমাদের বাড়ি। আমাদের বিস্কুট দিত, কেক্ দিত খেতে তাদের ওখানে গেলে—চা খাওয়াতো—

জ্যাঠাইমা টানা-টানা সুরে বললেন—মাগো মা! কি হবে, আমাদের ঘরে-দোরে তো যখন-তখন উঠছে, হিঁদুর ঘরের জাতজন্ম আর রইল না।

আমি তখন বুঝতে পারিনি কেন জ্যাঠাইমা এ রকম বলছেন। কিন্তু শুধু এ কথা নয়—আমি ছেলেমানুষ, অনেক কথাই তখন জানতাম না। জানতাম না যে এই বাড়িতে আমার বাবার অংশটুকু অনেক দিন বিক্রী হয়ে গিয়েছে, এখন যে এঁদো ঘরে আমরা আছি, সে-ঘরে কোনো ন্যায্য অধিকার আমাদের নেই—জ্ঞাতি জ্যাঠামশাইরা অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞার সঙ্গে থাকতে দিয়েছেন মাত্র। জানতাম না যে, আমার বাবা বর্ত্তমানে অর্থহীন, অসুস্থ ও চাকুরিহীন, সরিকের বাড়িতে আশ্রয়প্রার্থী। আরো জানতাম না যে, বাবা বিদেশে থাকেন, ইংরেজী জানেন ও ভাল চাকুরি করেন ব'লে এঁদের চিরদিন ছিল হিংসে—আজ এ অবস্থায় হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়ে তাঁরা যে এতদিনের সঞ্চিত গায়ের ঝাল মেটাতে ব্যগ্র হয়ে উঠবেন সেটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও ন্যায়সঙ্গত। চাকুরির অবস্থায় মাকে নিয়ে বাবা কয়েকবার এখানে এসে চাল দেখিয়ে গিয়েছিলেন, এরা সে-কথা ভোলেনি। ছেলেমানুষ বলেই এত কথা তখন বুঝতাম না।

আমরা কখনো দোতলা বাড়ি দেখিনি—গাঁয়ে ঘুরে ঘুরে দোতলা কোঠা বাড়ি দেখতে আমাদের ভারি ভালো লাগতো, বিশেষ ক'রে সীতার। সীতা আজ এসে হয়তো বলে—কাল যেও আমার সঙ্গে দাদা, ও-পাড়ার বাঁড়ুয্যে-বাড়ি কত বড় দেখে এসো—দোতলার ওপরে আবার একটা ছোট ঘর, সত্যি দাদা!

আমাদের গ্রামে খুব লোকের বাস—এক এক পাড়াতেই ষাট-সত্তর ঘর ব্রাহ্মণ। এত ঘন বসতি কখনো দেখিনি—কেমন নতুনতর মনে হয়, কিন্তু ভাল লাগে না। এতে যেন মন হাত পা ছড়াবার জায়গা পায় না। সদাই কেমন অস্বস্তি বোধ হয়—রাস্তায় বেজায় ধুলো, পুরনো নোনাধরা ইটের বাড়িই অধিকাংশ, বিশেষ কোনো শ্রীছাঁদ নেই—পথের ধারে মাঝে মাঝে গাছপালা, সে-সব গাছপালা আমি চিনি নে, নামও জানি নে, কেবল চিনি কচুগাছ ও লালবিছুটি। এদের হিমালয়ে দেখেছি ব'লে নয়, কচুর ডাঁটার তরকারি এখানে এসে খেয়েছি বলে। আর আমার খুড়তুতো ভাই বিশু একদিন সীতাকে বিছুটির পাতা দেখিয়ে বলেছিল—এর পাতা তুলে গায়ে ঘষতে পারিস?···বেচারী সীতা জানত না কিছু, সে বাহাদুরি দেখিয়ে একমুঠো পাতা তুলে বাঁ-হাতে আচ্ছা ক'রে ঘষেছিল—তারপর আর যায় কোথা!

এ-সব জায়গা আমার চোখে অত্যন্ত কুশ্রী মনে হয়, মন ভরে ওঠে এমন একটা দৃশ্য এর কোনো দিকেই নেই—ঝর্ণা নেই, বরফে মোড়া পর্ব্বত-পাহাড় নেই—আরো কত কি নেই। সীতারও তাই, একদিন সে চুপিচুপি বললে—এখানে থাকতে তোমার ইচ্ছে হয় দাদা? আমায় যদি এখুনি কেউ বলে চা-বাগানে চল, আমি বেঁচে যাই। আর একটা কথা শোনো দাদা—জ্যাঠাইমা কি খুড়ীমার ঘরে অত যেও না যেন। ওরা আমাদের দেখতে পারে না। ওদের বিছানায় গিয়ে বসেছিলে কেন দুপুরবেলা? তুমি উঠে গেলে কাকীমা তোমায় বললে, অসভ্য পাহাড়ী ভূত, আচার নেই বিচের নেই, যখন-তখন বিছানা ছোঁয়! যেও না ওদের ঘরে যখন-তখন, বুঝলে?

ছোট বোনের পরামর্শ বা উপদেশ নিতে আমার অগ্রজগর্ব্ব সঙ্কুচিত হয়ে গেল, বললাম—যা যা, তোঁকে শেখাতে হবে না। কাকীমা মন্দ ভেবে কিছুই বলেননি, আমায় ডেকে তার পরে কত বুঝিয়ে দিলেন পাছে আমি রাগ করি। জানিস তা?

বলা বাহুল্য আমায় ডেকে কাকীমার কৈফিয়ত দেওয়ার কথাটা আমার কল্পনাপ্রসূত। আমাদের জীবনের যে অভিজ্ঞতা এই চার মাসের মধ্যেই সঞ্চয় করেছি, তা বোধ হয় সারা জীবনেও ভুলবো না। আমরা সত্যই জানতাম যে, সংসারের মধ্যে এত সব খারাপ জিনিস আছে, মানুষ মানুষের প্রতি এত নিষ্ঠুর হ'তে পারে, যাদের কাছে জেঠিমা, কাকীমা, দিদি ব'লে হাসিমুখে ছুটে গিয়েছি, তারা এতটা হৃদয়হীন ব্যবহার সত্যিই করতে পারে! কি ক'রে জানবই বা এ সব?

মুশকিল এই যে এত সাবধানে চললেও পদে পদে আমরা জ্যাঠাইমাদের কাকীমাদের কাছে অপরাধী হয়ে পড়ি। আমরা লোকালয়ে কখনো বসবাস করিনি বলেই হোক বা এদের এখানকার নিয়ম-কানুন জানিনে বলেই হোক্, বুঝতে পারিনে যে কোথায় আমাদের অপরাধ ঘটছে বা ঘটতে পারে। রাত্রে যে কাপড়খানা প'রে শুয়ে থাকি, সেইখানা পরনে থাকলে সকালে যে আল্‌না ছুঁতে নেই, তার দরুন আল্‌নাসুদ্ধ কাচা কাপড় সব নোংরা হয়ে যায়, বা বাড়ির আশপাশের খানিকটা সুনির্দ্দিষ্ট অংশ পবিত্র, কিন্তু সীমানা পেরিয়ে গেলেই হাত-পা না ধুয়ে বা গঙ্গাজল মাথায় না দিয়ে ঘরদোরে ঢুকতে নেই—এ-সব কথা আমরা জানিনে, শুনিওনি—যুক্তির দিক দিয়েও বুঝতে পারিনে। আমাদের বাড়ির খিড়কিতে খানিকটা বন, একদিন বিকেলে আমি, সীতা ও দাদা সেখানে কুঁড়েঘর বাঁধবার জন্যে নোনাগাছের ডাল কাটছি—কাকীমা দেখতে পেয়ে বললেন, ওখানে গিয়ে জুটেছ সব? ভাগ্যিস চোখে পড়ল! এক্ষুনি তো ওই সব নিয়ে উঠতে এসে দোতলার দালানে!···মা গো মা, মেলেচ্ছ খিরিস্টানের মত ব্যাভার, আঁস্তাকুড় ঘেঁটে খেলা হচ্ছে ছ্যাখো!

সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে চারিদিকে চেয়ে দেখলাম, আঁস্তাকুড়ের অন্য কোনো লক্ষণ তো নেই! দিব্যি পরিষ্কার জায়গা, ঘাসের জমি আর বনের গাছপালা। আমি অবাক হয়ে বললাম—কাকীমা, এখানে তো কিচ্ছু নোংরা নেই? এসে দেখুন বরং কেমন পরিষ্কার—

কাকীমার মুখ দিয়ে খানিকক্ষণ কথা বার হ'ল না—তিনি এমন কথা জীবনে কখনো শোনেননি। তারপর বললেন—চোখে কি ঢ্যালা বেরিয়েছে নাকি? এঁটো হাঁড়িকলসী ফেলা রয়েছে দেখছ না সামনে?···কাচা কাপড় প'রে কোন্ ছেলেমেয়েটা এই বিকেলে পথ থেকে অত দূরে বনজঙ্গলের মধ্যে যায়? ওটা আঁস্তাকুড় হ'ল না? আবার সমানে তক্কো!

তারপর খুড়ীমা হুকুম দিলেন আমাদের সবাইকে এক্ষুনি নাইতে হবে। আমরা অবাক হয়ে গেলাম—নাইতে হবে কেন?

সামনে হাত তিন-চার দূরে গোটাকতক ভাঙা হাঁড়িকুড়ি পড়ে আছে বটে, কিন্তু তার দরুন গোটা বনটা অপরিষ্কার কেন হবে তা বুঝতে পারলাম না আমরা তিনজনে কেউ। বিশেষ ক'রে এটা আরো বুঝতে পারলাম না যে, পথ থেকে দূরে বনের মধ্যে বিকেলে কাপড় প'রে যেতে দোষটা কিসের! চা-বাগানে থাকতে তো কত দূর দূর আমরা চলে যেতাম, কার্ট রোড, পচাঙের বাজার; এখানেই বা কি বন, সেখানকার সেই সুনিবিড় বনানী পদচিহ্নহীন, নির্জ্জন, আধ-অন্ধকার—কতদূরে, যেখানে যেখানে গিয়েছি কাপড় প'রেই তো গিয়েছি—

দাদা একটু ভীতু, সে ভয়ে নাইতে রাজী হ'ল। আমি বললাম—সীতা, তুই আর আমি নাইবো না, কখ্‌খনো না।

আমি যা বলি তাই শোনা সীতার স্বভাব—সে বললে, খুড়ীমা খুন ক'রে ফেললেও আমি নাইবো না দাদা।

খুড়ীমা আমাদের সাধ্যমত নির্য্যাতনের কোনো ত্রুটি করলেন না। বাড়ি ঢুকতে দিলেন না, তাঁর বড় ছেলে হারুদাকে বলে দিলেন আমাদের শাসন করতে, মাকে বললেন—তোমার ওই ডাকাত মেয়ে আর ডাকাত ছেলেকে আজ কি দশা করি তা টেরই পাবে—আমার সঙ্গে সমানে তক্কো তো করলেই আবার আমার কথার ওপর একগুঁয়েমি!

মা ওঁদের বাড়িতে এখন এসে রয়েছেন, ভয়ে কিছু বলতে পারলেন না। আমি সীতাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি থেকে চলে গেলাম। ও-পাড়ায় পথের ধারে শ্যাম বাগচীদের পোড়ো বাড়ি, পেছনে তাদের বাগান, সেও পোড়ো। সারাক্ষণ আমরা সেখানে কাটালাম, সন্ধ্যার সময় দাদা গিয়ে ডেকে আনলে। বাড়িতে ঢুকতে যাব কাকা দোতলা থেকে বললেন—ওদের বাড়ি ঢুকতে দিও না বলছি—ওরা যেন খবরদার আমার বাড়ি না মাড়ায়, সাবধান!—যেখানে হয় যাক্, এত বড় আস্পদ্দা সব—

মা কিছু বলতে সাহস করলেন না, বৌমানুষ! বাবা বাড়ি ছিলেন না, চাকরির চেষ্টায় আজকাল তিনি বড় এখানে ওখানে ঘোরেন, কিছু পান না বোধ হয়—দু-একদিন পরে শুকনো মুখে ফিরে আসেন—সংসার একেবারে অচল। আমরা এক প্রহর রাত পর্য্যন্ত দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রইলাম। জ্যাঠাইমা, খুড়ীমা, জ্যাঠামশাই, দিদিরা কেউ একটা কথাও বললেন না। তারপর যখন ওদের দোতলায় খাওয়া-দাওয়া সারা হ'ল, আলো নিবল, মা চুপিচুপি আমাদের বাড়িতে ঢুকিয়ে নিলেন, বললেন—জিতু, খুড়ীমার কথা শুনলি নে কেন? ছি—

আমি বললাম—উনি যে কথা বলেন মা, তার কোনো মানে হয় না। আচ্ছা মা, তুমিই বলো আমরা সেখানে বনে বনে বেড়াতাম না? আমরা কি নাইতুম? আর বন কি আঁস্তাকুড়? অন্যায় কথা ওঁর কখ্‌খনো শুনব না মা। এতে উনি মারুন আর খুনই করুন—

মা অতি কষ্টে কান্না সামলাচ্চেন মনে হ'ল। বললেন—তুই যদি এরকম করিস তা হ'লে এ বাড়িতে ওরা আমাদের থাকতে দেবে না। আমাদের কি চেঁচিয়ে কথা বলবার জো আছে এখানে? ছি বাবা জিতু, ওরা যা বলে শুনবি। ওরা লোক ভাল না—আগে জানলে ভিক্ষে ক'রে খেতাম তবুও এখানে আসতাম না। তোর বাবার যে একটা কিছু হ'লে হয়।

বাবা কলকাতা থেকে দুপুরে বাড়ি ফিরলেন। কাপড়-জামা এত ময়লা কখনো বাবার গায়ে দেখিনি। আমায় কাছে ডেকে বললেন—শোন্ জিতু, এই পুঁটলিটা তোর মাকে দিয়ে আয়, আমি একবার ও-পাড়া থেকে আসি। ভটচায্যিদের নস্থির কারখানায় একটা লোকের নামে চিঠি দিয়েছে—ওদের দিয়ে আসি।

আমি বললাম—এখন যেও না বাবা। চিঠি আমি দিয়ে আসব'খন, তুমি বসে চা-টা খাও। বাবা শুনলেন না, চলে গেলেন। বাবার মুখ শুকনো, দেখে বুঝলাম যেজন্যে গিয়েছেন তার কোনো যোগাড় হয়নি, অর্থাৎ চাকরি। চাকরি না হ'লেও আর এদিকে চলে না।

হাতের টাকা ক্রমশ ফুরিয়ে এসেছে। আমরা নীচের যে ঘরে থাকি, গোরুবাছুরেরও সেখানে থাকতে কষ্ট হয়। আমরা এসেছি প্রায় মাস-চারেক হ'ল, এই চার মাসেই যা দেখেছি শুনেছি তা বোধ করি সারা জীবনেও ভুলব না। যাদের কাছে জেঠিমা, কাকীমা, দিদি ব'লে হাসিমুখে ছুটে যাই, তাঁরা যে কেন আমাদের ওপর এমন বিরূপ, কেন তাঁদের ব্যবহার এত নিষ্ঠুর, ভেবেই পাইনে এর কোনো কারণ। আমরা তো আলাদা থাকি, আমাদের খরচে আমাদের রান্না হয়, ওঁদের তো কোনোই অসুবিধের মধ্যে আমরা ফেলিনি, তবু কেন বাড়িসুদ্ধ লোকের আমাদের ওপর এত রাগ?

আমার বাবার আপন ভাই নেই, ওঁরা হ'লেন খুড়তুত-জ্যাঠতুত ভাই। জ্যাঠামশায়ের অবস্থা খুবই ভালো—পাটের বড় ব্যবসা আছে, দুই ছেলে গদিতে কাজ দেখে, ছোট একটি ছেলে এখানকার স্কুলে পড়ে, আর একটি মেয়ে ছিল, সে আমাদের আসবার আগে বসন্ত হয়ে মারা গিয়েছে। মেজকাকার তিন মেয়ে—ছেলে হয়নি, বড় মেয়ের বিয়ে হয়েচে—আর দুই মেয়ে ছোট। ছোটকাকার বিয়ে হয়েছে বেশী দিন নয়—বৌও এখানে নেই। ছোটকাকা অত্যন্ত রাগী লোক, বাড়িতে সর্ব্বদা ঝগড়াঝাঁটি করেন, গানবাজনার ভক্ত, ওপরের ঘরে সকাল নেই সন্ধ্যে নেই হারমোনিয়াম বাজাচ্ছেন।

জ্যাঠাইমার বয়স মায়ের চেয়ে বেশী, কিন্তু বেশ সুন্দরী—একটু বেশী মোটাসোটা। গায়ে ভারী ভারী সোনার গহনা। ওঁর বিয়ের আগে নাকি জ্যাঠামশায়ের অবস্থা ছিল খারাপ—তারপর জ্যাঠাইমা এ বাড়িতে বধূরূপে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংসারে উন্নতিরও সূত্রপাত। প্রতিবেশীরা খোশামোদ ক'রে বলে—আমার সামনেই আমি কতবার শুনেছি—তোমার মত ভাগ্যিমানী ক'জন আছে বড়-বৌ? এদের কি-ই বা ছিল, তুমি এলে আর সংসার সব দিক থেকে উথলে উঠলো, কপাল বলে একেই বটে! সামনে বলা নয়—এমন মন আজকাল ক'জনের বা আছে? দেওয়ায়-থোওয়ায়, খাওয়ানোয়-মাখানোয়—আমার কাছে বাপু হক্ কথা।

মেজখুড়ীমা ওর মধ্যে ভালো লোক। কিন্তু তিনি কারুর সপক্ষে কথা বলতে সাহস করেন না, তাঁর ভাল করবার ক্ষমতা নেই, মন্দ করবারও না। মেজকাকা তেমন কিছু রোজগার করেন না, কাজেই মেজখুড়ীমার কোনো কথা এ বাড়িতে খাটে না।

বছরখানেক কেটে গেল। বাবা কোথাও চাকরি পেলেন না। কত জায়গায় হাঁটাহাঁটি করলেন, শুকনো মুখে কতবার বাড়ি ফিরলেন। হাতে যা পয়সা ছিল ক্রমে ক্রমে ফুরিয়ে এল।

সকালে আমরা বাড়ির সামনে বেলতলায় খেলছিলাম। সীতা বাড়ির ভেতর থেকে বার হয়ে এল, আমি বললুম—চা হয়েছে সীতা?

সীতা মুখ গম্ভীর ক'রে বললে—চা আর হবে না। মা বলেছে চা-চিনির পয়সা কোথায় যে চা হবে?

কথাটা আমার বিশ্বাস হ'ল না, সীতার চালাকি আমি যেন ধরে ফেলেছি, এইরকম সুরে তার দিকে চেয়ে হাসিমুখে বললুম—যাঃ, তুই বুঝি খেয়ে এলি!

চা-বাগানে আমাদের জন্ম, সকালে উঠে চা খাওয়ার অভ্যাস আমাদের জন্মগত, চা না খেতে পাওয়ার অবস্থা আমরা কল্পনাই করতে পারিনে।

সীতা বললে—না দাদা, সত্যি, তুমি দেখে এসো—চা হচ্চে না। তারপরে বিজ্ঞের সুরে বললে—বাবার যে চাকরি হচ্চে না, মা বলছিল ছু-দিন পরে আমাদের ভাতই জুটবে না তো চা!···আমরা এখন গরিব হয়ে গিয়েছি যে।

সীতার কথায় আমাদের দারিদ্র্যের রূপটি নূতনতর মূর্ত্তিতে আমার চোখের সামনে ফুটল। জানতুম যে আমরা গরিব হয়ে গিয়েছি, পরের বাড়িতে পরের মুখ চেয়ে থাকি, ময়লা বিছানায় শুই, জলখাবার খেতে পাইনে, আমাদের কারুর কাছে মান নেই সবই জানি। কিন্তু এ সবেও নিজের দারিদ্র্যের স্বরূপটি তেমন ক'রে বুঝিনি, আজ সকালে চা না খেতে পেয়ে সেটা যেমন ক'রে বুঝলুম।

বিকেলের দিকে বাবা দেখি পথ বেয়ে কোথা থেকে বাড়িতে আসছেন। আমায় দেখে বললেন—শোন্ জিতু, চল্ শিমুলের তুলো কুড়িয়ে আনিগে—

আমি শিমূল তুলোর গাছ এই দেশে এসে প্রথম দেখেছি—গাছে তুলো হয় বইয়ে পড়লেও চোখে দেখেছি এখানে এসে এই বৈশাখ মাসে। আমার ভারি মজা লাগল—উৎসাহ ও খুশির সুরে বললুম—শিমূল তুলো? কোথায় বাবা?···চলো যাই—সীতাকে ডাকবো?

বাবা বললেন—ডাক ডাক, সবাইকে ডাক—চল্ আমরা যাই—

বাবাও আমার পেছনে পেছনে বাড়ি ঢুকলেন। পরের দিন ষষ্ঠী ও দাদার জন্মবার। মা কোথা থেকে খানিকটা ছুধ যোগাড় ক'রে রান্নাঘরের দাওয়ায় উন্নুনে বসে বসে ক্ষীরের পুতুল গড়ছিলেন—বাবার স্বর শুনেই মুখ তুলে চেয়ে এক চমক বাবার দিকে দেখেই একবার চকিত দৃষ্টিতে ওপরে জ্যাঠাইমাদের বারান্দার দিকে কি জন্যে চাইলেন—তারপর পুতুল-গড়া ফেলে তাড়াতাড়ি উঠে এসে বাবার হাত ধরে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেলেন। আমার দিকে ফিরে বললেন—যা জিতু, বাইরে খেলা করগে যা—

আমি অবাক হয়ে গেলুম। বলতে যাচ্ছিলাম, মা, বাবা যে শিমূল তুলো কুড়োবার—, কিন্তু মার মুখের দিকে চেয়ে আমার মুখ দিয়ে কথা বার হ'ল না। একটা কিছু হয়েছে যেন—কিন্তু কি হয়েছে আমি বুঝলাম না। বাবা মদ খেয়ে আসেননি নিশ্চয়—মদ খেলে আমরা বুঝতে পারি—খুব ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি, দেখলেই বুঝি। তবে বাবার কি হ'ল?

অবাক হয়ে বাইরে চলে এলুম।

এখানকার স্কুলে আমি ভর্ত্তি হয়েছি, কিন্তু দাদা আর পড়তে চাইতে না ব'লে তাকে ভর্ত্তি করা হয়নি। প্রথম কয় মাস মাইনের জন্যে মাস্টার মশায়ের তাগাদার চোটে আমার চোখে জল আসত—সাড়ে ন' আনা পয়সা মাইনে—তাও বাড়িতে চাইলে কারুর কাছে পাইনে, বাবার মুখের দিকে চেয়ে বাবার কাছে তাগাদা করতে মন সয়ে না।

শনিবার, সকালে স্কুলের ছুটি হবে। স্কুলের কেরানী রামবাবু একখানা খাতা নিয়ে আমাদের ক্লাসে ঢুকে মাইনের তাগাদা শুরু করলেন। আমার মাইনে বাকি ছু-মাসের—আমায় ক্লাস থেকে উঠিয়ে দিয়ে বললেন—বাড়ি গিয়ে মাইনে নিয়ে এসো খোকা, নইলে আর ক্লাসে বসতে দেবো না কাল থেকে। আমার ভারি লজ্জা হ'ল—ছুঃখ তো হ'লই। আড়ালে ডেকে বললেই তো পারতেন রামবাবু, ক্লাসে সকলের সামনে—ভারি—

ছুপুরে রোদ ঝাঁ-ঝাঁ করছে। স্কুলের বাইরে একটা নিমগাছ। ভারি সুন্দর নিমফুলের ঘন গন্ধটা। সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবলুম কি করা যায়। মাকে বলব বাড়ি গিয়ে? কিন্তু জানি মায়ের হাতে কিছু নেই, এখুনি পাড়ায় ধার করতে বেরুবে, পাবে কি না পাবে, ছোট মুখ

ক'রে বাড়ি ফিরবে—ওতে আমার মনে বড় লাগে।

হঠাৎ আমি অবাক্ হয়ে পথের ওপারে চেয়ে রইলুম—ওপারে সামু নাপিতের মুদিখানার দোকানটা আর নেই, পাশেই সে ফিতে-ঘুন্সির দোকানটাও নেই, তার পাশের জামার দোকানটাও নেই—একটা খুব বড় মাঠ, মাঠের ধারে বড় বড় বাঁশগাছের মত কি গাছের সারি, কিন্তু বাঁশগাছ নয়। দুপুরবেলা নয়, বোধ হয় যেন রাত্রি—জ্যোৎস্না রাত্রি—দূরে সাদা রঙের একটা অদ্ভুত গড়নের বাড়ি, মন্দিরও হতে পারে।

নিমগাছের গুঁড়িটাতে ঠেস্ দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলুম, সাগ্রহে সামনের দিকে ঝুঁকে ভাল দেখতে পাওয়া গেল, তখনো তাই আছে জ্যোৎস্নাভরা একটা মাঠ, কি গাছের সারি—দূরের সাদা বাড়িটা। দু মিনিট···পাঁচ মিনিট। তাড়াতাড়ি চোখ মুছলাম, আবার চাইলুম—এখনও অবিকল তাই। একেবারে এত স্পষ্ট, গাছের পাতাগুলো যেন গুনতে পারি, পাখিদের ডানার সব রঙ বেশ ধরতে পারি।

তার পরেই আবার কিছু নেই, খানিকক্ষণ সব শূন্য—তার পরেই সামু নাপিতের দোকান, পাশেই ফিতে-ঘুন্সির দোকান।

বাড়ি চলে এলুম। যখনই আমি এই রকম দেখি, তখন আমার গা কেমন করে—হাতে পায়ে যেন জোর নেই এমনি হয়। মাথা যেন হালকা মনে হয়। কেন এমন হয় আমার? কেন আমি এ-সব দেখি? কাউকে এ কথা বলতে পারিনে, মা, বাবা, দাদা, সীতা, কাউকে নয়। আমার এমন কোনো বন্ধু বা সহপাঠী নেই, যাকে আমি বিশ্বাস ক'রে সব কথা খুলে বলি। আমার মনে মনে যেন কে বলে—এরা এ-সব বুঝবে না। বন্ধুরা হয়ত হেসে উঠবে, কি ওই নিয়ে ঠাট্টা করবে।

ওবেলা খেয়ে যাইনি। রান্নাঘরে ভাত খেতে গিয়ে দেখি শুধু সিমভাতে আর কুমড়োর ডাঁটাচচ্চড়ি। আমি ডাঁটা খাইনে—সিম যদি বা খাই সিমভাতে একেবারেই মুখে ভাল লাগে না। মাকে রাগ ক'রে বললুম—ও দিয়ে ভাত খাবো কি করে? সিমভাতে দিলে কেন? সিমভাতে আমি খাই কখনও?

কিন্তু মাকে যখন আমি বকছিলুম আমার মনে তখন মায়ের ওপর রাগ ছিল না। আমি জানি আমাদের ভালো খাওয়াতে মায়ের যত্নের ত্রুটি কোনো দিন নেই, কিন্তু এখন মা অক্ষম, অসহায়—হাতে পয়সা নেই, ইচ্ছে থাকলেও নিরুপায়। মায়ের এই বর্ত্তমান অক্ষমতার দরুন মায়ের ওপর যে করুণা সেটাই দেখা দিল রাগে পরিবর্ত্তিত হয়ে। চেয়ে দেখি মায়ের চোখে জল। মনে হ'ল এ সেই মা—চা-বাগানে থাকতে মিস্ নর্টনের কাছ থেকে আমাদের খাওয়ানোর জন্যে কেক্ তৈরি করবার নিয়ম শিখে বাজার থেকে ঘি ময়দা কিশমিশ ডিম চিনি সব আনিয়ে সারা বিকেল ধরে পরিশ্রম ক'রে কতকগুলো স্বাদগন্ধহীন নিরেট ময়দার ঢিপি বানিয়ে বাবার কাছে ও পরদিন মিস্ নর্টনের কাছে হাস্যাস্পদ হয়েছিলেন! তার পর অবিশ্যি মিস্ নর্টন ভাল ক'রে হাতে ধরে শেখায় এবং মা ইদানীং খুব ভাল কেকই গড়তে পারতেন।

মা বাংলা দেশের পাড়াগাঁয়ের ধরণ-ধারণ, রান্না, আচার-ব্যবহার ভাল জানতেন না—অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে চা-বাগানে চলে গিয়েছিলেন, সেখানে একা একা কাটিয়েছেন চিরকাল সমাজের বাইরে—পাড়াগাঁয়ের ব্রত-নেম্ পূজো আচ্চা আচার এ-সব তেমন জানা ছিল না। এদের এই ঘোর আচারী সংসারে এসে পড়ে আলাদা থাকলেও মাকে কথা সহ্য করতে হয়েছে কম নয়। পয়সা থাকলে যেটা হয়ে দাঁড়াত গুণ—হাত খালি থাকাতে সেটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল

ঠাট্টা, বিদ্রূপ, শ্লেষের ব্যাপার—জংলীপনা খিরিস্টানি বা বিবিয়ানা। মার সহ্যগুণ ছিল অসাধারণ, মুখ বুজে সব সহ্য করতেন, কোনোদিন কথাটিও বলেননি। ভয়ে ভয়ে ওদের চালচলন, আচার-ব্যবহার শিখবার চেষ্টা করতেন—নকল করতে যেতেন—তাতে ফল অনেক সময়ে হ'ত উল্টো।

আরও মাসকতক কেটে গেল। সেই ক-মাসে আমাদের যা অবস্থা হয়ে দাঁড়ালো, জীবনে ভাবিওনি কোনো দিন যে অত কষ্টের মধ্যে পড়তে হবে। দু-বেলা ভাত খেতে আমরা ভুলে গেলাম। স্কুল থেকে এসে বেলা তিনটের সময় খেয়ে রাত্রে কিছু খাওয়ার ইচ্ছেও হত না। ভাত খেয়ে স্কুলে যাওয়া ঘটত না প্রায়ই, অত সকালে মা চালের যোগাড় করতে পারতেন না, সেটা প্রায়ই ধার ক'রে নিয়ে আসতে হ'ত। সব সময় হাতে পয়সা থাকত না—এর মানে আমাদের চা-বাগানের শৌখিন জিনিসপত্র, দেরাজ, বাক্স—এই সব বেচে চলছিল—সব সময়ে তার খদ্দের জুটত না। মা বৌমানুষ, বিশেষতঃ এটা অপরিচিত স্থান, নিজের শ্বশুরবাড়ি হলেও এর সঙ্গে এত কাল কোনো সম্পর্কই ছিল না—কিন্তু মা ও সব মানতেন না, লজ্জা ক'রে বাড়ি বসে থাকলে তাঁর চলত না, যেদিন ঘরে কিছু নেই, পাড়ায় বেরিয়ে যেতেন, দু-একটা জিনিস বেচবার কি বন্ধক দেবার চেষ্টা করতেন পাড়ার মেয়েদের কাছে। প্রায়ই শৌখীন জিনিস, হয়ত একটা ভাল কাচের পুতুল, কি গালার খেলনা, চন্দনকাঠের হাতপাখা এই সব—সেলাইয়ের কলটা ছোট কাকীমা সিকি দামে কিনেছিলেন। বাবার গায়ের ভারি পুরু পশমী ওভার-কোটটা সরকাররা কিনে নিয়েছিল আট টাকায়। মোটে এক বছর আগে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে বাবা সেটা তৈরি করেছিলেন।

চাল না হয় একরকম ক'রে জুটলো, কিন্তু আমাদের পরনের কাপড়ের দুর্দশা ক্রমেই বেড়ে উঠছিল। আমাদের সবারই একখানা ক'রে কাপড়ে এসে ঠেকেছে—তাও ছেঁড়া, আমার কাপড়খানা তো তিন জায়গায় সেলাই। সীতা বলত, তুই বড় কাপড় ছিঁড়িস দাদা! কিন্তু আমার দোষ কি? পুরোনো কাপড়, একটু জোরে লাফালাফি করলেই ছিঁড়ে যেত, মা অমনি সেলাই করতে বসে যেতেন।

বাবা আজকাল কেমন হয়ে গেছেন, তেমনি কথাবার্ত্তা বলেন না—বাড়িতেও থাকেন না প্রায়ই। তাঁকে পাওয়াই যায় না যে কাপড়ের কথা বলি। তা ছাড়া বাবার মুখের দিকে চেয়ে কোনো কথা বলতেও ইচ্ছে যায় না। তিনি সব সময়ই চাকরির চেষ্টায় এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ান, কিন্তু কোথাও এ পর্য্যন্ত কিছু জোটেনি। মাস-দুই একটা গোলদারি দোকানে খাতাপত্র লেখবার চাকরি পেয়েছিলেন, কিন্তু এখন আর সে চাকরি নেই—সেজ জ্যাঠামশায়ের ছেলে নবীন বলছিল, নাকি মদ খেয়ে গেছে। কিন্তু এখানে এসে বাবা একদিনও মদ খেয়েছেন ব'লে আমার মনে হয় না, বাবা মদ খেলেই উৎপাত করেন আমরা ভাল করেই জানি, কিন্তু এখানে এসে পর্য্যন্ত দেখচি বাবার মত শান্ত মানুষটি আর পৃথিবীতে নেই। এত শান্ত, এত ভাল মানুষ স্নেহময় লোকটি মদ খেলে কি হয়েই যেতেন! চা-বাগানের সে-সব রাতের কীর্তি মনে হলেও ভয় করে।

রবিবার। আমার স্কুল নেই, আমি সারাদিন বসে বসে ম্যাজেণ্টা গুলে রঙ তৈরি করেছি, দু-তিনটে শিশিতে ভর্তি করে রেখেছি, সীতার পাঁচ-ছখানা পুতুলের কাপড় রঙে ছুপিয়ে দিয়েছি—ক্লাসের একটা ছেলের কাছ থেকে অনেকখানি ম্যাজেণ্টার গুঁড়ো চেয়ে নিয়েছিলুম।

সন্ধ্যার একটু পরেই খেয়ে শুয়েচি। কত রাত্রে যেন ঘুম ভেঙে গেল—একটু অবাক হয়ে চেয়ে দেখি আমাদের ঘরের দোরে জ্যাঠাইমা আমার খুড়তুতো জাঠতুতো ভাইবোনের দল, ছোটকাকা—সবাই দাঁড়িয়ে। মা কাঁদচেন—সীতা বিছানায় সবে ঘুম ভেঙে উঠে বসে চোখ

মুছছে। আমার জ্যাঠতুতো ভাই হেসে বললে—ঐ গ্যাখ্‌ তোর বাবা কি করচে! চেয়ে দেখি ঘরের কোণে খাটে বাবা তিনটে বালিশের তুলো ছিঁড়ে পুঁটলি বাঁধচেন। তুলোতে বাবার চোখমুখ, মাথার চুল, সারা গা এক অদ্ভুত রকম হয়েছে দেখতে। আমি অবাক্‌ হয়ে জিজ্ঞেস করলুম—কি হয়েচে বাবা?

বাবা বললেন—চা-বাগানে আবার চাকরি পেয়েছি—ছোট সাহেব তার করেচে; সকালের গাড়িতে যাব কিনা তাই পুঁটুলিগুলো বেঁধেছেঁদে এখন না রাখলে—কটা বাজল রে খোকা?

আমার বয়স কম হলেও আমার বুঝতে দেরি হ'ল না যে এবার বাবা মাতাল হননি। এ অন্য জিনিস। তার চেয়েও গুরুতর কিছু। ঘরের দৃশ্যটা আমার মনে চিরকালের মতো একটা ছাপ দিয়ে গিয়েছিলে—জীবনে কখনও ভুলিনি—চোখ বুজলেই উত্তরজীবনে আবার সে-রাত্রির দৃশ্যটা মনে এসেছে। একটা মাত্র কেরোসিনের টেমি জ্বলচে ঘরে—তারই রাঙা ক্ষীণ আলোয় ঘরের কোণে বাবার তুলো-মাখা চেহারা—মাথায় মুখে কানে পিঠে সর্ব্বাঙ্গে ছেঁড়া বালিশের লালচে পুরানো বিচিওয়ালা তুলো, মেঝেতে বসে মা কাঁদচেন—দরজার কাছে কৌতুক দেখতে খুড়ীমা জ্যাঠাইমারা জড় হয়েচেন—খুড়তুতো ভাই-বোনেরা হাসচে।···দাদাকে ঘরের মধ্যে দেখতে পেলাম না, বোধ হয় বাইরে কোথাও গিয়ে থাকবে।

পরদিন সকালে আমাদের ঘরের সামনে উঠানে দলে দলে লোক জড় হ'তে লাগল। এদের মুখে শুনে প্রথম বুঝলাম বাবা পাগল হয়ে গিয়েছেন। সংসারের কষ্ট, মেয়ের বিয়ের ভাবনা, পরের বাড়ির এই যন্ত্রণা—এই সব দিনরাত ভেবে ভেবে বাবার মাথা গিয়েছে বিগ্‌ড়ে। অবিশ্যি এ-সব কারণ অনুমান করেছিলুম বড় হ'লে, অনেক পরে।

বেলা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকের ভিড় বাড়তে লাগল, যারা কোনো দিন এর আগে বাবার সঙ্গে মৌখিক ভদ্র আলাপটা করতেও আসেনি তারা মজা দেখতে আসতে লাগল দলে দলে।

বাবার মূর্ত্তি হয়েছে দেখতে অদ্ভুত। রাত্রে না ঘুমিয়ে চোখ বসে গিয়েছে—চোখের কোণে কালি মেড়ে দিয়েছে যেন। সর্ব্বাঙ্গে তুলো মেখে বাবা সেই রাতের বিছানার ওপরেই বসে আপন মনে কত কি বকছেন। ছেলেপিলের দল এপাড়া-ওপাড়া থেকে এসেছে। তারা ঘরের দোরে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়ে। কেউ বা উঁকি মেরে দেখচে—হাসাহাসি করচে। আমাদের সঙ্গে পড়ে এই পাড়ার নবীন বাঁড়ুয্যের ছেলে শান্টু—সে একবার উঁকি মেরে দেখতেই বাবা তাকে কি একটা ধমক্‌ দিয়ে উঠলেন। সে ভান-করা ভয়ের সুরে ব'লে উঠল—ও বাবা! মারবে নাকি? বলেই পিছিয়ে এল। ছেলের দলের মধ্যে একটা হাসির ঢেউ পড়ে গেল।

একজন বললে—আবার কি রকম ইংরিজি বলছে গ্যাখ্‌—

আমি ও সীতা কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে আছি। আমরা কেউ কোন কথা বলচি নে।

আর একটু বেলা হ'লে জ্যাঠামশায় কি পরামর্শ করলেন সব লোকজনের সঙ্গে—আমার মাকে উদ্দেশ করে বললেন—বৌমা, সবই তো দেখতে পাচ্চ—তোমাদের কপাল ছাড়া আর কি বলব। ভূষণকে এখন বেঁধে রাখতে হবে—সেই মতই সবাই করেছেন। ছেলেপিলের বাড়ি—পাড়ার ভেতরকার কাণ্ড—ওরকম অবস্থায় কখন কি ক'রে বসে, তা বলা যায় না···তা তোমায় একবার বলাটা দরকার তাই—

আমার মনে বড় কষ্ট হ'ল—বাবাকে বাঁধবে কেন? বাবা তো এক বকুনি ছাড়া আর কারুর কিছু অনিষ্ট করতে যাচ্ছেন না—কেন তবে—

আমার মনের ভাষা বাক্য খুঁজে পেল না প্রকাশের—মনেই রয়ে গেল। বাবাকে সবাই মিলে বাঁধলে! আহা, কি কষে কষেই বাঁধলে। অন্য দড়ি কোথাও পাওয়া গেল না বা ছিল না—জ্যাঠামশায়দের খিড়কি-পুকুর ধারের গোয়াল-বাড়ি থেকে গরু বাঁধবার দড়ি নিয়ে এল—তাই দিয়ে বাঁধা হ'ল।

আমার মনে হ'ল অতটা জোর ক'রে বাবাকে বাঁধবার দরকার কি! বাবার হাতের শির দড়ির মত ফুলে উঠেছে যে। সেজ কাকাকে চুপিচুপি বললুম—কাকাবাবু, বাবার হাতে লাগচে, অত ক'রে বেঁধেচে কেন? বলুন না ওদের?

কাকা সে কথা জ্যাঠামশায়কে ও নিতাইয়ের বাবাকে বলতে তাঁরা বললেন—তুমিও কি খেপলে নাকি রমেশ? হাত আলগা থাকবে পাগলের?···তা হলে পা খুলতে, কতক্ষণ—তার পরে আমার দিকে চেয়ে জ্যাঠামশায় বললেন—যাও জিতু বাবা—তুমি বাড়ির ভেতরে যাও——নয়তো এখন বাইরে গিয়ে বসো।

আবার বাবার হাতের দিকে চেয়ে দেখলুম—দড়ির দাগ কেটে বসে গিয়েছে বাবার হাতে। সেই রকম তুলোমাখা অদ্ভুত মূর্ত্তি!···

বাইরে গিয়ে আমি একা গাঁয়ের পেছনের মাঠের দিকে চ'লে গেলুম—একটা বড় তেঁতুল গাছের তলায় সারা দুপুর ও বিকেল চুপ ক'রে বসে রইলুম।

দিন কতক এই ভাবে কাটল। তারপর পাড়ার দু-পাঁচজন লোক এসে জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে কি পরামর্শ করলে। বাবাকে কোথায় তারা নিয়ে গেল, সবাই বললে কলকাতায় হাসপাতালে নিয়ে গেছে। তারা ফিরেও এল, শুনলুম, বাবাকে নাকি হাসপাতালে ভর্ত্তি করে নিয়েছে। শীগ্‌গিরই সেরে বাড়ি ফিরবেন। আমরা আশ্বস্ত হলুম।

দশ-বারো দিন পরে একদিন বিকেলের দিকে আমি ও সীতা পথে খেলা করচি, এমন সময় সীতা বললে—ঐ যে বাবা!···দূরে পথের দিকে চেয়ে দেখি বাবাই বটে। ছুটে আমরা বাড়িতে মাকে খবর দিতে গেলুম। একটু পরে বাবা বাড়ি ঢুকলেন—এক হাঁটু ধুলো, রুক্ষ চুল। ওপর থেকে জ্যাঠাইমা নেমে এলেন, কাকারা এলেন। বাবাকে দেখে সবাই চটে গেলেন। সবাই বুঝতে পারলে বাবা এখনও সারেন নি, তবে সেখান থেকে তাড়াতাড়ি চলে আসার কি দরকার?

বাবা একটু বসে থেকে বললেন, ভাত আছে? কাল ঐ দিকের একটা গাঁয়ে দুপুরে দুটো খেতে দিয়েছিল, আর কিছু খাই নি সারাদিন, খিদে পেয়েছে। কলকাতা থেকে পায়ে হেঁটে আসচি—ছেলেপিলে ছেড়ে থাকতে পারলাম না—চলে এলাম।

একটু পরেই বোঝা গেল বাবা হাসপাতাল থেকে পালিয়ে এসেছেন এবং যেমন পাগল তেমনি আছেন। এবার আমাদের রাগ হ'ল—মায়ের কথা বলতে পারিনে, কারণ তাঁকে রাগ প্রকাশ করতে কখনও দেখিনি—কিন্তু আমি সীতা দাদা তিন ভাইবোনে খুব চটলাম।

আমাদের চটবার কারণও আছে—খুব সঙ্গত কারণই আছে। আমাদের প্রাণ এখানে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। বাবা আবার পুরোমাত্রায় পাগল হয়ে উঠলেন—তিনি দিনরাত বসে বসে বকেন আর কেবল খেতে চান। মা দুটি বাসি মুড়ি, কোনো দিন বা ভিজে চাল, কোনো দিন শুধু একটু গুড়—এই খেতে দেন। তাও সব দিন বা সব সময় জোটানো কষ্টকর। আমরা দুপুরে খাই তো রাতে আর কিছু খেতে পাইনে—নয়ত সারাদিন পরে হয়ত সন্ধ্যার সময় খাই। মা কোথা থেকে চাল যোগাড় করে আনেন আমরা জানিনে—কখনও জিজ্ঞেসও করিনি। কিন্তু বাড়িতে আর আমাদের তিষ্টুবার জো নেই। বাড়িসুদ্ধ লোক আমাদের

ওপর বিদ্রূপ—দু-বেলা তাদের অনাদর আর মুখনাড়া সহ্য করা আমাদের অসহ্য হয়ে উঠেছে। চা-বাগানের দিনগুলোর কথা মনে হয়, সেখানে আমাদের কোনো কষ্ট ছিল না—অবস্থা ছিল অত্যন্ত সচ্ছল, ছেলেবেলায় সীতাকে ভুটিয়া চাকরে নিয়ে বেড়াত আর থাপা মানুষ করেছিল আমাদের। ছ-বছর বয়স পর্যন্ত আমি থাপার কাঁধে উঠে বেড়াতাম মনে আছে। আমাদের এই বর্ত্তমান দুরবস্থার জন্য বাবাকে আমরা মনে মনে দায়ী করেছি। বাবা কেন আবার ভাল হয়ে সেরে উঠুন না? তা হ'লে আর আমাদের কোনো দুঃখই থাকে না। কেন বাবা ওরকম পাগলামি করেন? ওতে লজ্জায় যে ঘরে বাইরে আমাদের মুখ দেখাবার জো নেই।

সেদিন সকালে সেজ খুড়ীমা এসে আমাদের সঙ্গে খুব ঝগড়া বাধালেন। মেজ খুড়ীমাও এসে যোগ দিলেন। তাঁদের বাগানে বাতাবি নেবু গাছ থেকে চার-পাঁচটা পাকা নেবু চুরি গিয়েছে। খুড়ীমা এসে মাকে বললেন—এ আমাদেরই কাজ—আমরা খেতে পাইনে, আমরাই নেবু চুরি ক'রে ঘরে রেখেছি। তাঁরা সবাই মিলে আমাদের ঘর খানাতল্লাসী করতে চাইলেন। মা বললেন—এসে দেখে যান মেজদি, আমার ঘরে তো লোহার সিন্দুক নেই যে সেখানে আমার ছেলেমেয়েরা নেবু লুকিয়ে রেখেছে···এসে দেখুন—

শেষ পর্য্যন্ত বাবা ঘরে আছেন ব'লে তাঁরা ঘরে ঢুকতে পারলেন না, কিন্তু সবাই ধরে নিলে যে নেবু আমাদের ঘরে আছে, খানাতল্লাসী করলেই বেরিয়ে পড়ত। খুব ঝগড়াঝাঁটি হ'ল—তবে সেটা হ'ল একতরফা, কারণ এ পক্ষ থেকে তার জবাব কেউ দিল না।

জ্যাঠাইমা এ বাড়ির কর্ত্রী, তাঁকে সবাই মেনে চলে, ভয়ও করে। তিনি এসে বললেন—হয় তোমরা বাড়ি থেকে চলে যাও, নয়ত ঘরের ভাড়া দাও।

সীতা এসে আমাকে বললে—জ্যাঠাইমা এবার বাড়িতে আর থাকতে দেবে না, না দেবে না দেবে, আমরা কোথাও চলে যাই চল দাদা।

দিন-দুই পরে জ্যাঠামশাইদের সঙ্গে কি একটা মিটমাট হ'ল। ঠিক হ'ল যে দাদা চাকরির যোগাড় করতে কলকাতায় যাবে, ঘরে আমরা আপাততঃ কিছুকাল থাকতে পাব। কিন্তু বাড়ির ও পাড়ার সবাই বললে পাগলটাকে আর বাড়ি রেখে দরকার নেই, ওকে জলে-জঙ্গলে কোথাও ছেড়ে দিয়ে আয়।

সত্যি কথা বলতে গেলে বাবার উপর আমাদের কারুর আর মমতা ছিল না। বাবার চেহারাও হয়ে উঠেছে অদ্ভুত। একমাথা লম্বা চুল জটা পাকিয়ে গিয়েছে—আগে আগে মা নাইয়ে দিতেন, আজকাল বাবা কিছুতেই নাইতে চান না, কাছে যেতে দেন না, কাপড় ছাড়েন না···গায়ের গন্ধে ঘরে থাকা অসম্ভব। মা একদিনও রাত্রে ঘুমুতে পারেন না—বাবা কেবলই ফাই-ফরমাশ করেন—জল দাও পান দাও আর কেবলই বলেন খিদে পেয়েছে। কখনও বলেন চা ক'রে দাও। না পেলেই তিনি আরও ক্ষেপে ওঠেন—এক মা ছাড়া তখন আর কেউ সামলে রাখতে পারে না—আমরা তখন ঘর ছেড়ে পালিয়ে যাই, মা বুঝিয়ে-সুজিয়ে শান্ত ক'রে চুপ করিয়ে রাখেন, নয়ত জোর ক'রে বালিশে শুইয়ে দিয়ে বাতাস করেন, পা টিপে দেন—কিন্তু তাতে বাবা সাময়িক চুপ করে থাকেন বটে, ঘুমোন না। পাগল হয়ে পর্য্যন্ত বোধ হয় একদিনও বাবার ঘুম হয় নি। নিজেও ঘুমুবেন না; কাউকে ঘুমুতেও দেবেন না—সারারাত চীৎকার, বকুনি, ইংরেজি বক্তৃতা, গান—এই সব করবেন। সবাই বলে, ঘুমুলে নাকি বাবার রোগ সেরে যেত।

শেষ পর্য্যন্ত হয়ত মা মত দিয়েছিলেন, হয়ত বলেছিলেন,—তোমরা যা ভাল বোঝ করো

* *

বাঁপু। মোটের ওপর একদিন স্কুলে দাদা এসে বললে—সকাল সকাল বাড়ি চল আজ জিতু—আজ বাবাকে আড়াগাঁয়ে জলার ধারে ছেড়ে দিয়ে আসতে হবে—তুই, আমি, নিতাই, সিধু আর মেজকাকা যাব।

একটু পরে আমি ছুটি নিয়ে বেরুলাম। গিয়ে দেখি মা দালানে বসে কাঁদচেন, আমরা যাবার আগেই নিতাই এসে বাবাকে নিয়ে গিয়েছে। আমরা খানিক দূরে গিয়ে ওদের নাগাল পেলাম—পাড়ার চার-পাঁচজন ছেলে সঙ্গে আছে, মধ্যিখানে বাবা। ওরা বাবার সঙ্গে বাজে বকছে—শিকারের গল্প করচে, বাবাও খুব বকচেন। নিতাই আমাকে বাবার সামনে যেতে বারণ করাতে আমি আর দাদা পেছনেই রইলাম। ওরা মাঠের রাস্তা ধরে অনেক দূর গেল, একটা বড় বাগান পার হ'ল, বিকেলের পড়ন্ত রোদে ঘেমে আমরা সবাই নেয়ে উঠলাম। রোদ যখন পড়ে গিয়েছে তখন একটা বড় বিলের ধারে সবাই এসে পৌছলাম। নিতাই বললে—এই তো আড়াগাঁয়ের জলা—চল, বিলের ওপারে নিয়ে যাই—ওই হোগলা বনের মধ্যে ছেড়ে দিলে আর পথ খুঁজে পাবে না রাত্তিরে। আমরা কেউ ওপারে গেলুম না—গেল শুধু সিধু আর নিতাই। খানিকটা পরে ওরা ফিরে এসে বললে, চল্ পালাই—তোর বাবাকে একটা সিগারেট খেতে দিয়ে এসেছি—বসে বসে টানচে। চল্ ছুটে পালাই—

সবাই মিলে দৌড় দিলাম। দাদা তেমন ছুটতে পারে না, কেবলই পেছনে পড়তে লাগল। সন্ধ্যার ঘোরে জলা আর জঙ্গলের মধ্যে পথ খুঁজে পাওয়া যায় না—এক প্রহর রাত হয়ে গেল বাড়িতে পৌছুতে। কিন্তু তিন দিনের দিন বাবা আবার বাড়ি এসে হাজির। চেহারার দিকে তাকানো যায় না—কাদামাখা ধুলোমাখা অতি বিকট চেহারা। বেল না কি ভেঙে খেয়েছেন—সারা মুখে, গালে বেলের আঠা ও শাঁস মাখানো। মা নাইয়ে ধুইয়ে ভাত খেতে দিলেন, বাবা খাওয়া-দাওয়ার পর সেই যে বিছানা নিলেন, দু' দিন চার দিন ক'রে ক্রমে পনের দিন কেটে গেল, বাবা আর বিছানা থেকে উঠলেন না। লোকটা যে কেন বিছানা ছেড়ে ওঠেন না—তার কি হয়েছে—এ কথা কেউ কোনদিন জিজ্ঞেসও করলে না। মা যেদিন যা জোটে খেতে দেন, মাঝে মাঝে নাইয়ে দেন—পাড়ার কোন লোকে উঁকি মেরেও দেখে গেল না।

জ্যাঠামশাইরা হতাশ হয়ে গিয়েছেন। তাঁরা আর আমাদের সঙ্গে কথা কন না, তাঁদের ঘরে-দোরে ওঠা আমাদের বন্ধ। আমরা কথা বলি চুপি চুপি, চলি পা টিপে টিপে চোরের মত, বেড়াই মহা অপরাধীর মত—পাছে ওঁরা রাগ করেন, বিরক্ত হন, আবার ঘর থেকে তাড়িয়ে দিতে আসেন।

একদিন না খেয়ে স্কুলে পড়তে গিয়েছি—অন্য দিনের মত টিফিনের সময় সীতা খাবার জন্যে ডাকতে এল না। প্রায়ই আমি না খেয়ে স্কুলে আসতাম, কারণ অত সকালে মা রান্না করতে পারতেন না—রান্না শুধু করলেই হ'ল না, তার যোগাড় করাও তো চাই। মা কোথা থেকে কি যোগাড় করতেন, কি ক'রে সংসার চালাতেন, তিনিই জানেন। আমি কখনও তা নিয়ে ভাবি নি। আমি ক্ষুধাতুর অবস্থায় বেলা একটা পর্যন্ত ক্লাসের কাজ ক'রে যেতাম আর ঘন ঘন পথের দিকে চাইতাম এবং রোজই একটায় টিফিনের সময় সীতা এসে ডাক দিত—দাদা, ভাত হয়েচে খাবে এসো।

এ-দিন কিন্তু একটা বেজে গেল, দুটো বেজে গেল, সীতা এল না। ক্লাসের কাজে আমার আর মন নেই—আমি জানলা দিয়ে ঘন ঘন বাইরে পথের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখচি। আরও আধ ঘণ্টা কেটে গেল, বেলা আড়াইটা। এমন সময় কলুদের দোকানঘরের কাছে সীতাকে

আসতে দেখতে পেলাম। আমার ভারি রাগ হ'ল, অভিমানও হ'ল। নিজেরা সব খেয়ে-দেয়ে পেট ঠাণ্ডা ক'রে এখন আসছেন।

মাস্টারের কাছে ছুটি নিয়ে তাড়াতাড়ি বাইরে গেলাম। সীতার দিকে চেয়ে দূর থেকে বললাম—বেশ দেখচি—আমার বুঝি আর ক্ষিদে-তেষ্টা পায় না? কটা বেজেছে জানিস?

সীতা বললে—বাড়ি এস ছোড়দা, তোমার বইদপ্তর নিয়ে ছুটি ক'রে এস গে—

আমি বললাম—কেন রে?

সীতা বললে—এস না, ছুটির আর দেরি বা কত? তিনটে বেজেচে।

আমার মনে হ'ল একটা কি যেন হয়েচে। স্কুল থেকে বেরিয়ে একটু দূর এসেই সীতা বললে—বাবা মারা গিয়েচে ছোড়দা।

আমি থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম—সীতার মুখের দিকে চেয়ে সে যে মিথ্যে কথা বলছে এমন মনে হ'ল না। বললাম—কখন?

সীতা বললে—বেলা একটার সময়—

নিজের অজ্ঞাতসারে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—নিয়ে গিয়েচে তো?

অর্থাৎ গিয়ে মৃতদেহ দেখতে না হয়। কিন্তু সীতা বললে—না, নিয়ে এখনও কেউ যায় নি। মা একা কি করবে?…জ্যাঠামশাই বাড়ি নেই—ছোট কাকা একবার এসে দেখে চলে গেলেন—আর আসেন নি। মেজ কাকা পাড়ার লোক ডাকতে গেছেন।

বাড়িতে ঢুকতেই মা বললেন—ঘরের মধ্যে আয়—মড়া ছুঁয়ে বসে থাকতে হবে, বোস্ এখানে।

কেউই কাঁদছে না। আমারও কান্না পেল না—বরং একটা ভয় এল—একা মড়ার কাছে কেমন ক'রে কতক্ষণ বসে থাকব না জানি!

অনেকক্ষণ পরে শুনতে পেলুম আমাদের পাড়ার কেউ মৃতদেহ নিতে যেতে রাজী নয়, বাবা কি রোগে মারা গেছেন কেউ জানে না, তাঁর প্রায়শ্চিত্ত করানো হয় নি মৃত্যুর পূর্বে—এ অবস্থায় কেউ সৎকার করতে রাজী নয়। প্রায়শ্চিত্ত এখন না করালে কেউ ও মড়া ছোঁবে না।

প্রায়শ্চিত্ত করাতে পাঁচ-ছ টাকা নাকি খরচ। আমাদের হাতে অত তো নেই—মা বললেন। কে যেন বললে—তা এ অবস্থায় হাতে না থাকলে লোকের কাছে চেয়ে-চিন্তে আনতে হয়, কি আর করবে?

দাদাকে মা ও-পাড়ার কাছে পাঠালেন টাকার জন্যে। খানিকটা পরে ও-পাড়া থেকে জনকতক ষণ্ডামত লোক এল—শুনলাম তারা গালাগালি দিতে দিতে বাড়িতে ঢুকছে—এমন ছোটলোকের পাড়াও তো কখনো দেখি নি? কোথায় পাবে এরা যে প্রাচিত্তির করাবে? প্রাচিত্তির না হ'লে মড়া কি সারা দিনরাত ঘরেই পড়ে থাকবে? যত ছোটলোক সব—কোনো ভয় নেই, দেখি মড়া বার হয় কিনা।

আমি উত্তেজনার মাথায় মড়া ছুঁয়ে বসে থাকার কথা ভুলে গিয়ে তাড়াতাড়ি দোরের কাছে এসে দাঁড়ালাম। এদের মধ্যে আমি একজনকে কেবল চিনি। মাঠবাড়ির ফুটবল খেলার ময়দানে দেখেছিলাম।

ওরা নিজেরাই কোথা থেকে বাঁশ কেটে নিয়ে এল—পাট নিয়ে এসে দড়ি পাকালে, তারপর বাবাকে বার ক'রে নিয়ে গেল—দাদা গেল সঙ্গে সঙ্গে শ্মশানে। একটু পরে সন্ধ্যা হ'ল।

সেজ খুড়ীমা এসে বললেন—মুড়ি খাবি জিতু? আমি ও সীতা মুড়ি খেয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

তিন বছর আগেকার কথা এসব। তার পর থেকে এ বাড়িতেই আছি। জ্যাঠামশাইরা প্রথমে রাজি হন নি, দাদা ষষ্ঠীতলায় বটগাছের নীচে মুদিখানার দোকান করেছিল—সামান্য পুঁজি, আড়াই সের চিনি, পাঁচ সের ডাল, পাঁচ সের আটা, পাঁচ পোয়া ঝাল-মশলা—এই নিয়ে দোকান কতদিন চলে? দাদা ছেলেমানুষ, তা ছাড়া ঘোরপেঁচ কিছু বোঝে না, একদিক থেকে সব ধারে বিক্রী করচে, যে ধারে নিয়েচে সে আর ফিরে দোকানের পথ মাড়ায় নি। দোকান উঠে যাওয়ার পরে দাদা চাকরির চেষ্টায় বেরুলো, সে তার ছোট মাথায় আমাদের সংসারের সমস্ত ভাবনা-ভার তুলে নিয়ে বাবার প্রতিনিধি রূপে আমাদের খাওয়া-পরানোর দুশ্চিন্তায় রাতে ঘুমুতো না, সারা দিন চাকরি খুঁজে বেড়াত। নস্কির কারখানায় একটা সাত টাকা মাইনের চাকরিও পেল—কিন্তু বেশীদিন রইল না, মাস-দুই পরে তারা বললে—ব্যবসার অবস্থা খারাপ, এখন লোক দরকার নেই।

সুতরাং জ্যাঠামশায়দের সংসারে মাথা গুঁজে থাকা ছাড়া আমাদের উপায় বা কি? নিতান্ত লোকে কি বলবে এই ভেবে এঁরা রাজী হয়েছেন। কিন্তু এখানে আমাদের খাপ খায় না—এখানে মাত্র যে শুধু এ বাড়িতে তা নয়, এ দেশটার সঙ্গেই খাপ খায় না। বাংলা দেশ আমাদের কারও ভাল লাগে না—আমার না, দাদার না, সীতার না, মায়েরও না। না দেশটা দেখতে ভাল, না এখানকার লোকেরা ভাল। আমাদের চোখে এ দেশ বড় নিচু, আঁটাসাঁটা, ছোট ব'লে মনে হয়—যে-দিকেই চাই চোখ বেধে যায়, হয় ঘরবাড়িতে, না হয় বাঁশবনে আমবনে। কোথাও উঁচুনীচু নেই, একঘেয়ে সমতলভূমি, গাছপালারও বৈচিত্র্য নেই। আমাদের এ গাঁয়ের যত গাছপালা আছে, তার বেশীর ভাগ এক ধরনের ছোট ছোট গাছ, এর নাম বলে আশশেওড়া, তাদের পাতায় এত ধুলো যে সবুজ রঙ দিনরাত চাপা পড়ে থাকে। এখানে সব যেন দীনহীন, সব যেন ছোট মাপকাঠির মাপে গড়া।

আমাদের দিক থেকে তো গেল এই ব্যাপার। ওঁদের দিক থেকে ওঁরা আমাদের পর ক'রে রেখেছেন এই তিন-চার বছর ধরেই। ওঁদের আপনার দলের লোক ব'লে ওঁরা আমাদের ভাবেন না। আমরা খিরিস্টান, আচার জানিনে, হিঁদুয়ানী জানিনে—জংলী জানোয়ারের সামিল, গারো পাহাড়ী অসভ্য মানুষদের সামিল। পাহাড়ী জাতিদের সম্বন্ধে ওঁরা যে খুব বেশী জানেন তা নয়—এবং জানেন না বলেই তাদের সম্বন্ধে ওঁদের ধারণা অদ্ভুত ও আজগুবী ধরনের।

এদেশে শীতকাল নেই—মাস দুই-তিন একটু ঠাণ্ডা পড়ে। তা ছাড়া সারা বছর ধ'রে গরম লেগেই আছে—আর সে কি সাংঘাতিক গরম! সে গরমের ধারণা ছিল না কোন কালে আমাদের। রাতের পর রাত ঘুম হয় না, দিনমানেও ঘামে বিছানা ভিজে যায় ব'লে ঘুম হয় না। গা জ্বলে, মাথার মধ্যে কেমন করে, রাত্রে যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে এক-একদিন। তার ওপরে মশা। কি সুখেই লোকে এ-সব দেশে বাস করে!

॥ ৪ ॥

জ্যাঠামশাইদের বাড়ির শালগ্রামশিলার ওপর আমার ভক্তি ছিল না। ওঁদের জাঁকজমক ও পূজার সময়কার আড়ম্বরের ঘটা দেখে মন আরও বিরূপ হয়ে উঠল। আগেই বলেছি আমার মনে হ'ত ওঁদের এই পূজা-অর্চনার ঘটার মূলে রয়েছে বৈষয়িক উন্নতির জন্যে ঠাকুরের প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখানো ও ভবিষ্যতে যাতে আরও টাকাকড়ি বাড়ে সে উদ্দেশ্যে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা জানানো। তাঁকে প্রসন্ন রাখলেই এঁদের আয় বাড়বে, দেশে খাতির বাড়বে—আমার জ্যাঠাই-মাকে সবাই বলবে ভাল, সংসারের লক্ষ্মী, ভাগ্যবতী—তাঁর পয়েতে এ-সব হচ্ছে, সবাই খোশামোদ করবে, মন যুগিয়ে চলবে। পাশাপাশি অমনি আমার মায়ের ছবি মনে আসে। মা কোন্ গুণে জ্যাঠাইমার চেয়ে কম? মাকে চা-বাগানে দেখেছি কল্যাণী মূর্ত্তিতে—লোকজনকে খাওয়ানো-মাখানো, কুলীদের ছেলেমেয়েদের পুঁতির মালা কিনে দেওয়া, আদর-যত্ন করা, আমাদের একটু অসুখে রাত জেগে বিছানায় বসে থাকা। কাছাকাছি কোন চা-বাগানের বাঙালীবাবু সোনাদায় নেমে যখন বাগানে যেত আমাদের বাসায় না খেয়ে যাবার উপায় ছিল না। আর সে-ই মা এখানে এঁদের সংসারের দাসী, পরনে ছেঁড়া ময়লা কাপড়, কাজ করতে পারলে সুখ্যাতি নেই, না পারলে বকুনি আছে, গালাগাল আছে—সবাই হেনস্থা করে, কারও কাছে এতটুকু মান নেই, মাথা তুলে বেড়াবার মুখ নেই। কেন, ঠাকুরকে ঘুষ দিতে পারেন না ব'লে? আমার মনে হ'ত জ্যাঠাইমাদের শালগ্রামশিলা এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে আছেন, তিনি ষোড়শোপচারে পূজো পেয়ে জ্যাঠাইমাকে বড় ক'রে দিয়েছেন, অন্য সকলের উপর জ্যাঠাইমা যে অত্যাচার অবিচার করছেন, তা চেয়েও দেখছেন না ঠাকুর।

একদিন সন্ধ্যাবেলা ঠাকুরঘরে আরতি শুরু হয়েছে; নরু, সীতা, সেজ কাকার ছেলে পুলিন আর আমি দেখতে গেছি। পুরুতঠাকুর ওদের সবারই হাতে একটা করে রুপোবাঁধানো চামর দিলে—আরতির সময় তারা চামর দুলুতে লাগল। আমার ও সীতার হাতে দিলে না। সীতা চাইতে গেল, তাও দিলে না। একটু পরে ধূপধুনোর ধোঁয়ায় ও সুগন্ধে দালান ভরে গিয়েছে, বুলু ও ফেণী কাঁসর বাজাচ্ছে, পুরুতঠাকুরের ছোট ভাই রাম ঘড়ি পিটুচে, পুরুতঠাকুর তন্ময় হয়ে পঞ্চপ্রদীপে ঘিয়ের বাতি জ্বেলে আরতি করছে—আমি ও সীতা ছিটের দোলাইমোড়া ঠাকুরের আসনের দিকে চেয়ে আছি—এমন সময় আমার মনে হ'ল এ দালানে শুধু আমরা এই ক'জন উপস্থিত নেই, আরো অনেক লোক উপস্থিত আছে, তাদের দেখা যাচ্ছে না, তারা সবাই অদৃশ্য। আমার গা ঘুরতে লাগল, আর কানের পেছনে মাথার মধ্যে একটা জায়গায় যেন কতকগুলো পিঁপড়ে বাসা ভেঙে বেরিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে গেল। আমি জানি, এ আমার চেনা, জানা, বহুপরিচিত লক্ষণ, অদৃশ্য কিছু দেখবার আগেকার অবস্থা—চা-বাগানে এ-রকম কতবার হয়েছে। শরীরের মধ্যে কেমন একটা অস্বস্তি হয়—সে ঠিক ব'লে বোঝানো যায় না, জ্বর আসবার আগে যেমন লোক বুঝতে পারে এইবার জ্বর আসবে, এও ঠিক তেমনি। আমি সীতাকে কি বলতে গেলাম, পিছু হটে গিয়ে দালানের থাম ঠেস দিয়ে দাঁড়ালাম, গা বমি-বমি ক'রে উঠলে লোকে যেমন ক'রে সে ভাবটা কাটাবার চেষ্টা করে, আমিও সেই রকম স্বাভাবিক অবস্থায় থাকবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলাম—কিছুতেই কিছু হ'ল না, ধীরে ধীরে পূজার দালানের তিন-ধারের দেওয়াল আমার সামনে থেকে অনেক দূরে…অনেক দূরে সরে যেতে লাগল…কাঁসর ঘড়ির আওয়াজ ক্ষীণ হয়ে এল…কতকগুলো বেগুনি ও রাঙা রঙের আলোর চাকা যেন একটা আর একটার পিছনে তাড়া করছে…সারি সারি বেগুনি ও রাঙা আলোর চাকার খুব

লম্বা সারি আমার চোখের সামনে দিয়ে খেলে যাচ্ছে—তারপর আমার বাঁয়ে অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটা বড় নদী, ওপারেরও সুন্দর গাছপালা, নীল আকাশ—এপারেও অনেক ঝোপ বন—কিন্তু যেন মনে হ'ল সব জিনিসটা আমি ঝাড়লণ্ঠনের তেকোণা কাচ দিয়ে দেখচি—নানা রঙের গাছপালা ও নদীর জলের ঢেউয়ের নানা রঙ—ওপারটায় লোকজনে ভরা, মেয়েও আছে, পুরুষও আছে—গাছপালার মধ্যে দিয়ে একটা মন্দিরের সরু চূড়া ঠেলে আকাশে উঠেছে···আর ফুল যে কত রঙের আর কত চমৎকার তা মুখে বলতে পারিনে, গাছের সারা গুঁড়ি ভ'রে যেন রঙিন ও উজ্জ্বল থোকা থোকা ফুল···হঠাৎ সেই নদীর একপাশে জলের ওপর ভাসমান অবস্থায় জ্যাঠামশায়ের ঠাকুর-ঘরটা একটু একটু ফুটে উঠল, তার চারিদিকে নদী, কড়িকাঠের কাছে কাছে সে নদীর ধারের ডাল তার থোকা থোকা ফুলসুদ্ধ হাওয়ায় দুলছে···ওদের সেই দেশটা যেন আমাদের ঠাকুরঘরের চারিপাশ ঘিরে···মধ্যে, ওপরে, নীচে, ডাইনে, বাঁয়ে আমার মন আনন্দে ভরে গেল···কান্না আসতে চাইল···কি জানি কোন্ ঠাকুরের ওপর ভক্তিতে—আমার ঘোর কাটল একটা চেঁচামেচির শব্দে। আমায় সবাই মিলে ঠেলচে। সীতা আমার ডান হাত জোর ক'রে ধরে দাঁড়িয়ে আছে—পুরুতঠাকুর ও পুলিন রেগে আমায় কি বলচে—চেয়ে দেখি আমি ভোগের লুচির থালার অত্যন্ত কাছে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি—আমার কোঁচা লুটুচ্ছে উঁচু ক'রে সাজানো ফুলকো লুচির রাশির ওপরে। তারপর যা ঘটল! পুরুতঠাকুর গালে চার-পাঁচটা চড় কষিয়ে দিলেন—মেজকাকা এসে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বললেন। জ্যাঠাইমা এসে নরু-পুলিনদের ওপর আগুন হয়ে বলতে লাগলেন, সবাই জানে আমি পাগল, আমার মাথার রোগ আছে, আমায় তারা কেন ঠাকুরদালানে নিয়ে গিয়েছিল আরতির সময়—

মেজকাকার মারের ভয়ে অন্ধকার রাত্রে জ্যাঠামশায়দের খিড়কীপুকুরের মাদার-তলায় একা এসে দাঁড়ালাম। সীতা গোলমালে টের পায় নি আমি কোথায় গিয়েছি। আমার গা কাঁপছিল ভয়ে—এ আমার কি হ'ল? আমার এমন হয় কেন? এ কি খুব শক্ত ব্যারাম? ঠাকুরের ভোগ আমি তো ইচ্ছে ক'রে ছুঁই নি? তবে ওরা বুঝলে না কেন? এখন আমি কি করি?

আমি হিন্দু দেবদেবী জানতাম না, সে-শিক্ষা আজন্ম আমাদের কেউ দেয় নি। কিন্তু মিশনারী মেমদের কাছে জ্ঞান হওয়া পর্য্যন্ত যা শিখে এসেছি, সেই শিক্ষা অনুসারে অন্ধকারে মাদারগাছের গুঁড়ির কাছে মাটির ওপর হাঁটু গেড়ে হাতজোড় ক'রে মনে মনে বললাম—হে প্রভু যীশু, হে সদাপ্রভু, তুমি জান আমি নির্দ্দোষ—আমি ইচ্ছে ক'রে করি নি কিছু, তুমি আমার এই রোগ সারিয়ে দাও, আমার যেন এ-রকম আর কখনও না হয়। তোমার জয় হোক, তোমার রাজত্ব আসুক, আমেন্।

সকালে স্নান ক'রে এসে দেখি সীতা আমাদের ঘরের বারান্দাতে এক কোণে খুঁটি হেলান দিয়ে বসে কি পড়ছে। আমি কাছে গিয়ে বললাম—দেখি কি পড়ছিস সীতা? সীতা এমন একমনে বই পড়ছে যে বই থেকে চোখ না তুলেই বললে—ও-পাড়ার বৌদিদির কাছ থেকে এনেছি—প্রফুল্লবালা—গোড়াটা একটু পড়ে স্থাখো কেমন চমৎকার বই দাদা—

আমি বইখানা হাতে নিয়ে দেখলাম, নামটা 'প্রফুল্লবালা' বটে। আমি বই পড়তে ভালবাসিনে, বইখানা ওর হাতে ফেরত দিয়ে বললাম—তুই এত বাজে বই পড়তে পারিস!

সীতা বললে—বাজে বই নয় দাদা, প'ড়ে দেখো এখন। জমিদারের ছেলে সতীশের সঙ্গে এক গরিব ভট্টাচায্যি বামুনের মেয়ে প্রফুল্লবালার দেখা হয়েছে। ওদের বোধ হয় বিয়ে হবে।

সীতা দেখতে ভাল বটে, কিন্তু যেমন সাধারণতঃ ভাইয়েরা বোনেদের চেয়ে দেখতে ভাল

হয়, আমাদের বেলাতেও তাই হয়েছে। আমাদের মধ্যে দাদা সকলের চেয়ে সুন্দর—যেমন রঙ, তেমনই চোখমুখ, তেমনই চুল—তারপর সীতা, তারপর আমি। দাদা যে সুন্দর, এ-কথা শত্রুতেও স্বীকার করে—সে আগে থেকে ভাল চোখ, ভাল মুখ, ভাল রঙ দখল ক'রে বসেছে—আমার ও সীতার জন্যে বিশেষ কিছু রাখে নি। তা হলেও সীতা দেখতে ভাল। তা ছাড়া আবার শৌখীন—সর্ব্বদা ঘ'ষে মেজে, খোঁপাটি বেঁধে, টিপটি প'রে বেড়ানো তার স্বভাব। কথা বলতে বলতে দশবার খোঁপায় হাত দিয়ে দেখছে খোঁপা ঠিক আছে কি-না। এ নিয়ে এ-বাড়িতে তাকে কম কথা সহ্য করতে হয় নি। কিন্তু সীতা বিশেষ কিছু গায়ে মাখে না, কারুর কথা গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না—চিরকালের একগুঁয়ে স্বভাব তার।

আমার মনে মাঝে মাঝে কষ্ট হয়, আমাদের তো পয়সা নেই, সীতাকে তেমন ভাল ঘরে বিয়ে দিতে পারব না—এই সব পাড়াগাঁয়ে আমার জ্যাঠামশায়দের মত বাড়িতে, আমার জ্যাঠাইমার মত শাশুড়ীর হাতে পড়বে—কি দুর্দ্দশাটাই যে ওর হবে! ওর এত বই পড়ার ঝোঁক যে, এ-পাড়ার ও-পাড়ার বৌ-ঝিদের বাক্সে যত বই আছে চেয়ে-চিন্তে এনে এ-সংসারের কঠিন কাজের ফাঁকে ফাঁকে সব পড়ে ফেলে দিয়েচে। জ্যাঠাইমা তো এমনিই বলেন, "ও-সব অলুক্ষণে কাণ্ড বাপু—মেয়ে-মানুষের আবার অত বই পড়ার শখ, অত সাজগোজের ঘটা কেন? পড়বে তেমন শাশুড়ীর হাতে, ঝাঁটার আগায় বই পড়া ঘুচিয়ে দেবে তিন দিনে।"

সীতার বুদ্ধি খুব। 'শতগল্প' ব'লে একখানা বই ও কোথা থেকে এনেছিল, তাতে 'সোনামুখী ও ছাইমুখী' ব'লে একটা গল্প আছে, সৎমার সংসারে গুণবতী লক্ষ্মীমেয়ে সোনামুখী ঝাঁটা লাথি খেয়ে মানুষ হ'ত—তারপর কোন্ দেশের রাজকুমারের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেল ভগবানের দয়ায়—সীতা দেখি গল্পটার পাতা মুড়ে রেখেছে। ও-গল্পটার সঙ্গে ওর জীবনের মিল আছে, এই হয়ত ভেবেছে। কিন্তু সীতা একটি কথাও মুখ ফুটে বলে না কোন দিন। ভারি চাপা।

সীতা বই থেকে চোখ তুলে পথের দিকে চেয়ে বললে—ঐ হীরুঠাকুর আসচে দাদা, আমি পালাই—

আমি বললাম—বোস্, হীরুঠাকুর কিছু বলবে না। ও ঠিক আজ এখানে খাবার কথা বলবে দ্যাখ্।

হীরুঠাকুরকে এ-গাঁয়ে আসা পর্য্যন্ত দেখছি। রোগা কালো চেহারা, খোঁচা খোঁচা একমুখ কাঁচা-পাকা দাড়ি, পরনে থাকে আধময়লা থান, খালি পা, কাঁধে ময়লা চাদর, তার ওপরে একখানা ময়লা গামছা ফেলা। নিজের ঘরদোর নেই, লোকের বাড়ি বাড়ি খেয়ে বেড়ানো তার ব্যবসা। আমরা যখন এখানে নতুন এলাম, তখন কতদিন হীরুঠাকুর এসে আমাকে বলেছে, "তোমার মাকে বল খোকা, আমি এখানে আজ দুটো খাবো।" মাকে বলতেই তখুনি তিনি রাজী হতেন—মা চিরকাল এমন ছিলেন না, লোককে খাওয়াতে-মাখাতে চিরদিনই তিনি ভালবাসেন।

আমার কথাই ঠিক হ'ল। হীরুঠাকুর এসে বললে—"শোন খোকা, তোমার মাকে বলো আমি এখানে আজ দুপুরে চাট্টি ভাত খাবো।" সীতা বই মুখে দিয়ে খিল্ খিল্ ক'রে হেসেই খুন। আমি বললাম, "হীরু-জ্যাঠা, আজকাল তো আমরা আলাদা খাইনে। জ্যাঠামশায়দের বাড়িতে খাই, বাবা মারা গিয়ে পর্য্যন্ত। আপনি সেজকাকাকে বলুন গিয়ে। সেজকাকা কাঁটালতলায় নাপিতের কাছে দাড়ি কামাচ্ছেন।"

সেজকাকা লোক ভাল। হীরুঠাকুর আশ্বাস পেয়ে আমাদেরই ঘরের বারান্দায় বসল।

সীতা উঠে একটা কম্বল পেতে দিলে। হীরুঠাকুর বললে, "তোমার দাদা কোথায়?" দাদার সঙ্গে ওর বড় ভাব। হীরুঠাকুরের গল্প দাদা শুনতে ভালবাসে, হীরুঠাকুরের কষ্ট দেখে দাদার দুঃখ খুব, হীরুঠাকুর না খেতে পেলে দাদা বাড়ি থেকে চাল চুরি ক'রে দিয়ে আসে। এখানে যখন খেতে আসত তখুনি প্রথম দাদার সঙ্গে ওর আলাপ হয়, এই বারান্দায় বসেই। হীরুঠাকুরের কেউ নেই—একটা ছেলে ছিল, সে নাকি আজ অনেক দিন নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। হীরু ঠাকুরের এখনও বিশ্বাস, ছেলে একদিন ফিরে আসবেই এবং অনেক টাকাকড়ি আনবে, তখন তার দুঃখ ঘুচবে। দাদা হীরুর ওই-সব গল্প মন দিয়ে বসে বসে শোনে। অমন শ্রোতা এ-গাঁয়ে বোধ হয় হীরুঠাকুর আর কখনও পায় নি।

খেতে বসে হীরুঠাকুর এক মহা গোলমাল বাধিয়ে বসল। জ্যাঠামশায়ের ছোট মেয়ে সরিকে ডেকে বললে, (হীরু কারুর নাম মনে রাখতে পারে না) "খুকী শোন, বাড়ির মধ্যে জিজ্ঞেস কর তো ডালের বাটিতে তাঁরা কি কিছু মিশিয়ে দিয়েছেন? আমার গা যেন ঘুরচে।" সবাই জানে হীরুঠাকুরের মাথা খারাপ, সে ওরকম একবার আমাদের বাড়ি খেতে বসেও বলেছিল, কিন্তু বাড়িসুদ্ধ মেয়েরা বেজায় চটল এতে। চটবারই কথা। জ্যাঠাইমা বললেন—"সেজঠাকুরপোর খেয়ে-দেয়ে তো আর কাজ নেই, ও আপদ মাসের মধ্যে দশ দিন আসে এখানে খেতে। তার ওপর আবার বলে কি-না ডালে বিষ মিশিয়ে দিইচি আমরা। আ মরণ মড়ুইপোড়া বামুন, তোকে বিষ খাইয়ে মেরে কি তোর লাখো টাকার তালুক হাত করব? আজ থেকে বলে দাও সেজঠাকুরপো, এ-বাড়ির দোর বন্ধ হয়ে গেল, কোনো দিন সদরের চৌকাঠ মাড়ালে ঝাঁটা মেরে তাড়াবো।"

হীরু তখন খাওয়া শেষ করেছিল। জ্যাঠাইমার গালাগালি শুনে মুখখানা কাঁচুমাচু ক'রে উঠে গেল। দাদা এ-সময় বাড়ি ছিল না—আমাদের মুখে এর পর শুনে বললে—আহা, ও পাগল, ছেলের শোকে পাগল হয়েছে। ও কি বলে না-বলে তা কি ধরতে আছে? ছিঃ, খাবার সময় জ্যাঠাইমার গালমন্দ করা ভাল হয়নি। আহা!

সীতা বললে—গালাগাল দেওয়া ভাল হয় নি কেন, খুব ভাল হয়েছে। খামোকা বলবে যে বিষ মিশিয়ে দিয়েছে? লোকে কি মনে করবে?

দাদা আর কিছু বললে না, চুপ ক'রে রইল। সে কারুর সঙ্গে তর্ক করতে পারে না, সীতার সঙ্গে তো নয়ই। একবার কেবল আমায় জিজ্ঞেস করলে—হীরুজ্যাঠা কোন্ দিকে গেল রে জিতু? আমি বললাম আমি জানিনে।

এর মাস দুই-তিন পরে, মাঘ মাসের শেষ, বিকেল বেলা। আমাদের ঘরের সামনে একটুখানি পড়ন্ত রোদে পিঠ দিয়ে স্কুলের অঙ্ক কষচি—এমন সময় দেখি হীরুঠাকুরকে সন্তর্পণে আস্তে আস্তে ধরে নিয়ে আসছে দাদা।

হীরুঠাকুরের চেহারা শীর্ণ, মাথার চুল আরও উস্কোখুস্কো, মুখ প্যাঁডাস্—জ্বরে যেমনি কাঁপচে, তেমনি কাশচে। শুনলাম আজ না-কি চার পাঁচ দিন অসুখ অবস্থায় আমাদেরই পাড়ায় ভট্টাচায্যিদের পুজোর দালানে শুয়ে ছিল। অসুখে কাশ-থুথু ফেলে ঘর অপরিষ্কার করে দেখে তারা এই অবস্থায় বলেছে সেখানে জায়গা হবে না। হীরুঠাকুর চলতে পারে না, যেমন দুর্ব্বল, তেমনি জ্বর আর সে কি ভয়ানক কাশি! কোথায় যায়, তাই দাদা তাকে নিয়ে এসেছে জ্যাঠামশায়দের বাড়ি। ভয়ে আমার প্রাণ উড়ে গেল। দাদার কি এতটুকু বুদ্ধি দেননি ভগবান! এটা কি নিজেদের বাড়ি যে এখানে যা খুশি করা চলবে? কোন্

ভরসায় দাদা ওকে এখানে নিয়ে এল ছ্যাখো তো ?

যা ভয় করেছি, তাই হ'ল। হীরুকে অসুখ গায়ে হাত ধ'রে বাড়িতে এনেছে দাদা, এ কথা বিদ্যুদ্‌বেগে বাড়ির মধ্যে প্রচার হয়ে যেতেই আমার খুড়তুতো জাঠতুতো ভাইবোনেরা সব মজা দেখতে বাইরের উঠোনে ছুটে এল, সেজকাকা এসে বললেন—"না না—এখানে কে নিয়ে এল ওকে ? এখানে জায়গা কোথায় যে রাখা হবে ?" কিন্তু ততক্ষণে জ্যাঠামশায়দের চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় হীরু শুয়ে ধুঁকছে, দাদা চণ্ডীমণ্ডপের পুরোনো সপ্‌টা তাকে পেতে দিয়েছে। তখনি একটা ও-অবস্থার রোগীকে কোথায় বা সরানো যায় ? বাধ্য হয়ে তখনকার মত জায়গা দিতেই হ'ল।

কিন্তু এর জন্যে কি অপমানটাই সহ্য করতে হ'ল দাদাকে। এই জন্যেই বলচি দিনটা কখনো ভুলবো না। দাদাকে আমরা সবাই ভালবাসি, আমি সীতা দুজনেই। আমরা জানি সে বোকা, তার বুদ্ধি নেই, সে এখনও আমাদের চেয়েও ছেলেমানুষ, সংসারের ভালমন্দ সে কিছু বোঝে না, তাকে বাঁচিয়ে আড়াল ক'রে বেরিয়ে আমরা চলি। দাদাকে কেউ একটু বকলে আমরা সহ্য করতে পারিনে, আর সেই দাদাকে বাড়ির মধ্যে ডেকে নিয়ে গিয়ে প্রথমে সেজকাকা আথালিপাথালি চড়চাপড় মারলেন। বললেন, বুড়ো ধাড়ী কোথাকার, ওই হাঁপ-কাশের রুগী বাড়ি নিয়ে এলে তুমি কার হুকুমে ? তোমার বাবার বাড়ি এটা ? এতটুকু জ্ঞান হয় নি তোমার ? সাহসও তো বলিহারি, জিজ্ঞেস না বাদ না কাউকে, একটা কঠিন রুগী বাড়ি নিয়ে এসে তুললে কোন্ সাহসে ? নবাব হয়েছ না ধিঙ্গী হয়েছ ? না তোমার চা-বাগান পেয়েছ ?

এর চেয়ে বেশী কষ্ট হ'ল যখন জ্যাঠাইমা অনেক গালিগালাজের পর রোয়াকে দাঁড়িয়ে হুকুম জারি করলেন, "যাও, রুগী ছুঁয়ে ঘরে দোরে উঠতে পাবে না, পুকুর থেকে গায়ের ও-কোটসুদ্ধ ডুব দিয়ে এস গিয়ে।"

মাঘ মাসের শীতের সন্ধ্যা আর সেই কন্‌কনে ঠাণ্ডা পুকুরের জল—তার ওপর চা-বাগানের আমলের ওই ছেঁড়া গরম কোটটা ছাড়া দাদার গায়ে দেবার আর কিছু নেই, দাদা গায়ে দেবে কি নেয়ে উঠে ? সীতা ছুটে গিয়ে শুকনো কাপড় নিয়ে এসে পুকুরের ধারে দাঁড়িয়ে রইল। মাও এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি ভালমানুষ, দাদাকে একটা কথাও বললেন না, কেবল ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপতে কাঁপতে জল থেকে সে যখন উঠে এল তখন নিজের হাতে গামছা দিয়ে তার মাথা মুছিয়ে দিলেন, সীতা শুকনো কাপড় এগিয়ে দিলে, আমি গায়ের কোটটা খুলে পরতে দিলাম। রাত্রে মা সাবু ক'রে দিলেন আমাদের ঘরের উনুনে—দাদা গিয়ে হীরুঠাকুরকে খাইয়ে এল।

সকালবেলা সেজকাকা ও জ্যাঠামশাই দত্তদের কাঁটালবাগানের ধারে পোড়ো জমিতে বাড়ির কৃষাণকে দিয়ে খেজুরপাতার একটা কুঁড়ে বাঁধালেন এবং লোকজন ডাকিয়ে হীরুকে ধরাধরি ক'রে সেখানে নিয়ে গেলেন। দাদা চুপিচুপি একবাটি সাবু মা'র কাছ থেকে ক'রে নিয়ে দিয়ে এল। দিন-দুই এই অবস্থায় কাটলো। মুখুজ্জে-বাড়ির বড়মেয়ে নলিনীদি রাত্রে একবাটি বার্লি দিয়ে আসতো আর সকালবেলা যাবার সময় বাটিটা ফিরিয়ে নিয়ে যেত।

একদিন রাতে দাদা বললে—"চল্ জিতু, আজ হীরুজ্যাঠার ওখানে রাতে থাকবি ? রাম-গতিকাকা দেখে বলেছে অবস্থা খারাপ। চল্ আগুন জ্বালাবো এখন, বড্ড শীত নইলে।"

রাত দশটার পর আমি ও দাদা দুজনে গেলাম। আমরা যাওয়ার পর নলিনীদি সাবু নিয়ে এল। বললে, "কি রকম আছে রে হীরুকাকা ?" তারপর সে চলে গেল। নারকোলের

মালা হু'তিনটে শিয়রের কাছে পাতা, তাতে কাশ থুথু ফেলেচে রুগী। আমার গা কেমন বমি-বমি করতে লাগল। আর কি কন্‌কনে ঠাণ্ডা! খেজুরের পাতার ঝাঁপে কি মাঘ মাসের শীত আটকায়? দত্তদের কাঁটালবাগান থেকে শুকনো কাঁটালপাতা নিয়ে এসে দাদা আগুন জ্বাললে। একটু পরে দুজনেই ঘুমিয়ে পড়লাম। কত রাত্রে জানি না, আমার মনে হ'ল হীরুজ্যাঠা আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। হীরুজ্যাঠা আর কাশচে না, তার রোগ যেন সেরে গিয়েছে! আমার দিকে চেয়ে হেসে বললে, "জিতু, আমি বাঁশবেড়ে যাচ্ছি গঙ্গা নাইতে। আমায় বড় কষ্ট দিয়েছে হরিবল্লভ (আমার জ্যাঠামশাই), আমি বলে যাচ্ছি, নির্ব্বংশ হবে, নির্ব্বংশ হবে। তোমরা বাড়ি গিয়ে শোও গে যাও।"

আমার গা শিউরে উঠলো—এত স্পষ্ট কথাগুলো কানে গেল, এত স্পষ্ট হীরুজ্যাঠাকে দেখলাম যে বুঝে উঠতে পারলাম না প্রত্যক্ষ দেখছি, না স্বপ্ন দেখছি। ঘুম কিন্তু ভেঙে গিয়েছিল, দাদা দেখি তখনও কুঁকড়ি হয়ে শীতে ঘুমুচ্ছে, কাঁটালপাতার আগুন নিভে জল হয়ে গিয়েছে, হীরুজ্যাঠাও ঘুমুচ্ছে মনে হ'ল। বাইরে দেখি ভোর হয়ে গিয়েছে।

দাদাকে উঠিয়ে নলিনীদিদির বাবা রামগতি মুখুজ্জেকে ডাকিয়ে আনলাম। তিনি এসে দেখেই বললেন, "ও তো শেষ হয়ে গিয়েছে। কতক্ষণ হ'ল? তোরা কি রাত্রে ছিলি নাকি এখানে?"

হীরুঠাকুরের মৃত্যুতে চোখের জল এক দাদা ছাড়া বোধ হয় আর কেউ ফেলে নি।

অনেক দিন পরে শুনেছিলাম, হীরুঠাকুর পৈতৃক কি জমিজমা ও দুখানা আম-কাঁটালের বাগান বন্ধক রেখে জ্যাঠামশায়ের কাছে কিছু টাকা ধার করে এবং শেষ পর্য্যন্ত হীরুঠাকুর সে টাকা শোধ না করার দরুন জ্যাঠামশায় নালিশ ক'রে নিলামে সব বন্ধকী বিষয় নিজেই কিনে রাখেন। এর পর হীরুঠাকুর আপসে কিছু টাকা দিয়ে সম্পত্তিটা ফিরিয়ে নিতে চেয়েছিল—জ্যাঠামশায় রাজী হন নি। কেবল বলেছিলেন ব্রাহ্মণের ভিটে আমি চাইনে—ওটা তোমায় ফিরিয়ে দিলাম। হীরু তা নেয় নি, বলেছিল, সব যে পথে গিয়েছে, ও ভিটেও সে পথে যাক। এর কিছুকাল পরেই তার মাথা খারাপ হয়ে যায়।

বিষয় বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে জ্যাঠামশায়ের দান-ধ্যান-ধর্ম্মানুষ্ঠানও বেড়ে চলেছিল। প্রতি পূর্ণিমায় তাঁদের ঘরে সত্যনারায়ণের পূজা হয় যে তা নয় শুধু—একটি গরিব ছাত্রকে জ্যাঠাইমা বছরে একটি টাকা দিতেন বই কেনবার জন্যে। শ্রাবণ মাসে তাঁদের আবাদ থেকে নৌকা আসে নানা জিনিসপত্র বোঝাই হয়ে—বছরের ধান, জালাভরা কইমাছ, বাজরাভরা হাঁসের ডিম, তিল, আকের গুড় আরও অনেক জিনিস। প্রতি বছরই সেই নৌকায় দুটি একটি হরিণ আসে। ধনধান্যপূর্ণ ডিঙা নিরাপদে দেশে পৌঁচেছে এবং তার জিনিসপত্র নির্ব্বিঘ্নে ভাঁড়ার-ঘরে উঠল এই আনন্দে তাঁরা প্রতিবার শ্রাবণ মাসে পাঁঠা বলি দিয়ে মনসাপূজা করতেন ও গ্রামের ব্রাহ্মণ খাওয়াতেন। বৈশাখ মাসে গৃহদেবতা গোপীনাথ জীউর পূজোর পালা পড়ল ওঁদের। জ্যাঠামশায় গরদের জোড় প'রে লোকজন ও ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে কাঁসরঘণ্টা, ঢাকঢোল বাজিয়ে ঠাকুর নিয়ে এলেন ও-পাড়ার জ্ঞাতিদের বাড়ি থেকে—জ্যাঠাইমা খুড়ীমারা বাড়ির দোরে দাঁড়িয়ে ছিলেন—প্রকাণ্ড পেতলের সিংহাসনে বসানো শালগ্রাম বয়ে আনছিলেন জ্যাঠামশায় নিজে—তিনি বাড়ি ঢুকবার সময়ে জ্যাঠাইমা জলের ঝারা দিতে দিতে ঠাকুর অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে গেলেন। মেয়েরা শাঁক বাজাতে লাগলেন, উলু দিলেন। আমি, সীতা ও দাদা আমাদের ঘরের বারান্দা থেকে দেখছিলাম—অত্যন্ত কৌতূহল হলেও কাছে যেতে

সাহস হ'ল না। মাকে মেয়ে পড়াত সে-কথা ওঁদের কানে যাওয়া থেকে মানুষের ধারা থেকে আমরা নেমে গিয়েছি ওঁদের চোখে—আমরা খৃষ্টান, আমরা নাস্তিক, পাহাড়ী জানোয়ার—ঘরদোরে ঢুকবার যোগ্য নই। বৈশাখ মাসের প্রতিদিন কত কি খাবার তৈরি হ'তে লাগল ঠাকুরের ভোগের জন্যে—ওঁরা পাড়ার ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ ক'রে প্রায়ই খাওয়াতেন, রাত্রে শীতলের লুচি ও ফল-মিষ্টান্ন পাড়ার ছেলেমেয়েদের ডেকে দিতে দেখেছি তবুও সীতার হাতে একখানা চন্দ্রপুলি ভেঙে আধখানিও কোন দিন দেন নি।

জ্যাঠাইমা এ সংসারের কর্ত্রী, কারণ জ্যাঠামশাই রোজগার করেন বেশি। ফর্সা মোটা-সোটা এক-গা গহনা, অলঙ্কারে পরিপূর্ণ—এই হলেন জ্যাঠাইমা। এ-বাড়িতে নববধূরূপে তিনি আসবার পর থেকেই সংসারের অবস্থা ফিরে যায়, তার আগে এঁদের অবস্থা খুব ভাল ছিল না—তাই তিনি নিজেকে ভাবেন ভাগ্যবতী। এ-বাড়িতে তাঁর উপর কথা বলবার ক্ষমতা নেই কারও। তাঁর বিনা হুকুমে কোন কাজ হয় না। এই জ্যৈষ্ঠ মাসে এত আম বাড়িতে, বৌদের নিয়ে খাবার ক্ষমতা নেই, যখন বলবেন খাও গে, তখন খেতে পাবে। জ্যাঠামশায়ের বড় ও মেজ ছেলে, শীতলদা ও সলিলদার বিয়ে হয়েছে, যদিও তাদের বয়েস খুব বেশী নয় এবং তাদের বৌয়েদের বয়েস আরও কম—দুই ছেলের এই দুই বৌ, ও বাড়িতে গলগ্রহ হয়ে আছে এক ভাগ্নেবৌ তার ছেলেমেয়ে নিয়ে, আর আমার মা আমাদের নিয়ে—এ ছাড়া ভুবনের মা আছে, কাকীমারা আছেন—এর মধ্যে এক ছোট কাকীমা বাদে আর সব জ্যাঠাইমার সেবাদাসী। ছোট কাকীমা বাদে এইজন্যে যে তিনি বড়মানুষের মেয়ে—তাঁর উপর জ্যাঠাইমার প্রভুত্ব বেশি খাটে না।

প্রতিদিন খাওয়ার সময় কি নির্লজ্জ কাণ্ডটাই হয়! রোজ রোজ দেখে সয়ে গিয়েছে যদিও, তবুও এখনও চোখে কেমন ঠেকে। রান্নাঘরে একসঙ্গে ভাগ্নে, জামাই, ছেলেরা খেতে বসে। ছেলেদের পাতে, জামাইয়ের পাতে বড় বড় জামবাটিতে ঘন দুধ, ভাগ্নেদের পাতে হাতা ক'রে দুধ। মেয়েদের খাবার সময় সীতা, ভাগ্নেবৌ এরা সবাই কলায়ের ডাল মেখে ভাত খেয়ে উঠে গেল—নিজেদের দল, দুই বৌ, মেয়ে নলিনীদি, নিজের জন্যে বাটিতে বাটিতে দুধ আম বাতাসা। নলিনীদি আবার মধু দিয়ে আম দুধ খেতে ভালবাসে—মধুর অভাব নেই, জ্যাঠামশাই প্রতি বৎসর আবাদ থেকে ছোট জালার একজালা মধু নিয়ে আসেন—নলিনীদি দুধ দিয়ে ভাত মেখেই বলবে, মা আমায় একটু মধু দিতে বল না সদুর মাকে। কালেভদ্রে হয়ত জ্যাঠাইমার দয়া হ'ল—তিনি সীতার পাতে দুটো আম দিতে বললেন কি এক হাতা দুধ দিতে বললেন—নয়তো ওরা ওই কলায়ের ডাল মেখে ভাত খেয়েই উঠে গেল। সীতা সে-রকম মেয়ে নয় যে মুখ ফুটে কোন দিন কিছু বলবে, কিন্তু সেও তো ছেলেমানুষ, তারও তো খাবার ইচ্ছে হয়? আমি এই কথা বলি, যদি খাবার জিনিসের বেলায় কাউকে দেবে, কাউকে বঞ্চিত করবে, তবে একসঙ্গে সকলকে খেতে না বসালেই তো সব চেয়ে ভাল?

একদিন কেবল সীতা বলেছিল আমার কাছে—দাদা, জ্যাঠাইমারা কি রকম লোক বল দিকি? মা ভাল ভাল বাটনা বাটবে, বাসন মাজবে, রাজ্যির বাসি কাপড় কাচবে, কিন্তু এত ডাবের ছড়াছড়ি এ বাড়িতে, গাছেরই তো ডাব, একাদশীর পরদিন মাকে কোনো দিন বলেও না যে একটা ডাব নিয়ে খাও।

আমি মুখে মুখে বানিয়ে কথা বলতে ভালবাসি। আপন মনে কখনও বাড়ির কর্ত্তার মত কথা বলি, কখনও চাকরের মত কথা বলি। সীতাকে কত শুনিয়েছি, একদিন মাকেও শুনিয়েছিলাম। একদিন ও-পাড়ার মুখুজ্জেবাড়িতে বীরুর মা, কাকীমা, দিদি এরা সব ধ'রে

পড়ল আমাকে বানিয়ে বানিয়ে কিছু বলতে হবে।

ওদের রান্নাবাড়ির উঠোনে, মেয়েরা সব রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিকটা ভাবলাম কি বলব? সেখানে একটা বাঁশের ঘেরা পাঁচিলের গায়ে ঠেসানো ছিল। সেইটের দিকে চেয়ে আমার মাথায় বুদ্ধি এসে গেল। ওই বাঁশের ঘেরাটা হবে যেন আমার স্ত্রী, আমি যেন চাকরি করে বাড়ি আসছি, হাতে অনেক জিনিসপত্র। ঘরে যেন সবে ঢুকেছি, এমন ভাব ক'রে বললাম—"ওগো কই, কোথায় গেলে, ফুলকপিগুলো নামিয়ে নাও না? ছেলেটার জ্বর আজ কেমন আছে?" মেয়েরা সব হেসে এ ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ল।

আমার উৎসাহ গেল আরও বেড়ে। আমি বিরক্তির সুরে বললাম, "আঃ, ঐ তো তোমার দোষ! কুইনিন দেওয়া আজ খুব উচিত ছিল। তোমার দোষেই ওর অসুখ যাচ্ছে না। খেতে দিয়েছ কি?"

আমার স্ত্রী অপ্রতিভ হয়ে খুব নরম সুরে কি একটা জবাব দিতেই রাগ পড়ে গেল আমার। বললাম—"ওই পুঁটলিটা খোলো, তোমার একজোড়া কাপড় আছে আর একটা তরল আলতা—", মেয়েরা আবার খিল খিল করে হেসে উঠল।

বীরুর ছোট বৌদিদি মুখে কাপড় গুঁজে হাসতে লাগলো। আমি বললাম—"ইয়ে করো, আগে হাত-পা ধোয়ার জল দিয়ে একটু চায়ের জল চড়াও দিকি? সেই কখন ট্রেনে উঠেচি—ঝাঁকুনির চোটে আর এই দু-কোশ হেঁটে খিদে পেয়ে গিয়েছে—আর সেই সঙ্গে একটু হালুয়া—কাগজের ঠোঙা খুলে দেখে কিশমিশ এনেছি কিনে, বেশ ভাল কাবুলী—"

বীরুর কাকীমা তো ডাক ছেড়ে হেসে উঠলেন। বীরুর মা বললেন—"ছোঁড়া পাগল! কেমন সব বলচে দেখ, মাগো মা, উঃ—আর হেসে পারিনে!"

বীরুর ছোট বৌদিদির দম বন্ধ হয়ে যাবে বোধ হয় হাসতে হাসতে। বললে—"ওঃ মা, আমি যাব কোথায়! ওর মনে মনে ওই সব শখ আছে, ওর ইচ্ছে ওর বিয়ে হয়, বৌ নিয়ে অমনি সংসার করে—উঃ মা রে!"

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। আমি রান্নাঘরে বসে স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করচি। রান্না এখনও শেষ হয় নি। আমি বললাম—"চিংড়ি মাছটা কেমন দেখলে, খুব পচেনি তো? কালিয়াটায় ঝাল একটু বেশি করে দিও।"

বীরুর কাকীমা বললেন, "হাঁ রে তুই কি কেবল খাওয়া-দাওয়ার কথা বলবি বৌয়ের সঙ্গে?" কিন্তু আর কি ধরনের কথা বলব খুঁজে পাইনে। ভাবলাম খানিকক্ষণ, আর কি কথা বলা উচিত? আমি এই ধরনের কথা সকলকে বলতে শুনেছি স্ত্রীর কাছে। ভেবে ভেবে বললাম—"খুকীর জন্যে জামাটা আনবো, কাল ওর গায়ের মাপ দিও তো। আর জিজ্ঞেস করো কি রঙ ওর পছন্দ—না, না—এখন আর ঘুম ভাঙিয়ে জিজ্ঞেস করবার দরকার নেই, ছেলেমানুষ ঘুমুচ্ছে, থাক। কাল সকালেই—" খুব গম্ভীর মুখে এ-কথা বলতেই মেয়েরা আবার হেসে উঠল দেখে আমি ভারি খুশি হয়ে উঠলাম। আরও বাহাদুরি নেবার ইচ্ছায় উৎসাহের সুরে বললাম—"আমি নেপালী নাচ জানি—চা-বাগানে থাকতে আমি দেখে দেখে শিখেছি।"

মেয়েরা সবাই বলে উঠলো, "তাও জানিস নাকি? বা রে! তা তো তুই বলিস নি কোনো দিন? দেখি—দেখি—"

"কিন্তু আর একজন লোক দরকার যে? আমার সঙ্গে আর কে আসবে? সীতা থাকলে ভাল হ'ত। সেও জানে। আপনাদের বীণা কোথায় গেল? সে হলেও হয়।"

এ কথায় মেয়েরা কেন যে এত হেসে উঠল হঠাৎ, তা আমি বুঝতে পারলাম না। বীণা

বীরুর মেজ বোন, আমার চেয়ে কিছু ছোট, দেখতে বেশ ভাল। সে ওখানে ছিল না তখন—একা একা নেপালী নাচ হয় না বলে বেশী বাহাদুরিটা আমার আর নেওয়া হয়নি সে-দিন।

সীতার বই পড়ার ব্যাপার নিয়ে জ্যাঠাইমা সকল সময় সীতাকে মুখনাড়া দেন। সীতা যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ফিটফাট থাকতে ভালবাসে এটাও জ্যাঠাইমা বা কাকীমারা দেখতে পারেন না। সীতা চিরকাল ওই রকম থেকে এসেছে চা-বাগানে। একটিমাত্র মেয়ে, মা তাকে সব সময় সাজিয়ে-গুজিয়ে রাখতে ভালবাসতেন, কতকটা আবার গড়ে উঠেছিল মিস্ নর্টনের দরুন। মিস্ নর্টন মাকে পড়াতে এসে নিজের হাতে সীতার চুল আঁচড়ে দিত, চুলে লাল ফিতে বেঁধে দিত, হাত ও মুখ পরিষ্কার রাখতে শেখাত। এখানে এসে সীতার দুখানার বেশি তিনখানা কাপড় জোটেনি কোন সময়—জামা তো নেই-ই। (জ্যাঠাইমা বলেন, মেয়েমানুষের আবার জামা গায়ে কিসের ?) কিন্তু ওরই মধ্যে সীতা ফরসা কাপড়-খানি প'রে থাকে, চুলটি টান টান করে বেঁধে পেছনে গোল খোঁপা বেঁধে বেড়ায়, কপালে টিপ প'রে—এ গাঁয়ের এক পাল অসভ্য অপরিষ্কার ছেলেমেয়ের মধ্যে ওকে সম্পূর্ণ অন্য রকমের দেখায়, যে-কেউ দেখলেই বলতে পারে ও এ-গাঁয়ের নয়, এ অঞ্চলের না—ও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

দুটো জিনিস সীতা খুব ভালবাসে ছেলেবেলা থেকে—সাবান আর বই। আর এখানে এসে পর্য্যন্ত ঠিক ওই দুটো জিনিসই মেলে না—এ-বাড়িতে সাবান কেউ ব্যবহার করে না, কাকীমাদের বাক্সে সাবান হয়ত আছে কিন্তু সে বাক্স-সাজানো হিসাবে আছে, যেমন তাঁদের বাক্সে কাঁচের পুতুল আছে, চীনেমাটির হরিণ, খোকা পুতুল, উট আছে,—তেমনি। তবুও সাবান বরং খুঁজলে মেলে বাড়িতে—কেউ ব্যবহার করুক আর নাই করুক—বই খুঁজলেও মেলে না—দুখানা বই ছাড়া—নতুন পাঁজি আর সত্যনারায়ণের পুঁথি। আমরা তো চা-বাগানে থাকতাম, সে তো বাংলা দেশেই নয়—তবুও আমাদের বাক্সে অনেক বাংলা বই ছিল। নানা-রকমের ছবিওয়ালা বাংলা বই—যীশুর গল্প, পরিত্রাণের কথা, জবের গল্প, সুবর্ণবণিকপুত্রের কাহিনী আরও কত কি। এর মধ্যে মিশনারি মেমেরা অনেক দিয়েছিল, আবার বাবাও কলকাতা থেকে ডাকে আনাতেন—সীতার জন্যে এনে দিয়েছিলেন কঙ্কাবতী, হাতেম তাই, হিতোপদেশের গল্প, আমার জন্যে একখানা 'ভূগোল-পরিচয়' ব'লে বই আর একখানা 'ঠাকুর-দাদার ঝুলি'। আমি গল্পের বই পড়তে তত ভালবাসিনে, দু-তিনটে গল্প পড়ে আমার বইখানা আমি সীতাকে দিয়ে দিয়েছিলাম।

আমার ভালো লাগে যীশুখৃষ্টের কথা পড়তে। পর্ব্বতে যীশুর উপদেশ, যীশুর পুনরুত্থান, অপব্যয়ী পুত্রের প্রত্যাবর্ত্তন। এ সব আমার বেশ লাগে। এখানে ও সব বই পাওয়া যায় না ব'লে পড়িনে। যীশুর কথা এখানে কেউ বলেও না। একখানা খৃষ্টের রঙীন ছবি আমার কাছে আছে—মিস্ নর্টন দিয়েছিল—সেখানা আমার বড় প্রিয়। মাঝে মাঝে বার ক'রে দেখি।

হিন্দু দেবতার কোন মূর্ত্তি আমি দেখিনি, জ্যাঠামশায়ের বাড়িতে যা পুজো করেন, তা গোল-মত পাথরের নুড়ি। এ-গ্রামে দুর্গাপূজা হয় না, ছবিতে দুর্গামূর্ত্তি দেখেছি, ভাল বুঝতে পারিনে, কিন্তু একটা ব্যাপার হয়েছে এর মধ্যে। চৌধুরীপাড়ায় বড় পুকুরের ধারের পাকুড়গাছের তলায় কালো পাথরের একটা দেবমূর্ত্তি গাছের গুঁড়িতে ঠেসানো আছে—আমি একদিন দুপুরে পাকুড়তলা দিয়ে যাচ্ছি. বাবা তখন বেঁচে আছেন কিন্তু তাঁর খুব অসুখ—ওই সময় মূর্ত্তিটা আমি প্রথম দেখি—জায়গাটা নির্জ্জন, পাকুড়গাছের ডালপালার পিছনে অনেকখানি নীল আকাশ,

মেঘের একটা পাহাড় দেখাচ্ছে ঠিক যেন বরফে মোড়া কাঞ্চনজঙ্ঘা—একটা হাত ভাঙা যদিও কিন্তু কি সুন্দর যে মুখ মূর্ত্তিটার, কি অপূর্ব্ব গড়ন—আমার হঠাৎ মনে হ'ল ওই পাথরের মূর্ত্তির পবিত্র মুখের সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ যীশুখৃষ্টের মুখের মিল আছে—কেউ ছিল না তাই দেখেনি—আমার চোখে জল এল, আমি একদৃষ্টিতে মূর্ত্তিটার মুখের দিকে চেয়েই আছি—ভাবলাম জ্যাঠামশায়রা পাথরের নুড়ি পূজো করে কেন, এমন সুন্দর মূর্ত্তির দেবতা কেন নিয়ে গিয়ে পূজো করে না? তারপরে শুনেছি ঐ দীঘি খুঁড়বার সময়ে আজ প্রায় পঁচিশ বছর আগে মূর্ত্তিটা হাতভাঙা অবস্থাতেই মাটির তলায় পাওয়া যায়। সীতাকে নিয়ে গিয়ে দেখিয়েছিলাম একবার—একবার সীতা জবা, আকন্দ, ঝুমকো ফুলের একছড়া মালা গেঁথে মূর্ত্তির গলায় পরিয়ে দিয়েছিল। অমন সুন্দর দেবতাকে আজ পঁচিশ বছর অনাদরে গ্রামের বাইরের পুকুরপাড়ে অমন ক'রে কেন যে ফেলে দিয়েছে এরা!

একবার একখানা বই পড়লাম—বইখানার নাম চৈতন্যচরিতামৃত। এক জায়গায় একটি কথা পড়ে আমার ভারি আনন্দ হ'ল। চৈতন্যদেব ছেলেবেলায় একবার আঁস্তাকুড়ে, এঁটো হাঁড়ি-কুড়ি যেখানে ফেলে, সেখানে গিয়েছিলেন ব'লে তাঁর মা শচীদেবী খুব বকেন। চৈতন্যদেব বললেন—মা পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ঈশ্বর আছেন, এই আঁস্তাকুড়েও আছেন। ঈশ্বর যেখানে আছেন, সে-জায়গা অপবিত্র হবে কি ক'রে?

ভাবলাম জ্যাঠাইমার বিরুদ্ধে চমৎকার যুক্তি পেয়েছি ওঁদের ধর্ম্মের বইয়ে, চৈতন্যদেব অবতার, তাঁরই মুখে। জ্যাঠাইমাকে একদিন বললাম কথাটা। বললাম—জ্যাঠাইমা, আপনি যে বাড়ির পিছনে বাঁশবনে গেলে কি শেওড়া গাছে কাপড় ঠেকলে হাত-পা না ধুয়ে, কাপড় না ছেড়ে ঘরে ঢুকতে দেন না, চৈতন্যচরিতামৃতে কি লিখেছে জানেন?

চৈতন্যদেবের সে কথাটা বলবার সময়ে আনন্দে মন আমার ভ'রে উঠল—এমন নতুন কথা, এত সুন্দর কথা আমি কখনও শুনিনি। ভাবলাম জ্যাঠাইমা বই পড়েন না ব'লে এত সুন্দর কথা যে ওঁদের ধর্ম্মের বইয়ে আছে তা জানেন না—আমার মুখে শুনে জেনে নিশ্চয়ই নিজের ভুল বুঝে খুব অপ্রতিভ হয়ে যাবেন।

জ্যাঠাইমা বললেন—তোমাকে আর আমায় শাস্তর শেখাতে হবে না। তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেচে, উনি এসেচেন আমাকে শাস্তর শেখাতে! হিঁদুর আচার-ব্যবহার তোরা জানবি কোত্থেকে রে ডেঁপো ছোঁড়া। তুই তো তুই, তোর মা বড় জানে, তোর বাবা বড় জানতো—

আমি অবাক হয়ে গেলাম। জ্যাঠাইমা এমন সুন্দর কথা শুনে চটলেন কেন? তা ছাড়া আমি নিজে কিছু বলেছি কি?

আগ্রহের সুরে বললাম—আমার কথা নয় জ্যাঠাইমা, চৈতন্যদেব বলেছিলেন তাঁর মা শচী-দেবীকে—চৈতন্যচরিতামৃতে লেখা আছে—দেখাবো বইখানা?

খুব তক্কোবাজ হয়েচ? থাক্, আর বই দেখাতে হবে না। তোমার কাছে আমি গুরু-মন্তর নিতে যাচ্ছিনে—এখন যাও আমার সামনে থেকে, আমার কাজ আছে—তোমার তক্কো শুনবার সময় নেই।

বা রে, তর্কবাজির কি হ'ল এতে? মনে কষ্ট হ'ল আমার। সেই থেকে জ্যাঠাইমাকে আর কোন কথা বলিনি।

সীতা ইতিমধ্যে এক কাণ্ড ক'রে বসল। জ্যাঠামশাইদের বাড়ির পাশে যদু অধিকারীর

বাড়ি। তারা বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। তাদের বাড়িতে যদু অধিকারীর বড় মেয়ের বিয়ের জন্যে দেখতে এল চার-পাঁচজন ভদ্রলোক কলকাতা থেকে। সীতা সে-সময় সেখানে উপস্থিত ছিল।

যদু অধিকারীর বাড়ির মেয়েরা তাকে নাকি জিজ্ঞেস করেছে—শোন্ সীতা, আচ্ছা উমার যদি বিয়ে না হয় ওখানে, তোর বিয়ে দিয়ে যদি দিই, তোর পছন্দ হয় কা'কে বল্ তো?

সীতা বুঝতে পারেনি যে তাকে নিয়ে ঠাট্টা করচে—বলেচে নাকি, চোখে-চশমা কে একজন এসেছিল তাকে।

ওরা সে কথা নিয়ে হাসাহাসি করেচে। জ্যাঠাইমার কানেও গিয়েছে কথাটা। জ্যাঠাইমা ও সেজকাকীমা মিলে সীতাকে বেহায়া, বোকা, বদ্‌মাইশ, জ্যাঠা মেয়ে, যা তা বলে গালাগালি আরম্ভ করলেন। আরও এমন কথা সব বললেন যা ওঁদের মুখ দিয়ে বেরুলো কি ক'রে আমি বুঝতে পারিনি। আমি সীতাকে বকলাম, মাও বকলেন—তুই যাস্ কেন যেখানে সেখানে, আর না বুঝে যা তা বলিসই বা কেন? এ-সব জায়গার ধরন তুই কি বুঝিস?

সীতার চোখ ছল্ ছল্ ক'রে উঠল। সে অতশত বোঝেনি, কে জানে ওরা আবার এখানে বলে দেবে! সে মনে যা এসেচে, মুখে সত্যি কথাই বলেচে। এ নিয়ে এত কথা উঠবে তা বুঝতেই পারেনি।

॥ ৫ ॥

পৌষ মাসের শেষে আমাদের বাড়ি সরগরম হয়ে উঠল—শুনলাম ওঁদের গুরুদেব আসবেন ব'লে চিঠি লিখেচেন।

এই গুরুদেবের কথা আমি এঁদের বাড়িতে এর আগে অনেক শুনেচি—জ্যাঠামশায়ের ঘরে তাঁর একটা বড় বাঁধানো ফটোগ্রাফ দেখেছিলাম—গুরুদেব চেয়ারে বসে আছেন, জ্যাঠামশায় ও জ্যাঠাইমা দুজন দু-দিকে মাটিতে ব'সে তাঁর পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিচ্চেন। অনেক দিন থেকে ছবিখানা দেখে গুরুদেব সম্বন্ধে আমার মনে একটা কৌতূহল হয়েছিল—কিরকম লোক একবার দেখবার বড় ইচ্ছে হ'ত।

স্টেশনে তাঁকে আনতে লোক গিয়েছিল—একটু বেলা হ'লে দেখি দাদা এক ভারী মোট বয়ে আগে আগে আসচে—পেছনে ব্যাগ হাতে জ্যাঠামশায়দের কৃষাণ নিমু গোয়ালা। গুরুদেব হেঁটে আসচেন, রং কালো, মাথার সামনের দিকে টাক—গায়ে চাদর, পায়ে চটি। আমার জাঠতুতো, খুড়তুতো ভাইবোনেরা দরজার কাছে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়েছিল—পায়ের ধুলো নেওয়ার জন্যে তাদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। আমি এগিয়েও গেলাম না, পায়ের ধুলোও নিলাম না। জ্যাঠাইমা গুরুদেবের পা নিজের হাতে ধুইয়ে আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিলেন, খুড়ীমারা বাতাস করতে লাগলেন—ছেলে-মেয়েরা তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রইল, তিনি সেজ-খুড়ীমাকে জিজ্ঞেস করলেন—বৌমা, ছেলের তোতলামিটা সেরেচে? মেজখুড়ীমাকে বললেন—গোষ্ঠ (মেজকাকার নাম) আজকাল কি বাদার কাছারী থেকে গরমের সময় একদম আসে না?···কতদিন আগে এসেছিল বললে?

বাড়ির ছেলেমেয়েদের একে ওকে ডেকে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করলেন, দুএকটা কথা জিজ্ঞেসও করলেন—কিন্তু দাদা যে অত বড় ভারী মোট বয়ে আনলে স্টেশন থেকে, সে-ও

সেইখানে দাঁড়িয়ে—তাকে একটা মিষ্টি কথাও বললেন না। আমার রাগ হ'ল, তিনি কি ভেবেচেন দাদা বাড়ির চাকর? তাও ভাবা অসম্ভব এই জন্যে যে, ওখানে যতগুলো ছেলেমেয়ে দাঁড়িয়ে ভিড় ক'রে আছে, তাদের মধ্যে দাদার রূপ সকলের আগে চোখকে আকৃষ্ট করে—এ গাঁয়ে দাদার মত রূপবান বালক নেই, শুধু এ বাড়ি তো দূরের কথা। আশা করে দাঁড়িয়ে আছে, একটা ভাল কথাও তো বলতে হয় তার সঙ্গে?

গুরুদেবের জন্যে বিকেলে বাড়িতে কত কি খাবার তৈরি হ'ল—মেজখুড়ীমা, সতুর মা, জ্যাঠাইমা—সবাই মিলে ক্ষীরের, নারিকেলের, ছানার কি সব গড়লেন। মাকে এ-সব কাজে ডাক পড়ে না, কিন্তু দেখে একটু অবাক হ'লাম সতুর মাকে ওঁরা এতে ডেকেচেন! মা আর সতুর মার ওপর যত উঞ্ছ কাজের ভার এ বাড়ির। সতুর মা'র অদৃষ্ট ভাল হয়েচে দেখচি।

গুরুদেব সন্ধ্যা-আহ্নিক সেরে বাইরে এলে তাঁকে যখন খাবার দেওয়া হ'ল, তখন সেখানে বাড়ির ছেলেমেয়ে সবাই ছিল—আমরাও ছিলাম। কিন্তু হিরণদিদি ও সেজকাকীমা সকলকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিলেন। গুরুদেব বললেন—কেন ওদের যেতে বলচ বৌমা, থাক্ না, ছেলেপিলেরা গোলমাল করেই থাকে—

গুরুদেব তিন-চারদিন রইলেন। তাঁর জন্যে সকালে বিকালে নিত্যনূতন কি খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাই যে হ'ল! পিঠে, পায়েস, সন্দেশ, ছানার পায়েস, ক্ষীরের ছাঁচ, চন্দ্রপুলি, লুচি—তিনি তো খেতে পারতেন না—আমরা বাদে বাড়ির অন্য ছেলেমেয়েরা তাঁর পাতের প্রসাদ পেত। তিনি জলখাবার খেয়ে উঠলে তাঁর রেকাবিতে বা থালায় যা পড়ে থাকত, কাকীমারা ডেকে ছেলেমেয়েদের দিতেন—আমরা সেখানে থাকতাম না—কারণ প্রথম দিকে ছেলেমেয়েরা সেখানে থাকলে কাকীমা বকতেন—তার পর গুরুদেবের খাওয়া হয়ে গেলে যখন তাদের ডাক পড়ত, তখন বাড়ির ছেলেরা কাছে কাছেই থাকতো ব'লে তারাই যেত—আমি কারুর পাতের জিনিস খেতে পারিনে, এই জন্যে আমি যেতাম না। ওঁরা ডেকেও কোনো খাবার জিনিস আমাদের কোনো দিন দিলেন না—কিন্তু মনে মনে আমি হতাশ হলাম—আমি একেবারে যে আশা করিনি তা নয়, ভেবেছিলাম গুরুদেব এলে আমরা সবাই ভাল খাওয়ার ভাগ পাব কিছু কিছু।

সন্ধ্যাবেলা। বেশ শীত পড়েচে। গুরুদেব আমলকীতলায় কাঠের জলচৌকিতে কম্বল পেতে বসে আছেন। পায়ে সবুজ পাড়-বসানো বালাপোশ—ছেলেমেয়েরা সব ঘিরে আছে, যেমন সর্ব্বদাই থাকে; একটু পরে জ্যাঠাইমা, মেজকাকীমা, সতুর মা, হিরণদিদি এলেন।

গুরুদেবের খুব কাছে আমি কোনো দিন যাইনি—আমি গোয়ালঘরের কাছে দাঁড়িয়ে আছি, ছেলেমেয়েরা গল্প শুনচে গুরুদেবের কাছে, আমার কিন্তু গল্পের দিকে মন নেই, আমার জানবার জন্যে ভয়ানক কৌতূহল যে গুরুদেব কি ধরনের লোক, তাঁর অত খাতির, যত্ন, আদর এরা কেন করে, তাঁর পায়ে জ্যাঠাইমা ও জ্যাঠামশায় পুষ্পাঞ্জলি দেনই বা কেন, তাঁর ফটো বাঁধিয়েই বা ঘরে রাখা আছে কেন? এসবের দরুন গুরুদেব সম্বন্ধে আমার মনে এমন একটা অদ্ভুত আগ্রহ ও কৌতূহল জন্মে গিয়েচে যে, তিনি যেখানেই থাকুন, আমি কাছে কাছে আছি সর্ব্বদাই—অথচ খুব নিকটে যাইনে!

গুরুদেব মুখে মুখে ধর্ম্মের কথা বলতে লাগলেন। আমি আর একটু এগিয়ে গেলাম ভাল ক'রে শোনবার জন্য। এ-সব কথা শুনতে আমার বড় ভাল লাগে।

একবার কি একটা যোগ উপস্থিত—গঙ্গাস্নানে মহাপুণ্য, সকল পাপ ক্ষয় হয়ে যাবে, স্নান করলেই মুক্তি। পার্ব্বতী শিবকে বললেন—আচ্ছা প্রভু, আজ এই যে লক্ষ লক্ষ লোক কাশীতে

স্নান করবে, সকলেই মুক্তি পাবে ? শিব বললেন, তা নয় পার্ব্বতী। চলো তোমায় দেখাব।

দুজনে কাশীতে এলেন মণিকর্ণিকার ঘাটে। শিব বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের শব সেজে ঘাটের ধারে পড়ে রইলেন। পার্ব্বতী তাঁর স্ত্রী সেজে পাশে বসে কাঁদতে লাগলেন। যারা এল, তাদের বললেন আমার বৃদ্ধ স্বামী মারা গিয়েচেন, এর সৎকার করার ব্যবস্থা আপনারা করুন। কিন্তু একটা মুশকিল আছে, শব যিনি স্পর্শ করবেন, তাঁর সম্পূর্ণ নিষ্পাপ হওয়া চাই, নইলে শব-স্পর্শেই মৃত্যু ঘটবে।

এ-কথা শুনে সাহস ক'রে কেউ এগোয় না। সবাই ভাবে পাপ তো কতই করেচি। প্রাণ দিতে যাবে কে ? সারাদিন কাটলো। সন্ধ্যা নামে-নামে। একজন চণ্ডাল ঘাটের ধারে অশ্রুমুখী ব্রাহ্মণপত্নীকে দেখে কি হয়েচে জিজ্ঞাসা করলে। পার্ব্বতী সকলকে যা ব'লে এসেচেন তাকেও তাই বললেন। চণ্ডাল শুনে ভেবে বললে—তার জন্য ভাবনা কি মা ? আজ গঙ্গা-স্নান করলে তো নিষ্পাপ হবোই, এত বড় যোগ যখন, এ জন্ম তো দূরের কথা শত জন্মের পাপ ক্ষয় হয়ে যাবে পাঁজিতে লিখেচে। তা দাঁড়ান, আমি ডুবটা দিয়ে আসি এবং একটু পরেই ডুব দিয়ে উঠে এসে বললে—মা ধরুন ওদিক, আমি পায়ের দিকটা ধরচি—চলুন নিয়ে যাই।

শিব নিজমূর্ত্তি ধারণ করে চণ্ডালকে বর দিলেন। পার্ব্বতীকে বললেন—পার্ব্বতী দেখলে ? এই লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে এই লোকটি মাত্র আজকার যোগের ফল লাভ করবে। মুক্তি যদি কেউ পায় এই চণ্ডালই পাবে।

গল্পটা আমার ভারি ভাল লাগল। সে-দিনকার চৈতন্যচরিতামৃতে পড়া সেই কথাটা মনে পড়ল—জ্যাঠাইমাকে বলেছিলাম, জ্যাঠাইমা বিশ্বাস করেন নি। ওঁদের শাস্ত্রের কথাতেই ওঁর বিশ্বাস নেই। অথচ মুখে হিঁদুয়ানি তো খুব দেখান! আর আমাকে, মাকে, সীতাকে, দাদাকে বলেন খিরিস্টান।

আজকার গুরুদেবের এই গল্পটা কি জ্যাঠাইমা কাকীমারা বুঝতে পারলেন ? চণ্ডালের ওপর আমার ভক্তি হ'ল। আমি যেন মনে মনে কাশী চলে গিয়েচি, আমি যেন মণিকর্ণিকার ঘাটে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশী শিব ও ক্রন্দনরতা পার্ব্বতীকে প্রত্যক্ষ করেচি।

ও-বছর বড়দিনের সময় মিশনারী মেয়েরা আমাদের রঙীন কার্ড দিয়েছিল, ছোট একখানা ছবিওয়ালা বই দিয়েছিল। তা'তে একটি কথা সোনার জলে বড় বড় ক'রে লেখা আছে মনে পড়ল—তাহারা ধন্য যাহারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। কারণ তাহারা জীবনমুকুট প্রাপ্ত হইবে।

তার পরদিন সন্ধ্যাবেলাতেও গুরুদেব আমলকীতলায় আসন পেতে বসে গল্প বলছিলেন ছেলেমেয়েদের। একবার উঠে আহ্নিক করতে গেলেন, আবার এসে বসলেন। মেয়েরাও এলেন।

কথা বলতে বলতে হঠাৎ আমার দিকে আঙুল দিয়ে বললেন—ও ছেলেটি কে ? রোজ রোজ দেখি দাঁড়িয়ে থাকে। এস, এস বাবা, এদিকে এস।

প্রথমটা আমার বড় লজ্জা হ'ল কিন্তু কেমন একটা আনন্দও হ'ল। একটু এগিয়ে গেলাম। জ্যাঠাইমা বললেন—ও আমার এক খুড়তুতো দেওরের ছেলে। ওরা এখানে থাকতো না, চা-বাগানে ওর বাবা কাজ করতো। এখানে এসে অসুখ হয়ে মারা গেল ; আর তো কেউ নেই, ওরা এ বাড়িতে থাকে।

গুরুদেব বললেন—এস দেখি বাবা, হাতটা দেখি, সরে এস।

তারপর জ্যাঠাইমাদের দিকে চেয়ে বললেন—খুব লক্ষণযুক্ত ছেলে। এর বয়স কত ?

আমায় লক্ষণযুক্ত বলাতে—বিশেষতঃ অত ছেলের মাঝ থেকে—জ্যাঠাইমা কাকীমারা নিশ্চয়ই খুব খুশি হননি। জ্যাঠাইমা প্রমাণ করবার চেষ্টা করলেন আমার বয়স নাকি পনেরো বছর—আমি ওঁর ছেলে হাবুর চেয়েও দেড় বছরের বড়। আসলে আমার বয়স তেরো—জ্যাঠাইমার বড় ছেলে হাবুকে আমরা হাবুদা বলে ডাকি, সে আমাদের সবার চেয়ে দু-বছরের বড়। স্কুলে তার বয়েস লেখানো আছে, তাই ধরে বলচি।

তারপর গুরুদেব আমায় জিজ্ঞেস করলেন—কি পড় বাবা?

আমি কোন্ ক্লাসে পড়ি বললাম।

ধাতুরূপ কতদূর পড়েচ? লুঙ, লিট্ বোঝ? এই শোনো একটি শ্লোক—

সোঽধ্যৈষ্ট বেদাংস্ত্রিদশানযষ্ট
পিতৄনতার্প্সীৎ সমমংস্ত বন্ধুন্
ব্যজৈষ্ঠ ষড়বর্গমরংস্ত নীতৌ
সমূলঘাতংন্যবধীদরীংশ্চ।

হেসে বললেন—কত রকম ধাতুর ব্যবহার দেখেচ? এ হল ভট্টিকাব্যের শ্লোক।

আমার বেশ ভাল লাগলো, গুরুদেবকেও এবং তাঁর শ্লোককেও। আমি এর আগে সংস্কৃত শ্লোক বেশি শুনিনি। চা-বাগানে কেউ বলতো না। শ্লোকটা আমি মুখস্থ ক'রে নিলাম।

একদিন তিনি বাড়ির পাশের মাঠে শুকনো পাতা দিয়ে আগুন জ্বেলেচেন। আমায় দেখে বললেন—এসো জিতু—

আমি বললাম—কি করবেন আগুন জ্বেলে?…

—তামাক পোড়াবো—

আমি বললাম, আমি পুড়িয়ে দিচ্চি।

গুরুদেব অনেক সংস্কৃত শ্লোক আমাকে শোনালেন। কুবেরের শাপে এক যক্ষ গৃহ থেকে বহুদূরে কোন্ পর্ব্বতে নির্ব্বাসিত হয়েছিল, বাড়ির জন্যে ভেবে ভেবে তার হাতের সোনার বালা ঢল হয়ে গিয়েছিল, তারপর আষাঢ় মাসের প্রথম দিনে সেই পাহাড়ের মাথায় বর্ষার নতুন কালো মেঘ নামল—এই রকম একটা, শ্লোকের মানে। আমি তো সংস্কৃত পড়ি মোটে ঋজুপাঠ, কিন্তু আমাকেই তিনি আগ্রহের সঙ্গে এমনি ভাল ভাল অনেক শ্লোক শোনাতে লাগলেন—যেন আমি কত বুঝি!

এবার মনে হ'ল আমার নিজের কথা যা কাউকে কখনও বলিনি এ পর্য্যন্ত—তাঁর কাছে খুলে বলি, আমার মনের সন্দেহ, আমার ঐসব অদ্ভুত জিনিস দেখার ব্যাপার, জ্যাঠাইমাদের সঙ্গে আচার-ব্যবহার নিয়ে আমার মত না মেলা,—সকলের ওপর ঠাকুরদেবতা সম্বন্ধে আমার অবিশ্বাস—এসব খুলে ব'লে তিনি কি বলেন শুনি। তাঁর ওপর এমন একটা শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল আমার! যেন মনে হ'ল এঁর কাছে বললে ইনি সব বুঝিয়ে দিতে পারবেন আমাকে। এত বড় লোক ইনি, এত পণ্ডিত, কত কথা জানেন।

কিন্তু সুবিধে হ'ল না। বলি-বলি করেও বলতে আমার কেমন লজ্জা হ'ল। তিন দিন এমনি কেটে গেল, তারপর তিনি চলে গেলেন।

আমার কিন্তু বলতে পারলেই ভাল হ'ত। একজন ভাল লোককে আমার সব কথা বলা দরকার। অথচ এখানে তেমন কোন লোককে আমি বিশ্বাস করিনে—কারুর ওপর আমার ভক্তি হয় না।

আমি আজকাল নির্জ্জনে বসলেই অদ্ভুত সব জিনিস দেখি। যখন তখন, তার সময় নেই

অসময় নেই, রাত নেই দিন নেই। এই তো সেদিন বসে আছি জ্যাঠাইমাদের পুকুরধারের বাগানে একলাটি—হঠাৎ দেখি পুকুরপাড়ের আমগাছগুলোর ওপরকার নীল আকাশে একটা মন্দিরের চূড়ো—প্রকাণ্ড মন্দির, রোদ লেগে ঝক্‌মক্ করচে—সোনা না কি দিয়ে বাঁধানো যেন। মন্দিরের চারিপাশে বাগান, চমৎকার গাছপালা, ফুল ফুটে আছে, অপূর্ব্ব দেখতে—ঠিক যেন আমাদের সোনাদা চা-বাগানের ধারে বনের গাছের ডালে ডালে ফোটা নীল অর্কিডের ফুল! আর একদিন দেখেছিলাম ঠিক ওই জায়গায় বসেই আকাশ বেয়ে সন্ধ্যার সময় তিনটি সুন্দরী মেয়ে, পরনে যেন শ্বেতচমরীর লোমে বোনা সাদা চকচকে লুটিয়ে-পড়া কাপড়—তারা উড়ে যাচ্ছে এক সারিতে, বোধ হয় পুরো পাঁচ মিনিট ধরে তাদের দেখেছি। তারপর রোদ চক্‌চক্ করতে লাগল, আর তাদের স্পষ্ট দেখা গেল না—ওপরের দিকে যেতে যেতে মিলিয়ে গেল। এরকম নতুন নয়, কতবার দেখেছি, প্রায়ই দেখি, দু-পাঁচদিন অন্তর দেখি, দেখে দেখে আমার সয়ে গিয়েচে, আগের মত ভয় হয় না। কিন্তু এক-একবার ভাবি, এ আমার এক রকম রোগ—না চোখ খারাপ হয়ে গিয়েচে, না কি?

আমার কারুর সঙ্গে মিশতে সাহস হয় না এইজন্যে যে, হয়ত কোন্ সময় আবার অন্য ভাব এসে যাবে, আর কে সঙ্গে থাকবে সে আমায় ভাববে পাগল। হয়ত হাসবে, হয়ত লোককে ব'লে দেবে। এমনিও এ-বাড়িতে জ্যাঠাইমা, কাকীমা, কাকা, এঁরা আমায় পাগলই ভাবেন। কি করবো। আমি যা দেখি, ওঁরা তা দেখতে পান না, এই আমার অপরাধ। একটা উদাহরণ দিই—

ফাল্গুন মাসে ছোটকাকার মেয়ে পানী অসুখে পড়ল। একদিন দু'দিন গেল, অসুখ আর সারে না। জ্বর লেগেই আছে। সাতদিন কেটে গেল—জ্বর একই ভাব। দশ দিনের দিন অসুখ এমনি বাড়ল, নৈহাটি থেকে বড় ডাক্তার আনবার কথা হ'ল।

পানীকে আমার এ-বাড়ির ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভাল লাগে। তার বয়স বছর সাত-আট, ঝাঁকড়া চুল মাথায়, চোখ কটা, সাহেবদের ছেলেমেয়েদের মত। এ-বাড়ির ছেলেমেয়েদের মুখে যেমন খারাপ কথা আর গালাগালি লেগেই আছে—পানীর কিন্তু তা নয়। তার একটা কারণ, সে এতদিন মামার বাড়িতে তার দিদিমার কাছে ছিল, গঙ্গার ওপারে ভদ্রেশ্বরে। সে বেশ মেয়ে, বেশ গান করতে পারে, প্রাণে তার দয়ামায়া আছে। পানীর অসুখ হয়ে পর্য্যন্ত আমার মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল—আমার ইচ্ছে হয়েছিল ওর কাছে গিয়ে ব'সে গায়ে হাত বুলিয়ে দিই—কিন্তু কাকীমা তো আমায় বিছানা ছুঁতে দেবে না, সেই ভয়ে পারতাম না।

পানীর তখন সতেরো দিন জ্বর চলছে—বুড়ো গোবিন্দ ডাক্তার ঘোড়ার গাড়ি ক'রে স্টেশন থেকে এল—দালানে বসে মশলার কৌটো বের ক'রে মশলা খেলে, ভাজা মশলার গন্ধে দালান ভুর ভুর করতে লাগল—চা ক'রে দেওয়া হ'ল, চা খেলে, তার পর ওষুধ লিখে দিয়ে ভিজিটের টাকা মেজকাকার হাত থেকে নিয়ে না দেখেই পকেটে পুরলে—তার পর রোগীকে বার বার গরম জল খাওয়ানোর কথা ব'লে গাড়ি ক'রে চলে গেল।

একটু একটু অন্ধকার হয়েচে কিন্তু এখনও বাড়িতে সন্ধ্যার শাঁখ বাজেনি, কি আলো জ্বালা হয়নি—হয়ত ডাক্তার আসবার জন্যে সকলে ব্যস্ত ছিল বলেই। আমি রোগীর ঘরে দোরের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, কিন্তু পানীর বিছানায়—পানীর শিয়রে যে বসে আছে তাকে চিনতে পারলাম না। লালপাড় শাড়ী পরনে আধঘোমটা দেওয়া কে একজন, জ্যাঠাইমার মত দেখতে বটে কিন্তু জ্যাঠাইমা তো নয়! ঘরের মধ্যে আর কেউ নেই—এইমাত্র কাকীমা বাইরে গেছেন ডাক্তারে কি ব'লে গেল তাই জানতে ছোটকাকার কাছে। আমি ভাবচি লোকটা কে, এমন

সময় তিনি মুখ তুলে আমার দিকে চেয়ে বললেন—জিতু, নির্ম্মলাকে বোলো পানীকে আমি নিয়ে যাব, আমি ওকে ফেলে থাকতে পারবো না—ও আমার কাছে ভাল থাকবে, নির্ম্মলা যেন দুঃখ না করে। আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম—কে নির্ম্মলা আমি চিনি নে, যিনি বলচেন তিনিই বা কে, কোথা থেকে এসেচেন, কই এ বাড়িতে তো কোনদিন দেখিনি তাঁকে, পানীকে তিনি এই অসুস্থ শরীরে কোথায় নিয়ে যাবেন, এসব কথা ভাববার আগেই ছোটকাকীমা ঘরে ঢুকলেন—কিন্তু আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে বিছানার পাশে যিনি বসে আছেন, ছোটকাকীমা যে তাঁকে দেখতে পাচ্চেন, এমন কোনো ভাব দেখলুম না।

বিছানায় যিনি বসে ছিলেন তিনি আমায় বললেন—জিতু, নির্ম্মলাকে বল এইবার—আমি চলে যাচ্ছি।

আমি কিছু না ভেবে কলের পুতুলের মত চেয়ে বললাম—নির্ম্মলা কে?

ছোট কাকীমা আমার দিকে কটমট ক'রে চেয়ে বললে—কেন, সে খোঁজে কি দরকার? তিনি ভাবলেন আমি বুঝি তাঁকেই জিজ্ঞেস করচি। অন্য মহিলাটি বিছানা থেকে নেমে ওদিকের দরজা দিয়ে বার হয়ে চ'লে গেলেন, যাবার সময় আমাকে বললেন—এই তো নির্ম্মলা ঘরে এসেচে।

আমি বললাম—আপনি কেন বলুন না নিজে?

ততক্ষণ তিনি বার হয়ে চলে গিয়েছেন।

ছোটকাকীমা আমার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে আছেন। বললেন—কি বকচিস পাগলের মত? ওদিকে চেয়ে কার সঙ্গে কথা বলচিস? নির্ম্মলা কে সে খোঁজে তোমার কি দরকার শুনি?

জ্যাঠাইমা ঘরে ঢুকলেন সেই সময়ই। তিনি বললেন, কি হয়েচে, কি বলচে ও?

ছোটকাকীমা বললেন—আপন মনে কি বকচে ছাখো না দিদি—ও এ ঘর থেকে চলে যাক। আমার ভয় করে, ও ছেলের মাথার ঠিক নেই—আমার নাম ক'রে কি বলচে।

জ্যাঠাইমা বললেন—কি বলছিলি কাকীমার নাম করে?

আমার বিস্ময় তখনো কাটেনি—আমি তখন কেমন হয়ে গিয়েচি। ছোটকাকীমার নাম যে নির্ম্মলা আমি তা কখনও শুনিনি—ঐ মেয়েটি যে চলে গেল, আমার সঙ্গে কথা বলে গেল—ছোটকাকীমা তাঁকে দেখতে পেলেন না, তাঁর কথাও শুনতে পেলেন না এই বা কেমন! জ্যাঠাইমার কথার কোনো জবাব আমার মুখ দিয়ে বেরুলো না, আমার মাথা ঘুরে উঠল। তারপর কি যে ঘটল আমি তা জানি না।

জ্ঞান হলে দেখি মা আমার মাথা কোলে নিয়ে বসে কাঁদচেন। আমি দালানেই শুয়ে আছি। চারিপাশে বাড়ির অনেক মেয়ে জড় হয়েচে, সবাই বললে আমার মৃগীরোগ আছে। ভাবলাম হয়ত হবে, একেই বোধ হয় মৃগীরোগ বলে। আমার বড় ভয় হ'ল, বাবা মারা গিয়েচেন পাগল হয়ে, এ-বাড়ির অনেকের মুখে শুনেছি আমরাও পাগল হ'তে পারি। তার মধ্যে আমার নাকি পাগলের লক্ষণ আছে অনেক।

সে-সন্ধ্যার কথা কখনও ভুলব না। জীবনে এত ভয় আমার কোনদিন হয়নি—এই ভেবে ভয় হ'ল যে আমার সত্যিই কোন কঠিন রোগ হয়েচে। কিন্তু কাউকে বলবার উপায় নেই রোগটা কি। মৃগীরোগই হয়ত হয়েচে, নয়তো বাবার মত পাগলই হয়ে যাব হয়ত—না, কি হবে!

যে রাত্রে বাবা পাগল হয়ে গিয়ে বালিশের তুলো ছিঁড়ে ঘরময় ছড়িয়ে দিলেন, কেরোসিনের

টেমির মিটমিটে অস্পষ্ট আলোয় রাতদুপুরে তাঁর সেই অদ্ভুত সারা গায়ে, মুখে, মাথায় তুলোমাখা মূর্ত্তি বার বার মনে আসতে লাগল—আমার মনে সে-রাত্রি, সে-মূর্ত্তি চিরদিনের জন্য আঁকা হয়ে আছে। ঐ রকম কি আমারও হবে!

মাকে আঁকড়ে ধরে শুয়ে রইলাম সারারাত। মনে মনে কতবার আকুল আগ্রহে প্রার্থনা করলাম—প্রভু যীশু, তুমি দেবতা, তুমি আমার এ রোগ সারিয়ে দাও, আমায় পাগল হ'তে দিও না। আমায় বাঁচাও।

সকালে একটু বেলায় রোদ উঠলে পানী মারা গেল।

জ্যাঠাইমা সকালে উঠে বৌদের কুটনো কুটবার উপদেশ দেবেন, কি কি রান্না হবে তা ঠিক ক'রে দেবেন—এ বাড়িতে ভাগ্নে-বৌ ছাড়া কেউ গাই দুইতে পারে না—এদিকের কাজ সেরে জ্যাঠাইমা তাকে সঙ্গে নিয়ে গোয়ালে নিজের চোখের সামনে দুধ দোয়াবেন—সীতা বলে, পাছে ভাগ্নে-বৌ নিজের ছেলেমেয়েদের জন্যে কিছু সরিয়ে রাখে বোধ হয় এই ভয়ে। তারপর তিনি স্নান ক'রে গরদের কাপড় প'রে ঠাকুরঘরে ঢুকবেন—সেখানে আহ্নিক চলবে বেলা এগারোটা পর্য্যন্ত, সে-সময়ে ঠাকুরঘরের দোরে কারুর গিয়ে উঁকি দেবার পর্য্যন্ত হুকুম নেই। সবাই বলে জ্যাঠাইমা বড় পুণ্যবতী। পুণ্যবতীই তো! একদিন যে-ছবি দেখেছিলাম, ভুলিনি কোনদিন। জ্যাঠাইমা ঠাকুরঘর থেকে বার হয়ে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়েচেন, পরনে গরদের শাড়ী, কপালে সিঁদুর, চন্দনের টিপ, টকটকে চেহারা—এমন সময় আমার মা একরাশ বাসি কাপড় নিয়ে গোবরছড়ার বালতি হাতে পুকুরের ঘাটে যাচ্চেন, পরনের ময়লা কাপড়ের জায়গায় জায়গায় কাদা গোবরের ছাপ, রুক্ষ চুল; বেলা বারোটার কম নয়; সকাল থেকে মার মুখে এক ফোঁটা জল পড়েনি—

জ্যাঠাইমা ডেকে বললেন—বৌ, রান্নাঘরের ছোট জালার জল কি কাল তুমি তুলেছিলে? আমি না কতবার তোমায় বারণ করেচি ছোট জালায় তুমি জল ঢালবে না? বড় জালায় বেশী না পার তো তিন কলসী ক'রে ঢেলেও তো বেগার শোধ দিলে পার?

ছোট জালার জল জ্যাঠামশায়, জ্যাঠাইমা বা কাকারা খান। জ্যাঠাইমার এ কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, মা গুরুমন্ত্র নেননি, মায়ের হাতের জল অতএব শুদ্ধ নয়, সে জল ওঁরা খাবেন কি ক'রে?

সত্যিই তো জ্যাঠাইমা পুণ্যবতী। নইলে তিনি ঠাকুরঘরে পবিত্র দেহে পবিত্র মনে এতক্ষণ জপ-আহ্নিক করছিলেন, আর মা মরছিলেন বেলা বারোটা পর্য্যন্ত গোয়াল-আঁস্তাকুড় ঘেঁটে—মা নাস্তিক মাতাল কেরানীর স্ত্রী, তার ওপর আবার মেমের কাছে লেখাপড়া শিখে জাত খুইয়েচেন, কেন ওঁরা জল খেতে যাবেন মার হাতের?

আমার মনে হ'ল ঠাকুরও শুধু বড়মানুষের, পুণ্যিও বড়মানুষের জন্যে—নইলে মায়ের, ভাগ্নেবৌয়ের, ভুবনের মায়ের সময় কোথায় তারা নিশ্চিন্ত মনে, শুচি হয়ে, গরদ প'রে তাঁর পায়ে ফুলতুলসী দেবে?

বোধ হয় এই সব নানা কারণে জ্যাঠাইমাদের বাড়ির গৃহদেবতার প্রতি আমি অনেকটা চেষ্টা করেও কোনো ভক্তি আনতে পারতাম না। এক-একবার ভেবেচি হয়ত সেটা আমারই দোষ, আমার শিক্ষা হয়েচে অন্যভাবে, অন্য ধর্মাবলম্বী লোকেদের মধ্যে, তাদের কাছে যে দয়া মমতা পেয়েছি, আর কোথাও তা পাইনি বলেই। ছেলেবেলা থেকে যীশুখৃষ্টের কথা পড়ে আসচি, তাঁর করুণার কথা শুনেচি, তাঁর কত ছবি দেখেচি। আমার কাছে একখানা ছবি

আছে খৃষ্টের, মেমেরা বড়দিনের সময় আমায় দিয়েছিল—বকের পালকের মত ধবধবে সাদা দীর্ঘ ঢিলে আলখাল্লা-পরা যীশু হাসি-হাসি মুখে দাঁড়িয়ে—চারিধারে তাঁর ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা ভিড় করেচে, একটি ক্ষুদ্র শিশু তাঁর পা ধরে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করচে, আর তিনি তাকে ধরে তুলতে যাচ্চেন নিচু হয়ে—মুখে কি অপূর্ব জ্যোতি, কি সুন্দর চাউনি—আমি এ ছবিখানা বইয়ের ভেতর রেখে দিই, রোজ একবার দেখি—এত ভালো লাগে!

কিন্তু যীশুখৃষ্টের সম্বন্ধে কোনো ভাল বই পাইনে—আমার আরও জানবার ইচ্ছে হয় তাঁর কথা—মাকে যে মেমেরা পড়াত চা-বাগানে, তারা একখানা মথি-লিখিত সুসমাচার ও খান-কতক ছাপানো কাগজ বিলি করেছিল, সেইগুলো কতবার পড়া হয়ে গিয়েচে, তা ছাড়া আর কোনো বই নেই। এখানে এসে পর্য্যন্ত আর কোনো নতুন বই আমার চোখে পড়েনি।

আমাদের স্কুলে একটা ছেলে নতুন এসে ভর্ত্তি হয়েচে আমাদেরই ক্লাসে। তার নাম বনমালী, জাতে সদ্‌গোপ, রঙ খুব কালো, কিন্তু মুখের চেহারা বেশ, বয়সে আমার চেয়ে কিছু বড়। সে অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে, এখানে একটা ঘর ভাড়া করে থাকে, বামুনে রাঁধে। অনেক দূরের পাড়াগাঁয়ে তার বাড়ি, সেখানে লেখাপড়া শেখার কোনো সুবিধে নেই, তাই ওকে ওর বাপ-মা এই গাঁয়ে পাঠিয়েচে। কিন্তু লেখাপড়ার দিকে বনমালীর মন নেই, সে বাসার উঠোনে এক তুলসীচারা পুঁতে বাঁধিয়েচে, দিনরাত জপ করে, একবেলা খায় মাছমাংস ছোঁয় না, শ্রীকৃষ্ণ নাম তার সামনে উচ্চারণ করার জো নেই, তা হ'লেই তার চোখ দিয়ে জল পড়বে। রাত্রে জপের ব্যাঘাত হয় ব'লে বিকেলবেলা স্কুল থেকে গিয়ে খেয়েদেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বামুন ঠাকুরকে ছুটি দেয়—তার পর ব'সে ব'সে অনেক রাত পর্য্যন্ত জপ করে, হরিনাম করে। সে সময় কেউ কাছে গেলে সে ভারি চটে। অদ্ভুত ধরনের ছেলে ব'লে তাকে সকলে ভারি খেপায়—স্কুলের ছেলেরা তার সামনে 'কিষ্ট' 'কিষ্ট' বলে চেঁচায় তার চোখে জল বেরোয় কি না দেখবার জন্যে, ওই নিয়ে মাস্টারেরা পর্য্যন্ত খিঁচুনি দিতে বাকী রাখে না। সেদিন তো এ্যাল্‌জেব্রার আঁক না পারার দরুন আমাদের সামনে সেকেণ্ড মাস্টার ওকে বললে—তুমি তো শুনিচি কেষ্ট নাম শুনলে কেঁদে ফেল—তা যাও, পয়সা আছে বাপের, মঠ বানাও, মচ্ছব দেও, লেখাপড়া করবার শখ কেন? এ-সব তোমার হবে না বাপু।

আমি একদিন বনমালীর কাছে সন্ধ্যার সময় গিয়েছি। ও তখন একটা টুলের ওপর ব'সে একমনে দেওয়ালের দিকে চেয়ে বোধ হয় জপ করচে—আমায় দেখে উঠে দোর খুলে দিলে, হেসে বসতে বললে। ওকে অদ্ভুত মনে হয়, সেজন্যেই দেখা করতে গিয়েছিলাম যে তা নয়—আমার মনে হয়েছিল ও যে-রকম ছেলে, ও বোধ হয় আমার নিজের ব্যাপারগুলোর একটা মীমাংসা ক'রে দিতে পারবে। তা ছাড়া ওকে আমার ভাল লাগে খুব, ওকে ভাল মানুষ পেয়ে সবাই খেপায়, অথচ ও প্রতিবাদ করে না, অনেক সময় বোঝে না যে তারা খেপাচ্ছে, এতে আমার বড় মায়া হয় ওর ওপর।

বনমালীকে জিজ্ঞেস করলাম সে কিছু দেখে কিনা। সে আমার কথা বুঝতে পারলে না, বলল—কি দেখবো?

তাকে বুঝিয়ে বললাম। না,—সে কিছু দেখে না।

তারপর একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। ঘরে একখানা ছবি ছিল, আমি সেদিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললাম—ওখানা কি তোমার ঠাকুরের ছবি?

বনমালীর গলার সুর বদলে গেল, চোখের চাউনি অন্য রকম হয়ে গেল। সে বললে—ঠিক বলেচ ভাই, আমার ঠাকুরের ছবি, চমৎকার কথা বলেচ ভাই—ওই তো আমার সব,

আমার ঠাকুর শুধু কেন, তোমার ঠাকুর সবারই ঠাকুর—

বলতে বলতে দর দর করে তার চোখে জল পড়তে লাগল।

আমি অবাক হয়ে গেলাম। কিন্তু একটু পরে বনমালীর কান্নার বেগ থামলে গর্ব্বের সুরে বললাম—খুব গোপনীয় কথা বললাম ওকে—কারও কাছে এ পর্য্যন্ত মুখ ফুটে কথাটা বলিনি। বললাম—আমার ঠাকুর অন্য কেউ নয়, আমার ঠাকুর যীশুখ্রীষ্ট—আমার কাছেও ছবি আছে—

বনমালী হাঁ ক'রে আমার দিকে চেয়ে রইল—তারপর অপ্রতিভভাবে বললে—ও তোমরা খৃষ্টান?

আমি চুপ ক'রে রইলাম।

বনমালী ভেবে বললে—তাঁর কাছে সব সমান—

আমি বললাম—কার কাছে?

—শ্রীহরির কাছে ভাই, আবার কার কাছে? তাঁর কাছে কি আর হিন্দু, মোছলমান, খৃষ্টান আছে? তিনি যে পতিতপাবন—অধমের ঠাকুর—

আমার মনে ব্যথা লাগল এই ভেবে, বনমালী আমাকে অধম মনে করেচে। যীশুখৃষ্টকে ও ছোট করতে চায়। আমি বললাম—যীশুর কাছেও সব সমান। পাপীদের জন্যে তিনি প্রাণ দিয়েছিলেন—জান? মথিলিখিত সুসমাচারে লিখেচে, যে তাহাতে বিশ্বাস করে সে অনন্ত জীবন—

মথি-লিখিত সুসমাচারের বাইরে আমার আর কিছু জানা নেই। বনমালী কিন্তু সংস্কৃতে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান আবৃত্তি ক'রে আমায় শ্রীকৃষ্ণের রূপ বুঝিয়ে দিলে—আরও অনেক কথা বললে। আমি দু-তিন দিন তার কাছে গেলাম, তার ঠাকুর সম্বন্ধে শুনবার জন্যে। জ্যাঠাইমাদের বাড়ির সকলের চেয়ে ও বেশী জানে ওদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে—এ আমার মনে হ'ল। কিন্তু বনমালী আমার খ্রীষ্টভক্তি ভাল চোখে দেখলে না, বললে—হিন্দু হয়ে ভাই এ তোমার ভারি অদ্ভুত কাণ্ড যে তুমি অপরের দেবতাকে ভক্তি করো। গীতায় বলেচে, স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ—অর্থাৎ নিজের ধর্ম্মে—

আমি তাকে বুঝিয়ে বললাম, হিন্দু আমি কখনই না। আমরা যেখানে যে-অবস্থায় মানুষ হয়েচি সেখানে হিন্দুধর্ম্মের কথা কিছু শুনিনি কোনো দিন; কেউ বলত না। যা বলত, তাই শুনেচি, তাই বিশ্বাস করেচি—তা মনে লেগেচে। এতে আমার কি কোনো দোষ হয়েচে ভাই?

সেদিন সন্ধ্যার সময় আমাদের দালানে আমি ব'সে পড়ছি, এমন সময় কার পায়ের শব্দ শুনে চেয়ে দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম—ছোটকাকীমা দাঁড়িয়ে! ছোটকাকীমা বড়মানুষের মেয়ে, তিনি তো কস্মিন্‌কালে আমাদের ভাঙা দালানে পা দেননি—বিশেষ ক'রে আমাদের দু-চোখে তিনি দেখতে পারেন না কোনো কালে—বরং মেজকাকীমা সময়ে অসময়ে নরম হন, ছোট কাকীমার মুখে মিষ্টি কথা কোনো দিন শুনিওনি। আমাদের ঘরে আর কেউ নেই—দাদা এখনও ফেরেনি—সীতা ও মা জ্যাঠাইমাদের অন্দরে। আমি দাঁড়িয়ে উঠে থতমত খেয়ে বললাম—কি কাকীমা?

ছোটকাকীমা এদিক-ওদিক চেয়ে নীচু সুরে বললেন—তোর সঙ্গে কথা আছে জিতু।

আমি বললাম—কি বলুন?

কাকীমা বললেন—পানী যে-রাতে মারা যায়, সেদিন তুই আমায় কি বলছিলি মনে আছে ?

আমার ভয় হ'ল,—বললাম—না, কাকীমা।

ছোটকাকীমা হঠাৎ আমার হাত দুটো তাঁর দু'হাতের মধ্যে নিয়ে বললেন—বল্ বাবা জিতু, সেদিন তোর কথা সবাই উড়িয়ে দিয়েছিল, আমি কিন্তু তারপর সব বুঝেছিলাম, কাউকে বলিনি। পানী ছেড়ে গিয়ে আমায় পাগল ক'রে রেখে গিয়েচে—তুই বল্ জিতু। আমার মাকে তুই দেখেছিলি সে-রাত্রে, তিনি পানীকে ভালবাসতেন, তাই নিতে এসেছিলেন—মরে গিয়েও তাঁর পানীর কথা—

আমি জানতাম না যে পানীর দিদিমা মারা গিয়েচেন। আমি বিস্ময়ের সুরে জিজ্ঞেস করলাম—আপনার মা বেঁচে নেই ?

—না, পানী তাঁর কাছ থেকে ফাল্গুন মাসে এল, তিনি আষাঢ় মাসে তো মারা গেলেন। তুই পানীকে দেখতে পাস্ জিতু ? তোকে সেদিন সবাই পাগল বললে, কিন্তু আমি তারপর ভেবে দেখলাম তোর কথার একটুও পাগলামি নয়—সব সত্যি। তুই আমার মাকে দেখতে পেয়েছিলি—সত্যি বল্ না জিতু বাবা, পানীকে দেখিস্ ?

আমার চোখেও জল এল। ছোট কাকীমাকে এত কাতর দেখিনি কখনও—তা ছাড়া পানীকে আমিও বড় ভালবাসতাম এ বাড়ির ছেলেমেয়েদের মধ্যে। বললাম—না কাকীমা, পানীকে আমি কোনো দিন দেখিনি—আপনার পা ছুঁয়ে বলতে পারি—

ছোটকাকীমা আরও কি বলতে যাচ্ছিলেন, মেজকাকার গলার স্বর শুনে তিনি পালিয়ে গেলেন। ছোটকাকীমার কথা শুনে আমি কিন্তু আকাশ-পাতাল ভাবতে বসলাম। আমি সেদিন সত্যি সত্যি কাউকে দেখেছিলাম তবে ? সে যেই হোক্, পানীর দিদিমাই হোক, মরাই হোক্ বা জীবন্তই হোক্! এটা তা হ'লে আমার রোগ নয় ? আর কেউ তবে দেখে না কেন ?

কিংবা হয়ত ছোটকাকীমা মেয়ের শোকে বুদ্ধি হারিয়েছেন, কি বলচেন না-বলচেন, উনিই জানেন না। ওঁর কথার উপর বিশ্বাস কি ?

॥ ৬ ॥

জ্যাঠামশায়দের বাড়ি আরও বছর দুই কেটে গেল এই ভাবেই। যত বছর কেটে যায়, এদের এখানে থাকা আমার পক্ষে তত বেশি কঠিন হয়ে পড়তে লাগল। আমার বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে অনেক জিনিস আমি বুঝতে পারি আজকাল, আগে আগে অত বুঝতাম না। এ বাড়িতে থাকা আমার পক্ষে আরও কঠিন হয়ে উঠেছিল এইজন্যে যে, আমি চেষ্টা করেও জ্যাঠাইমাদের ধর্ম্ম ও আচারের সঙ্গে নিজেকে কিছুতেই খাপ খাওয়াতে পেরে উঠলাম না।

এরা খুব ঘটা ক'রে যেটা ধর্ম্ম ব'লে আচরণ করেন, আমার মনের সঙ্গে সেটা তো আদৌ মেলে না—আমি মনে যা বলি, বাইরে তাই করি—কিন্তু ওঁরা তাতে চটেন। ওঁদের ধর্ম্মের যেটা আমার ভাল লাগে—সেটাকে ওঁরা ধর্ম্ম বলেন না।

কিন্তু একটা ব্যাপার হয়েচে এই, আগে ভাবতাম শুধু জ্যাঠাইমাদের বাড়িতেই বুঝি এই রকম, এখন বয়স বাড়বার সঙ্গে বুঝতে পেরেছি—এ গ্রামের অধিকাংশই এই রকম—জ্যাঠাই-

মায়েরা একটু বেশী মাত্র।

এতেই আমার সন্দেহ হ'ল বোধ হয় আমার মধ্যেই কোনো দোষ আছে, যার ফলে আমি এঁদের শিক্ষা নিতে পারচি নে। ভাবলাম আমার যে ভাল লাগে না, সে বোধ হয় আমি বুঝতে পারি না বলেই—হয়ত চা-বাগানে থাকার দরুন ওদের ধর্ম্ম আমরা শেখবার সুযোগ পাইনি, যে আবহাওয়ার মধ্যে ছেলেবেলা থেকে মানুষ হয়েচি, সেটাই এখন ভাল লাগে।

ম্যাট্রিক পাস ক'রে শ্রীরামপুর কলেজে ভর্ত্তি হলাম। জ্যাঠামশায়দের গ্রাম আটঘরার নবীন চৌধুরী—যার বড় ছেলে ননী ভাল ফুটবল খেলতে পারে এবং যে প্রায়শ্চিত্তের বাধা-বিঘ্ন না মেনে বাবার সৎকারের সময়ে দলবল জুটিয়ে এনেছিল—তারই ভগ্নীপতির বাড়ি অর্থাৎ নবীন চৌধুরীর বড় মেয়ে শৈলবালার শ্বশুরবাড়ি শ্রীরামপুরে। ননীর যোগাড়যন্ত্রে তাদের শ্বশুরবাড়িতে আমার থাকবার ব্যবস্থা হ'ল।

এসে দেখি এদেরও বেশ বড় সংসার, অনেক লোক। শৈলদিদির স্বামীরা ছ'ভাই, তার মধ্যে চার ভাইয়ের বিয়ে হয়েচে, আর একটি আমার বয়েসী, ফার্স্ট ইয়ারেই ভর্ত্তি হ'ল আমার সঙ্গে। সকলের ছোট ভাই স্কুলে পড়ে। শৈলদি বাড়ির বড়বৌ, আমি তাঁর দেশের লোক, সবাই আমাকে খুব আদরযত্ন করলে। এখানে কিছুদিন থাকবার পরে বুঝলাম যে, সংসারে সবাই জ্যাঠামশায়দের বাড়ির ছাঁচে গড়া নয়। চা-বাগান থেকে এসে বাংলা দেশ সম্বন্ধে যে একটা হীন ধারণা আমার হয়েছিল, সেটা এখানে দু-চার মাস থাকতে থাকতে চলে গেল। আর একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম যে এ বাড়ির মেয়েরা কেউ কারও বড় একটা অধীন নয়। কোন একজনকে সকলের ভয় ক'রে চলতে হয় না বা কোন একজনের কথায় সকলকে উঠতে বসতে হয় না।

আমি থাকি বাইরের একটা ঘরে, কিন্তু অল্পদিনেই আমি বাড়ির ছেলে হয়ে পড়লাম। শৈলদিদি খুব ভাল, আমাকে ভাইয়ের মত দেখে। কিন্তু এতবড় সংসারের কাজকর্ম্ম নিয়ে সে বড় ব্যস্ত থাকে—সব সময় দেখাশুনো করতে পারে না। শৈলদিদির বয়স আমার মেজকাকীমার চেয়ে কিছু ছোট হবে—তিন-চারটি ছেলেমেয়ের মা। আটঘরায় থাকতে খুব বেশী আলাপ ছিল না, দু-একবার জ্যাঠামশায়দের বাড়ি বেড়াতে গিয়ে মায়ের সঙ্গে আলাপ করে এসেছিল, তারপর ননী কথাটা পাড়তেই তখনি রাজী হয়ে যায় আমায় এখানে রাখবার সম্বন্ধে। শৈলদিদির স্বামী তার কোনো কথা ফেলতে পারে না।

বাড়ির সকলের সঙ্গে খুব আলাপ হয়ে গেল। বাড়ির মধ্যে সর্ব্বত্র যাই—জ্যাঠামশায়দের বাড়ির মত এটা ছুঁয়ো না, ওটা ছুঁয়ো না—কেউ করে না। সব ঘরে যাই, সব বিছানাতেই বসি—সবাই আদরযত্ন করে, পছন্দ করে। এখন বয়স হয়েচে বুঝতে পেরেচি, আটঘরায় যতটা বাঁধাবাঁধি, এসব শহর-বাজারে অত নেই এদের। কষ্ট হয় মার জন্যে, সীতার জন্যে—তারা এখনও জ্যাঠাইমার কঠিন শাসনের বাঁধনে আবদ্ধ হয়ে ক্রীতদাসীর মত উদয়াস্ত খাটচে। দাদার জন্যেও কষ্ট হয়। সে লেখাপড়া শিখলে না—চাকুরি করবে সংসারের দুঃখ ঘুচোবে বলে—কিন্তু চাকুরি পায় না, ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, আজ বারো টাকা মাইনের চাকুরি করে, কাল জবাব হয়ে যায়, আবার আর এক জায়গায় ষোল টাকা মাইনের চাকুরি জোটায়। এত সামান্য মাইনেতে বিদেশে খেয়ে পরে কোন মাসে পাঁচ টাকা, কোন মাসে তিন টাকার বেশী মাকে পাঠাতে পারে না, তাতে কি দুঃখ ঘুচবে? অথচ না শিখলে লেখাপড়া, না করতে পারলে কিছু।

কলেজের ছুটির পরে গঙ্গার ধারে একখানা বেঞ্চির ওপর বসে এই সব কথাই ভাবছিলাম।

মাঝে মাঝে ভয়ানক ইচ্ছে হয় আবার একবার চা-বাগানের দিকে যাই, আর একবার হিমালয় দেখি। কতকাল রডোডেনড্রন ফুল দেখিনি, পাইন-বন দেখিনি, কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখিনি—সে রকম শীত আর পাইনি কোনোদিন,—এদের সবাইকে দেখাতে ইচ্ছে হয় সে দেশ। স্কুলে যখন প্রবন্ধ লিখতে দিত, আমি হিমালয় নিয়ে লিখতাম—আমার লেখা সকলের চেয়ে ভাল হ'ত—কারণ বাল্যের স্বপ্ন-মাখানো সে ওক পাইন বন, ঝর্ণা, তুষারমণ্ডিত কাঞ্চনজঙ্ঘা, কুয়াশা, মেঘ আমার কাছে পুরনো হবে না কোনো দিন, তাদের কথা লিখতে গেলে নতুনতর ভাব ও ভাষা কোথা থেকে এসে জোটে, মনে হয় আরও লিখি, এখনও সব বলা হয়নি। লেখা অপরে ভাল বললেও আমার মন তৃপ্ত হ'ত না, মনে হ'ত যা দেখেচি তার অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশও আঁকতে পারলাম না—অপরে ভাল বললে কি হবে, তারা তো আর দেখেনি?

ওপারে ব্যারাকপুরে সাদা বাড়িগুলো যেন সবুজের সমুদ্রে ডুবে আছে। ঠিক যেন চা-ঝোপের আড়ালে ম্যানেজার সাহেবের কুঠী—লাল টালির ছাদ থাকলেই একেবারে চা-বাগান। ওই দিকে চেয়েই তো রোজ বিকেলে আমার মনে হয় বাল্যের চা-বাগানের সেই দিনগুলো।

বাড়ি ফিরে গেলাম সন্ধ্যার পরে। চাকরকে ডেকে বললাম, লুলু আলো দিয়ে যা। এমন সময়ে ভবেশ এল। ভবেশ সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ে, খুব বুদ্ধিমান ছেলে, স্কলারশিপ্ নিয়ে পাস করেচে—প্রথম দিনেই কলেজে এর সঙ্গে আলাপ হয়।

ভবেশের দৈনন্দিন কাজ—রোজ এসে আমার কাছে খৃষ্টান ধর্ম্মের নিন্দা করা। আমাকে ও খৃষ্টান ধর্ম্মের কবল থেকে উদ্ধার ক'রে নাকি হিন্দু করবেই। আজও সে আরম্ভ করলে, বাইবেলটা নিতান্ত বাজে, আজগুবী গল্প। খৃষ্টান ইউরোপ এই সেদিনও রক্তে সারা দুনিয়া ভাসিয়ে দিলে গ্রেট ওয়ারে। কিসে তুমি ভুলেচ? রোজ যাও পিকারিং সাহেবের কাছে ধর্ম্মের উপদেশ নিতে। ওরা তো তোমাকে খৃষ্টান করতে পারলে বাঁচে। তা ছাড়া আজ হিন্দুদের বলবৃদ্ধি করা আমাদের সবার কর্ত্তব্য—এটা কি তোমার মনে হয় না?

আমি বললাম—তুমি ভুল বুঝেছ ভবেশ, তোমাকে এক দিনও বোঝাতে পারলাম না যে আমি খৃষ্টান নই; খৃষ্টান ধর্ম্ম কি জিনিস আমি জানিনে—জানবার কৌতূহল হয় তাই পিকারিং সাহেবের কাছে জানতে চাই। আমি যীশুখৃষ্টের ভক্ত, তাঁকে আমি মহাপুরুষ বলে মনে করি। তাঁর কথা আমার শুনতে ভাল লাগে। তাঁর জীবন আমাকে মুগ্ধ করে। এতে দোষ কিসের আমি তো বুঝি নে।

—ও বটে! বুদ্ধ, চৈতন্য, কৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ, এঁরা সব ভেসে গেলেন—যীশুখৃষ্ট হ'ল তোমার দেবতা! এঁরা কিসে ছোট তোমার যীশুর কাছে জিজ্ঞেস করি?

—কে বলেছে তাঁরা ছোট? ছোট কি বড় সে কথা তো উঠছে না এখানে? আমি তাঁদের কথা বেশী জানি নে। যতটুকু জানি তাতে তাঁদের শ্রদ্ধা করি। কিন্তু এও ত হয় কেউ একজনকে বেশি ভালবাসে আর একজনকে কম ভালবাসে?

—তুমি যতই বোঝাও জিতেন, আমার ও ভাল লাগে না। দেশের মাটির সঙ্গে যোগ নেই ওর। তোমার মত চমৎকার ছেলে যে কেন বিপথে পা দিলে ভেবে ঠিক করতে পারিনে। তোমার লজ্জা করে না একথা বলতে যে, রামকৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্যের কথা কিছু জান না, তাঁদের কথা জানতে আগ্রহও দেখাও না, অথচ রোজ যাও যীশুখৃষ্টের বিষয় শুনতে? একশোবার বলবো তুমি বিপথে পা দিয়ে দাঁড়িয়েচ। কই, একদিন গীতা পড়েচ? অথচ গসপেল পড়তে যাও পিকারিঙের কাছে—তোমাকে বন্ধু বলি তাই কষ্ট হয়, নইলে তুমি উচ্ছন্ন যাও না, আমি

বলতে যাব কেন ?

ভবেশ চলে গেলে অনেক রাত পর্য্যন্ত কথাটা ভাবলাম। খৃষ্টকে আমি ভক্তি করি, খৃষ্টের কথা বলতে ভাল লাগে, শুনতে ভাল লাগে। এতে দোষ আছে কিছু ? মহাপুরুষের কি দেশ-বিদেশ আছে ?

রাত্রে বাড়ির মধ্যে খেতে গিয়ে দেখি আর সকলের খাওয়া হয়ে গিয়েচে। ছোট বউ অর্থাৎ শৈলদিদির ছোট জায়ের রান্নার পালা ছিল এবেলা—তিনি হাঁড়িকুঁড়ি নিয়ে বসে আছেন। আমি খেতে বসলাম কিন্তু কেমন অস্বস্তি বোধ হ'তে লাগল—শৈলদিদির এই ছোট জাকে আমি কি জানি কেন পছন্দ করিনে। মেজবউ, সেজবউকে যেমন মেজদি, সেজদি ব'লে ডাকি—ছোটবউকে আমি এ পর্য্যন্ত কোন কিছু ব'লে ডাকিনি। অথচ তিনি আমার সামনে বেরোন বা আমার সঙ্গে কথা বলেন। ছোটবউয়ের বয়স আমার সমান হবে, এই সতেরো আঠারো—আমি যদিও 'আপনি' ব'লে কথা বলি। বাড়ির সব মেয়েরা ও বৌয়েরা জানে যে ছোটবউয়ের সঙ্গে আমার তেমন সদ্ভাব নেই। কেন আমি তাকে ছোটদিদি ব'লে ডাকিনে, শৈলদি আমায় এ নিয়ে কতবার বলেচে। কিন্তু আমার যা ভাল লাগে না, তা আমি কখনও করিনে।

সেদিন এক ব্যাপার হয়েচে। খেয়ে উঠে অভ্যাসমত পান চেয়েচি—কাউকে বিশেষ ক'রে সম্বোধন ক'রে নয়, যেন দেওয়ালকে বলচি এই ভাবে। ছোটবউ আধ-ঘোমটা দিয়ে এসে পান আমার হাতে দিতে গেলেন—আমার কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হ'ল কেন জানিনে, অন্য কারুর বেলা আমার তো এমনি অস্বস্তি বোধ হয় না ? পান দেবার সময় তাঁর আঙুলটা আমার হাতে সামান্য ঠেকে গেল—আমি তাড়াতাড়ি হাত টেনে নিলাম। আমার সারা গা কেমন শিউরে উঠল, লজ্জা ও অস্বস্তিতে মনে হ'ল, পান আর কখনও এমনভাবে চাইব না। মেজদি কি শৈলদির কাছে গিয়ে চেয়ে নেবো।

সেইদিন থেকে ছোটবউকে আমি এড়িয়ে চলি।

মাস-কয়েক কেটে গেল। শীত পড়ে গিয়েচে।

আমি দোতলার ছাদে একটা নিরিবিলি জায়গায় রোদে পিঠ দিয়ে বসে জ্যামিতির আঁক কষচি।

সেজদি হাসতে হাসতে ছাদে এসে বললেন—জিতু এস, তোমায় ওরা ডাকচে।

আমি বললুম—কে ডাকচে সেজদি ?

সেজদির মুখ দেখে মনে হ'ল একটা কি মজা আছে। উৎসাহ ও কৌতূহলের সঙ্গে পেছনে পেছনে গেলাম। দোতলার ওদিকের বারান্দাতে সব মেয়েরা জড়ো হয়ে হাসাহাসি করচে। আমায় সবাই এসে ঘিরে দাঁড়াল, বললে—এস ঘরের মধ্যে।

তাদের পেছনে ঘরে ঢুকতেই সেজদি বিছানার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন—ওই লেপটা তোল তো দেখি কেমন বাহাদুরি।

বিছানাটার উপর আগাগোড়া লেপ-ঢাকা কে একজন শুয়ে আছে লেপ মুড়ি দিয়ে। সবাই বললে—তোল তো লেপটা !

আমি হাসিমুখে বললাম—কি বলুন না সেজদি, কি হয়েচে কি ?

ভাবলুম বোধ হয় শৈলদির ছোট দেওর অজয়কে এরা একটা কিছু সাজিয়েচে বা ঐ রকম কিছু। তাড়াতাড়ি লেপটা টেনে নিয়েই চমকে উঠলাম। লেপের তলায় ছোটবৌঠাকরুন,

মুখে হাসি টিপে চোখ বুজে শুয়ে।

সবাই খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল। আমি লজ্জায় লাল হয়ে তাড়াতাড়ি ঘরের বার হয়ে গেলাম। বা রে, এ কি কাণ্ড ওদের? কেন আমায় নিয়ে এ রকম করা? তা ছাড়া—ছিঃ—না, ওকি কাণ্ড? ছোটবৌঠাক্রুন স্বেচ্ছায় এ ষড়যন্ত্রের মধ্যে আছেন নিশ্চয়। আমার রাগ হ'ল তাঁর ওপরে।

এর দিন-দুই পরে আমি আমার নিজের ঘরে একা বসে আছি, এমন সময় হঠাৎ ছোট-বৌঠাক্রুনকে দোরের কাছে দেখে অবাক হয়ে গেলাম—তিনি আমার ঘরে কখনও আসেননি এ পর্য্যন্ত। কিন্তু তিনি যেমনি এলেন, তেমনি চলে গেলেন, একটু দাঁড়ালেন না, যাবার আগে ঘরের মধ্যে কি একটা ফেলে দিয়ে গেলেন।

আমি বিস্মিত হয়ে তুলে দেখলাম একখানা ভাঁজ করা ছোট কাগজ—একখানা চিঠি! ছোট্ট চিঠি, দু-কথায়—

"সেদিন যা ক'রে ফেলেচি, সেজন্য আপনার কাছে মাপ চাই। আমি নিজের ইচ্ছেতে কিছু করিনি। দলে পড়ে করেচি, ক'দিন ধ'রে ভাবচি আপনার কাছে মাপ চাইব—কিন্তু লজ্জায় পারিনি! আমি জানি আপনার মন অনেক বড়, আপনি ক্ষমা করবেন।"

পত্রে কোন নাম নেই। আমি সেখানা বার বার পড়লাম—তারপর টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেললাম—কিন্তু টুকরোগুলো ফেলে দিতে গিয়ে কি ভেবে আমার একটা ছোট মনি-ব্যাগ ছিল, তার মধ্যে রেখে দিলাম।

সেদিন থেকে আমার কি হ'ল, আমি একা থাকলেই ছোটবৌঠাকরুনের কথা ভাবি। কিছুতেই মন থেকে আমি তাঁর চিন্তা তাড়াতে পারিনে। দু-পাঁচদিন ক'রে হপ্তাখানেক কেটে গেল। আমি বাড়ির মধ্যে তেমন আর যাইনে—অত্যন্ত ভয়, পাছে একা আছি এমন অবস্থায় ছোটবৌঠাক্রুনের সঙ্গে দেখা হয়ে পড়ে। ছোটবৌয়ের রান্নার পালার দিন আমি সকাল সকাল খেয়ে নি, যখন অনেক লোক রান্নাঘরে থাকে। যা যখন দরকার হয়, শৈলদি কি সেজদির কাছে চাই—ওদের গলা না শুনতে পেলে বাড়ির মধ্যে যেতে সাহস হয় না।

সেজদি একদিন বললেন,—জিতু, তুমি কলেজ থেকে এসে খাবার খাওয়া ছেড়ে দিলে নাকি? বিকেলে তো বাড়ির মধ্যে থাকই না, আসই না, কোথাও থেকে খেয়ে আস বুঝি?

আমি জানি বিকেলের চা-খাবার প্রায়ই ছোটবৌ তৈরি করেন—আর সে সময় বড় একটা কেউ সেখানে থাকে না। যে যার খেয়ে চলে যায়। ইচ্ছা ক'রেই বিকেলে চা খেতে যাই নে। পয়সা যেদিন থাকে, স্টেশনের দোকান থেকে খেয়ে আসি।

শীত কেটে গেল, বসন্ত যায়-যায়। আমার ঘরে জানলার ধারে বসে পড়চি, হঠাৎ জানলার পাশের দরজা দিয়ে ছোটবৌঠাক্রুন কোথা থেকে বেড়িয়ে এসে বাড়ি ঢুকচেন, সঙ্গে শৈলদির ছেলে কালো। তিনি আমায় দেখতে পাননি। আমি অপলকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলাম তাঁর দিকে। তাঁকে যেন নতুন রূপে দেখলাম—আরো কতবার দেখেছি, কিন্তু আজ দেখে মনে হ'ল এ-চোখে আর কখনও দেখিনি তাঁকে। তাঁর কপালের অমন সুন্দর গড়ন, পাশের দিক থেকে তাঁর মুখ যে অমন সুশ্রী দেখায়, ভুরুর ও চোখের অমন ভঙ্গি—এ-সব আগে তো লক্ষ্য করিনি? যখন কেউ দেখে না, তখন তাঁর মুখের কি অদ্ভুত ধরনের ভাব হয়! তিনি বাড়ির মধ্যে ঢুকে যেতেই আমার চমক ভাঙলো। বই খুলে রেখে দিলাম—পড়ায় আর মন

বসল না, সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক হয়ে গেলাম। কি একটা কষ্ট হ'তে লাগল বুকের মধ্যে—যেন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস আটকে আসচে। মনে হ'ল চুপ ক'রে বসে থাকতে পারব না, এক্ষুনি ছুটে মুক্ত বাতাসে বেরুতে হবে।

সেই রাত্রে আমি তাঁকে চিঠি লিখতে বসলাম—চিঠি লিখে ছিঁড়ে ফেললাম। আমার লিখে আবার ছিঁড়লাম। সেদিন থেকে তাঁকে উদ্দেশ ক'রে চিঠি লেখা যেন আমার কলেজের টাস্কের সামিল হয়ে দাঁড়ালো—কিন্তু লিখি আর ছিঁড়ে ফেলি।

দিন-পনের পরে ঠিক করলাম, আজ চিঠি দেবই। সেদিন বেলা দেড়টার মধ্যে কলেজ থেকে ফিরে এলাম—গ্রীষ্মের দুপুর, সবাই ঘুমুচ্চে। আমি বাড়ির মধ্যে ঢুকলাম, সিঁড়ির পাশে দোতলায় তাঁর ঘর, তিনি ঘরে বসে সেলাই করছিলেন—আমি সাহস ক'রে ঘরে ঢুকে চিঠি দিতে পারলাম না, চলে আসছিলাম, এমন সময় তিনি মুখ তুলেই আমায় দেখতে পেলেন, আমি লজ্জায় ও ভয়ে অভিভূত হয়ে সেখান থেকে সরে গেলাম, ছুটে নীচে এলাম—পত্র দেওয়া হ'ল না; সাহসই হ'ল না। বাড়ি থেকে বেরিয়ে পথে পথে উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়ালাম লক্ষ্যহীন ভাবে। সারাদিন ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে অনেক রাত্রে বাড়ি যখন ফিরি, রাত তখন বারোটা। বাড়িতে আবার সেদিন লক্ষ্মীপূজা ছিল। খেতে গিয়ে দেখি রান্নাঘরের সামনের বারান্দায় আমার খাবার ঢাকা আছে, শৈলদি ঢুলচেন রান্নাঘরের চৌকাঠে বসে। মনে মনে অনুতাপ হ'ল, সারা বিকেল খাটুনির পরে শৈলদি বেচারী কোথায় একটু ঘুমুবে, আর আমি কি না এভাবে বসিয়ে রেখেচি!

আমাকে দেখে শৈলদি বললে—বেশ, কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

কথার উত্তর দিতে গেলে মুশকিল, চুপচাপ খেতে বসলাম—শৈলদি বললে—না খেয়ে টন্ টন্ করে বেড়িয়ে বেড়িয়ে কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে গিয়েচে। চা খেতেও আসিস্ নে বাড়ির মধ্যে, কালোকে দিয়ে বাইরের ঘরে খাবার পাঠিয়ে দিলেও পাওয়া যায় না···থাকিস্ কোথায়?

খানিকক্ষণ পরে পাতের দিকে চেয়ে বললে—ও কি, ভাল ক'রে ভাত মাখ। ঐ ক'টি খেয়ে মানুষ বাঁচে ভাই? তোরা এখন ছেলেমানুষ, খাবার বয়স। লুচি আছে ভোগের, দেবো? পায়েস তুই ভালবাসিস, এক বাটি পায়েস আলাদা করা আছে। কই মাছের মুড়ো ফেললি কেন, চুষে চুষে খা। আহা, কি ছিরি হচ্ছে চেহারার!

পরদিন কিসের ছুটি। আমি দোতলার ছাদে কালোকে ডাকতে গিয়েচি তার প্রাইভেট টিউটর নীচে পড়াতে এসেচে ব'লে। সন্ধ্যার অন্ধকার হয়েছে। ওপরে উঠেই আমি একেবারে ছোটবৌঠাকুরুনের সামনে পড়ে গেলাম। তাঁর কোলে মেজদির দেড় বছরের খুকী মিণ্টু—সে খুব ফুটফুটে ফর্সা ব'লে বাড়ির সকলের প্রিয়, সবাই তাকে কোলে পাবার জন্যে ব্যগ্র। ছোটবৌঠাকরুন হঠাৎ আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন খুকীকে কোলে ক'রে। আমি বিস্মিত হ'লাম, কপালে ঘাম দেখা দিল। খুকী আমায় চেনে, সে আমার কোলে ঝাঁপিয়ে আসতে চায়। ছোটবৌঠাকুরুন আমার আরও কাছে এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন—খুকীকে আমার কোলে দিলেন। তাঁর পায়ের আঙুল আমার পায়ের আঙুলে ঠেকল। আমি তখন লাল হয়ে উঠেচি, শরীর যেন ঝিম্ ঝিম্ করচে। কেউ কোন দিকে নেই।

ছোটবৌঠাকুরুন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে স্বর নিচু ক'রে বললেন—আপনি আর বাড়ির মধ্যে আসেন না কেন আজকাল? আমার ওপর রাগ এখনও যায়নি?

আমি অতি কষ্টে বললাম—রাগ করব কেন?

—তবে সেদিন ও-ঘরে এলেন, আমার সঙ্গে কথা বললেন না তো! চলে গেলেন কেন?

মরীয়া হয়ে বললাম—আপনাকে সেদিন চিঠি দেবো ব'লে এসেছিলাম, কিন্তু পাছে কিছু মনে করেন, সেজন্যে দেওয়া হয়নি। পাছে কিছু মনে করেন ভেবেই বাড়ির মধ্যে আসিনে।

তিনি খানিকক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন। তার পর মৃদুস্বরে বললেন—মাথা ঠাণ্ডা ক'রে লেখাপড়া করুন। কেন ও-রকম করেন? আর বাড়ির মধ্যে আসেন না কেন? ওতে আমার মনে ভারি কষ্ট হয়। যেমন আসতেন তেমনি আসবেন বলুন? আমায় ভাবনার মধ্যে ফেলবেন না ও রকম।

আমার শরীরে যেন নতুন ধরনের অনুভূতির বিদ্যুৎ খেলে গেল। সেখানে আর দাঁড়াতে পারলাম না—মুখে যা এল, একটা জবাব দিয়ে নীচে নেমে এলাম। সারারাত্র আর ঘুমুতে পারিনে। আমার জন্যে একজন ভাবে এ চিন্তার বাস্তবতা আমার জীবনে একেবারে নতুন। নতুন নেশার মত এ অনুভূতি আমার সারা দেহমন অভিভূত ক'রে তুললে।

কি অপূর্ব্ব ধরনের আনন্দ-বেদনায় মাখানো দিন, সপ্তাহ, পক্ষ, মাস! দিন রাতে সব সময়ই আমার ওই এক চিন্তা। নির্জ্জনে কাটাই, কিছু ভাল লাগে না, অথচ যাঁর চিন্তা শয়নে-স্বপনে সর্ব্বদাই করি, পাছে তাঁর সামনে পড়ি এই ভয়ে সতর্ক হয়ে চলাফেরা করি। লেখাপড়া, খাওয়া, ঘুম সব গেল।

বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি ছোটবৌঠাকৃরুনের হ'ল অসুখ। অসুখ ক্রমে বাড়াবাড়ি ধরনের হ'ল। চাতরা থেকে যদু ডাক্তার দেখতে এল। তাঁর বাপের বাড়ি থেকে লোকজন এসে পড়ল—বাড়িসুদ্ধ লোকের মুখে উদ্বেগের চিহ্ন। আমি ডাক্তার ডাকা, ওষুধ আনা এ সব করি বাড়ির ছেলেদের সঙ্গে, কিন্তু একদিনও রোগীর ঘরে যেতে পারলাম না—কিছুতেই না। একদিন ঘরের দোরের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম—কিন্তু চৌকাঠের ওপারে যাইনি।

ক্রমে তিনি সেরে উঠলেন। একদিন আমার 'চয়নিকা'-খানা তিনি চেয়ে পাঠালেন—দিন-দুই পরে কালো বই ফিরিয়ে দিয়ে গেল। চার-পাঁচ দিন পরে 'চয়নিকা'-খানা কি জন্যে খুলতে গিয়েচি, তার মধ্যে একখানা চিঠি, ছোটবৌঠাকৃরুনের হাতে লেখা।

নাম নেই কারুর। লেখা আছে…

"আমার অসুখের সময় সবাই এল, আপনি এলেন না কেন? আমি কত আশা করেছিলাম যে আপনি দেখতে আসবেন, জানেন তা? আমার মরে যাওয়াই ভাল। কেন যে আবার সেরে উঠলাম। অসুখ থেকে উঠে মন ও শরীর ভেঙে গেছে। কালোর মুখে শুনেচি, আপনি ঘরে টাঙিয়ে রেখেচেন যীশুখৃষ্টের ছবি, তিনি হিন্দুর দেবতা নন্—কিন্তু আপনি যাকে ভক্তি করেন—আমি তাঁকে অবহেলা করতে পারিনে। আমার জন্যে তাঁর কাছে প্রার্থনা করবেন! আর-একটা কথা—একটিবার দেখতে কি আসবেন না?"

যীশুখৃষ্টের ছবির দিকে চাইলাম। সম্প্রতি একখানা বুদ্ধের ছবি, আর একখানা চৈতন্যের ছবিও এনে টাঙিয়েছিলাম। রোগশীর্ণা পত্রলেখিকার করুণ আকৃতি ওদের চরণে পৌঁছে দেবার ভার আমার ওপর পড়েচে। কিন্তু আমি কি পারব? অনুকম্পায় মমতায় আমার মন তখন ভরে উঠেচে। যে প্রার্থনা ওদের কাছে জানালাম, তা ভাষাহীন, বাক্যহীন। আমি এ-ছাড়া আর কিছু করতে পারিনে। সামনে হঠাৎ যেতে পারব না তাঁর। এ-বাড়িতেও আর বেশিদিন থাকা হবে না আমার। চলে যাব এখান থেকে।

টেস্ট পরীক্ষা দিয়েই আটঘরায় পালাবো, ঠিক করলাম। সেখানে যাইনি অনেক দিন।

মা চিঠি লিখেছেন, দেখবার জন্য ব্যস্ত হয়েচেন। আমার সেখানে যেতে ইচ্ছে হয় না শুধু জ্যাঠাইমাদের ব্যবহারের জন্য। গেলেই মায়ের দুঃখ দেখতে হবে। দাদা এক বাতাসার কারখানায় চাকরি পেয়েচে, মাসে কিছু টাকা অতি কষ্টে পাঠায়। সীতা বড় হয়ে উঠল—তারই বা কি করা যায়? দাদা একাই বা কি করবে!

পিকারিং সাহেব আমার হাতে গীতা দেখে একদিন বললেন—তুমি এ-সব পড় নাকি? বাইবেল কি তোমার সকল আধ্যাত্মিক অভাব পূর্ণ করে না?

আমি বললাম—পড়ে দেখতে কি দোষ আছে সাহেব? তাছাড়া আমি তো খৃষ্টান নই, আমি এখনও হিন্দু।

—দু-নৌকাতে পা দেওয়া যায় না, মাই বয়। তুমি খৃষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত হও—নয়তো তুমি বাইবেল পড় কেন?

—সাহেব, যদি বলি ইংরেজী ভাষা ভাল ক'রে শেখবার জন্যে?

পিকারিং সাহেব হো হো ক'রে হেসে উঠল। বললে—তোমার আত্মার পরিত্রাণ তার চেয়েও বেশি দরকারী। যীশুতে বিশ্বাস না করলে আত্মার ত্রাণ নেই। তিনি আমাদের সকলের পাপের ভার নিজে নিয়ে ক্রুশের নিষ্ঠুর মৃত্যু বরণ করেছিলেন। যীশুর ধর্ম্মে দীক্ষিত হও, তোমার পাপ তাঁর রক্তে ধুয়ে যাবে। এস, আমার সঙ্গে গান কর।

তারপর সাহেব নিজেই গান ধরল।—

Nothing but the Blood of Jesus
Oh, precious is the flow.
That can make me white as snow,
No other fount I know
Nothing but the Blood of Jesus.

পিকারিং সাহেবকে আমার খুব ভাল লাগে। খুব সরল, ধর্ম্মপ্রাণ লোক। স্ত্রী মারা গিয়েচে আজ দশ-বারো বছর, আর বিয়ে করেনি,—টেবিলের ওপর নিকেলের ফ্রেমে বাঁধানো স্ত্রীর ফটো সর্ব্বদা থাকে। মাঝে মাঝে আমায় জিজ্ঞেস করে—আমার স্ত্রী দেখতে কেমন ছিল, ভাল না? ফটো দেখে মিসেস্ পিকারিংকে সুন্দরী মনে হয়নি আমার, তবু বলি খুব চমৎকার।

পিকারিং সাহেবের ধর্ম্মমত আমার কাছে কিন্তু অনুদার ঠেকে—কিছুদিন এদের সঙ্গে থেকে আমার মনে হয় জ্যাঠাইমারা যেমন গোঁড়া হিন্দু—খৃষ্টানদের মধ্যেও তেমনি গোঁড়া খৃষ্টান আছে। এরা নিজের ধর্ম্মটি ছাড়া আর কারুর ধর্ম্ম ভাল দেখে না। এদের সমাজে সংকীর্ণতা আছে—এদেরও আচার আছে—বিশেষতঃ একটা নির্দ্দিষ্ট ধরনে ঈশ্বরের উপাসনা না করলে উপাসনা ব্যর্থ হ'ল এদের মতে। একখানা কি বইয়ে একবার অনন্ত নরকের গল্প পড়লাম। শেষ বিচারের দিন পর্য্যন্ত পাপীরা সেই অনন্ত নরকের অনন্ত আগুনের মধ্যে জ্বলবে পুড়বে, খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হবার আগেই যদি কোন শিশু মারা যায়—তাদের আত্মাও যাবে অনন্ত নরকে। এসব কথা প্রথম যেদিন শুনেছিলাম, আমাকে ভয়ানক ভাবিয়ে তুলেছিল। তারপর মনে হ'ল, কেন যীশু কি এতই নিষ্ঠুর? তিনি পরিত্রাণের দেবতা, তিনি সকল পাপীকেই কেন পরিত্রাণ করবেন না? যে তাঁকে জানে, যে তাঁকে না জানে—সবাইকে সমান চোখে তিনি কেন না দেখবেন? তাঁর কাছে খৃষ্টান ও অখৃষ্টানে প্রভেদ থাকবে কেন? বরং যে অজ্ঞানান্ধ তার প্রতি তাঁর অনুকম্পা বেশী হবে—আমার মনের সঙ্গে এই খৃষ্টের ছবি খাপ খায়। তিনি

প্রেমময় মুক্ত মহাপুরুষ, তাঁর কাছেও ধর্ম্মের দলাদলি থাকে কখনো ? যে দেশের, যে ধর্ম্মের, যে জাতিরই হোক তিনি সবারই—যে তাঁকে জানে, তিনি তাঁর, যে না জানে, তিনি তারও।

একদিন গঙ্গার ধারে বেঞ্চির ওপরে বসে জনকতক লোক গল্প করচে—শুনলাম বরানগরে কুঠির ঘাটের কাছে একটা বাগান-বাড়িতে একজন বড় সাধু এসেচেন, সবাই দেখতে যাচ্ছে। দু-এক দিনের মধ্যে একটা ছুটি পড়ল, বেলুড়ে নেমে গঙ্গা পার হয়ে কুঠির ঘাটের বাগান-বাড়ি খোঁজ করে বার করলাম। বাগান-বাড়িতে লোকে লোকারণ্য, সকলেই সাধুজীর শিষ্য, মেয়েরাও আছে। ফটকেব কাছে একজন দাড়িওয়ালা লোক দাঁড়িয়েছিল, আমি ফটকের কাছে গিয়ে আমার আসার উদ্দেশ্য বলতেই লোকটা দু-হাতে আমার গলা জড়িয়ে ধ'রে বললে—ভাই, এস এস, তোমাকে নেওয়ার জন্যেই যে আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি।

আমি পছন্দ করিনে যে কেউ আমার গলা জড়িয়ে ধরে—আমি ভদ্রভাবে গলা ছাড়িয়ে নিলাম। লোকটা আমায় বাগানের মধ্যে নিয়ে গেল। আমি কৌতুহল ও আগ্রহের সঙ্গে চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম। বাঁ-দিকের রোয়াকে একদল মেয়ে ব'সে একরাশ তরকারি কুটছে—একটা বড় গামলায় প্রায় দশ সের ময়দা মাখা হচ্চে,—যেদিকে চাই, খাওয়ার আয়োজন।

—সাধুর দেখা পাবো এখন ?

—তিনি এখন ধ্যান করচেন। তাঁর প্রধান শিষ্য জ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী ও-ঘরে আছেন, চল ভাই তোমায় নিয়ে যাই।

কথা বলচি এমন সময় একজন ভদ্রলোক এলেন, সঙ্গে একটি মহিলা—ফটকের কাছে তাঁরা মোটর থেকে নামলেন। একজন বালক-শিষ্যকে ভদ্রলোকটি কি জিজ্ঞেস করলেন—সে তাঁদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে এল আমার সঙ্গের দাড়িওয়ালা লোকটির কাছে। ভদ্রলোকটি তাকে বললেন—স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করতে এসেচি, তিনি কোথায় ?

—কোথা থেকে আসচেন আপনারা ?

—ভবানীপুর, এলগিন রোড থেকে। আমার নাম বিনয়ভূষণ মল্লিক।

দাড়িওয়ালা লোকটির শরীরের ইস্ক্রুপ কব্জা যেন সব ঢিলে হয়ে গেল হঠাৎ—সে তিন ভাগে ভেঙে হাত কচলে বললে—আজ্ঞে আসুন, আসুন, বুঝতে পেরেচি, আসুন। এই সিঁড়ি দিয়ে আসুন—আসুন মা-লক্ষী—

আমি বিস্মিত হ'লাম। এই যে বললে সাধুজী ধ্যানে বসেচেন—তবে ওঁরা গেলেন যে! লোকটি ওঁদের ওপরে দিয়ে আবার নেমে এল। আমায় একটা হলঘরে নিয়ে গেল। সেখানে জ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারীর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিলে। জ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারীর পরনে গেরুয়া আলখাল্লা, রং ফর্সা—আমার সঙ্গে বেশ ভালো ব্যবহার করলেন। তিনি আপিসের কাজে দেড়শো টাকা মাইনে পেতেন—ছেড়ে স্বামীজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। স্বামীজী বলেচেন তিনি তিনটে মহাদেশ উদ্ধার করবেন, সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলেই বেরিয়ে পড়বেন সে উদ্দেশ্যে। স্বামীজীর দেওয়া মন্ত্র জপ ক'রে তিনি অদ্ভুত ফল পেয়েচেন নিজে—এই সব গল্প সমবেত দর্শকের কাছে করছিলেন। আমি কৌতূহলের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম—কি ফল পেয়েচেন মন্ত্রের ? তিনি বললেন—মন্ত্র জপ করতে করতে মনে হয় যেন কোথায় পাহাড়ের উপরে বসে আছি। স্বামীজী বলেন—এ একটা উচ্চ অবস্থা। আমি আরও আগ্রহের সুরে বললাম—আর কিছু দেখেন ? তিনি বললেন, জ্যোতিঃদর্শন হয় মাঝে মাঝে।

—সে কি রকম ?

—তুই ভুরুর মাঝখানে একটা আগুনের শিখার মত দীপ্তি দেখতে পাই।

আমি হতাশ হ'লাম। আমি নিজে তো কত কি দেখি! এরা তো সে-সব কিছু দেখে ব'লে মনে হয় না। এরা আর কতটুকু দেখেচে তা হ'লে? পাহাড়ের ওপর বসে আছি এই দেখলেই বা কি হ'ল? ভুরুর মধ্যে আগুনের শিখা দেখলেই বা কি?

শুনলাম বেলা ছ'টার পরে স্বামীজীর দেখা পাওয়া যাবে। পাশের একটা ঘরে বসে রইলাম খানিকক্ষণ। আরও একজন বৃদ্ধ সেখানে ছিলেন। কথায় কথায় তিনি বললেন—দেখ তো বাবা—এই তোমরাও তো ছেলে। আর আমার হতচ্ছাড়া ছেলেটা পালিয়ে এসে বাড়ি থেকে এই সন্নিসির দলে যোগ দিয়েচে। এখানে তো এই খাওয়া এই থাকা। যাত্রার দলের মত এক ঘরে একশো লোক শোয়। ছেলেটার হাড়ির হাল হয়েচে—আগে একবার ফিরিয়ে নিতে এসেছিলাম—তা যায়নি। এবার আমি আসচি শুনে কোথায় পালিয়েচে হতভাগা। আহা কোথায় থাচ্চে, কি হচ্চে—এদিকে বাড়িতে ওর মা অন্নজল ছেড়েছে। এই সন্নিসির দলই তাকে সরিয়ে রেখেচে কোথায়। আজ তিন দিন এখানে বসে আছি, তা ছোঁড়া এল না। এরা তলায় তলায় তাকে খবর দিচ্চে। আবার আমার ওপর এদের রাগ কি? বলচে ছেলে তোমার মুক্তির পথে গিয়েচে,-বিষয়ের কীট হয়ে আছ তুমি, আবার ছেলেটাকে কেন তার মধ্যে ঢোকাবে? শোন কথা। ওদের এখানে বিনি পয়সার চাকর হাতছাড়া হয়ে যায় তা হ'লে যে! আমায় এই মারে তো এই মারে। দু-বেলা অপমান করছে।

—কোথা থেকে আপনার ছেলে এদের দলে এল?

—এই সন্নিসির দল গেছল আমাদের গাদারিপুরে। খুব কীর্ত্তন ক'রে ভিক্ষে ক'রে শিষ্য-সেবক তৈরি ক'রে বেড়াল ক'দিন। সেখান থেকে ছেলেটাকে ফুসলে নিয়ে এসেচে। পয়সা হাতে থাকত আমার তো ব্যাটারা খ্যাতির করত। এখানে খেতে দেয় না; ওই বাজারের হোটেল থেকে খেয়ে আসি। একটু এই দালানটাতে রাত্রে শুয়ে থাকি; তাও দু-বেলা বলচে—বেরো এখান থেকে। ছোঁড়াটা ফিরে আসবে, সেই আশায় আছি।

স্বামীজীর সঙ্গে দেখা হ'ল না। দেখার ইচ্ছেও আর ছিল না।

সন্ধ্যার পরে স্টীমারে পার হয়ে বেলুড়ে এলাম; মনে কত আশা নিয়ে গিয়েছিলাম ওবেলা। মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহার যেখানে ভাল নয়, সেই জ্যাঠাইমাদের বাড়ির গোপীনাথ জিউএর পূজোর সময় যা দেখেছি, হীরুঠাকুরের প্রতি তাদের ব্যবহার যা দেখেছি—সেই সব একই যেন।

দিন দুই পরে ছোটবৌঠাকুরুনের বাপের বাড়ি থেকে বড় ভাই তাকে নিতে এল। আমার সঙ্গে দশ-পনের দিন দেখা হয়নি, ভাবলুম যাবার সময় একবার দেখা করবই। দুপুরের পরে ঘোড়ার গাড়িতে জিনিসপত্র ওঠানো হচ্চে, আমি নিজের ঘরের জানলা দিয়ে দেখচি আর ভাবচি ওঠবার সময় গাড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়াব, না ওপরে গিয়ে দেখা ক'রে আসব?

পায়ের শব্দে পেছনে চেয়ে দেখি ছোটবৌঠাকুরুন দোরের কাছে দাঁড়িয়ে, রোগশীর্ণ মুখে, হাতায় লালপাড় বসানো ব্লাউজ গায়ে, পরনে লালপাড় শাড়ী। আমি থতমত খেয়ে বললাম —আপনি! আসুন, এই টুলটাতে—

তিনি মৃদু, সহজ সুরে বললেন—খুব তো এলেন দেখা করতে!

—আমি এখুনি যাচ্ছিলাম, আপনি এলেন তাই, নইলে—

ছোটবৌঠাকুরুন ম্লান হেসে বললেন—না, নিজেই এলাম। আর আপনার সঙ্গে কি দেখা হবে? আপনি তো পরীক্ষা দিয়ে চলে যাবেন। বি. এ পড়বেন না?

আমি একটু ইতস্তত ক'রে বললাম—ঠিক নেই, এখানে হয়ত আর আসব না।

তিনি বললেন—কেন আর এখানে আসবেন না ?

আমি কোন কথা বললাম না। দুজনেই খানিকক্ষণ চুপচাপ।

তারপর তিনি আমার কাছে এগিয়ে এসে মৃদু অনুযোগের সুরে বললেন—আপনার মত ছেলে যদি কখনও দেখেছি! আগে যদি জানতাম তবে সেবার আপনাকে নিয়ে যে ওরা ঠাট্টা করেছিল, আমি তার মধ্যে যাই ? এখন সে-কথা মনে হ'লে লজ্জায় ইচ্ছে হয় গলায় বঁটি দিয়ে মরি।

তারপর গভীর স্নেহের সুরে বললেন—না, ও-সব পাগলামি করে না, আসবেন এখানে, কেন আসবেন না, ছিঃ—

দরজার কাছে গিয়ে বললেন—না এলে বুঝবো আমায় খুব বেন্না করেন, তাই এলেন না।

॥ ৭ ॥

দাদা কালীগঞ্জে একটা বাতাসার কারখানায় কাজ করে। অনেক দিন তার সঙ্গে দেখা হয়নি, কিছু টাকার দরকারও ছিল, কারণ কলেজের কিছু বাকী মাইনে ও পরীক্ষার ফি-এর টাকার অভাব হওয়াতে শৈলদি লুকিয়ে ষোলটা টাকা দিয়েছিল। যাওয়ার আগে সে টাকাটা তাকে দিয়ে যাওয়া দরকার, যদিও সে চায়নি। বাঁশবেড়ের ঘাটে গঙ্গা পার হয়ে ওপারে যাব, খেয়ার নৌকো আসতে দেরি হচ্ছে, আমি একা একটা পুরোনো বাঁধাঘাটের সিঁড়িতে বসে অপেক্ষা করচি। ঘাটের ওপরে একটা জীর্ণ প্রাচীন শিবমন্দির, তার ফাটলে ফাটলে বট-অশ্বত্থের গাছ, মন্দিরের চূড়ার ত্রিশূলটা পশ্চিমে হেলে-পড়া সন্ধ্যার সূর্য্যের আলোয় মনে হচ্চে যেন সোনার। ভারি ভাল লাগছিল মন্দিরটা, আর এই জনবিরল বাঁধাঘাট। ওই মন্দিরে যদি আরতি হ'ত এই সন্ধ্যায়, বন্দনারত নরনারীর দল ওই ভাঙা চাতালে দাঁড়িয়ে রইত, তবে আমার আরও ভাল লাগত। কথাটা ভাবচি, এমন সময় আমার শরীরটা যেন কেমন ক'রে উঠল, কানের পাশটা শির্‌শির্ করতে লাগলো। হঠাৎ আমার মনে হ'ল এই ঘাটের এই মন্দিরে খুব বড় একজন সাধুপুরুষ আছেন, তাঁর দীর্ঘ চেহারা, মাথায় বড় বড় চুল, প্রসন্ন হাসিমাখানো মুখ। আমি তাঁকে দেখতে পেলাম না। কিন্তু তাঁর উপস্থিতি অনুভব করলাম। তিনি এখানে অনেকদিন আছেন, ভাঙা ঘাটের রানায় ব'সে ওপারের উদীয়মান পূর্ণচন্দ্রের দিকে চেয়ে এই সন্ধ্যায় তিনি উপাসনা করেন—এবং তিনি কারও ওপর রাগেন না। কত লোক না বুঝে ঘাটের নির্জ্জনতা ভঙ্গ করে, তিনি সদাই প্রসন্ন, সকলের ওপরে সদাই স্নেহশীল।

এ-রকম যখন হয়, তখন আমার শরীর যেন আমার নিজের থাকে না—নয়ত আমার সাধারণ অবস্থা থাকলে জিজ্ঞেস করতুম অনেক কথাই তাঁকে। একটু পরে খেয়া নৌকো এল—অনিচ্ছার সঙ্গে ঘাট ছেড়ে নৌকোতে উঠলাম। জায়গাটা পবিত্র প্রভাবে ভরা—এমন একটা প্রভাব, যা সে-দিন বরানগরের বাগান-বাড়ির সেই সাধুর কাছে গিয়ে অনুভব করিনি।

দাদা আমায় দেখে খুব খুশী হ'ল। ওর চেহারা বড় খারাপ হয়ে গিয়েছে, ছেলেবেলাকার দুধে-আল্‌তা রঙের সেই সুশ্রী বালককে দাদার মধ্যে আর চিনে নেওয়া যায় না। একে লেখাপড়া শিখলে না, তার ওপরে এই সব পাড়াগাঁয়ে চাকরি ক'রে বেড়ায়—চেহারায়, বেশ-

ভুষায়, কথাবার্ত্তায় দাদা হয়ে গিয়েচে যেন কেমন! তেমনি ধরনের লোকের সমাজে সর্ব্বদা চলে ফেরে।

রাত তখন প্রায় নটা, দাদা ফিরে এসে রান্না চড়ালে। কি বিশ্রী জায়গাতেই থাকে। বাতাসার কারখানাটা একটা প্রকাণ্ড লম্বা চালাঘর—ছ-সাতটা বড় বড় উনুনে দিনরাত গনুগনে আগুন—বড় বড় কড়ায় গুড়ের রস আর চিনির রস তৈরি হচ্ছে। এই কারখানায় অত আগুনের তাতে থাকা কি দাদার অভ্যেস আছে কোনকালে!

দাদা নিজেই রান্না চড়ালে। আমায় বললে—খিচুড়ি খাবি জিতু? বেশ ভাল মুগের ডাল আছে—ভাঁড়ে দেখি ঘি আছে বোধ হয় একটু—

দাদার বাসা ছোট একখানা চালাঘর। মেঝের ওপর শোয়, বিছানা পাতাই থাকে, কোনকালে' তোলা হয় না, তবে খুব ময়লা নয়—আমরা ক' ভাইবোন ময়লা জিনিসপত্র মোটেই ব্যবহার করতে পারি নে, ছেলেবেলা থেকেই অভ্যেস। বিছানার ওপরকার কুলুঙ্গিতে খবরের কাগজ পাতা, একখানা ভাঙা পারা বার-হওয়া আর্শি, আর একখানা শিঙের চিরুনি।

দাদা ছিল আমাদের মধ্যে সব চেয়ে ছেলেমানুষ, সব চেয়ে আনাড়ি, তাকে এখন নিজে রান্না ক'রে খেতে হচ্ছে! অথচ কি-ই বা জানে ও সংসারের, কি কাজই বা পারে?

রান্না চড়িয়ে দাদা বললে—ভাল কথা, দাঁড়া জিতু, তোর জন্যে একখানা ইংরিজি বই রেখে দিইচি—বের করে দিই—

টিনের ছোট তোরঙ্গ খুলে একখানা মোটা ইংরিজি বই আমার হাতে দিয়ে বললে—এখানে সাতুবাবু কণ্ট্রাক্টর আসে বাতাসা নিতে, সে ফেলে গিয়েছিল আর ফিরে আসেনি—আমি তুলে রেখে দিইচি, ভাবলাম জিতু পড়বে—

পাতা উল্টে দেখি একটা বিলিতি স্টীল কোম্পানীর মূল্যতালিকা—খুব চমৎকার পাতা, চমৎকার ছাপা, বাড়িঘর, রেলের পুল, কড়িবরগার ছবিতে ভর্ত্তি। দাদার ওপরে দুঃখ হ'ল, বেচারি এ সব পড়তে পারে না, বুঝতেও পারে না—ভেবেচে কি অপূর্ব্ব বই-ই না জানি।

আমি কিছু না বলে বইখানা আমার পুঁটুলিতে বেঁধে নিলাম। দাদা ততক্ষণে তোরঙ্গ হাতড়ে আর একখানা ছোট ছেলেদের গল্পের বই বার ক'রে বললে—আর এই দ্যাখ্ একখানা বই, ভারি মজার মজার গল্প—আমি খেয়েদেয়ে রোজ একটুখানি করে পড়ি—'খোঁড়া শিকারী'র গল্পটা পড়ছিলাম, পড় দেখি শুনি?

এ-সব গল্প ইংরিজিতে কতবার পড়েচি, আমার কাছে এর নতুনত্ব নেই কোথাও। তবুও দাদাকে পড়ে পড়ে শোনাতে লাগলাম, দাদা মাঝে মাঝে খিচুড়িতে কাঠি দিয়ে দেখে, আর হাঁটু দুটো দু-হাতে জড়িয়ে একটুখানি পেছনে হেলান দিয়ে ব'সে আমার মুখের দিকে আগ্রহের সঙ্গে চেয়ে চেয়ে শোনে। আমার এমন কষ্ট হ'ল! এ-সব গল্প যে ইংরিজি স্কুলের নীচের ক্লাসের ছেলেরাও জানে। আহা, দাদা বড় অভাগা, অল্প বয়সে সংসারের চাপ ঘাড়ে পড়ে সারাজীবনটা ওর নষ্ট হয়ে গেল।

টাকার কথাটা দাদাকে বলতে মন চাইল না। ওর কত কষ্টে রোজগার করা পয়সা; একটা আধটা নয়, ষোলটা টাকা—এগারো টাকা মাসে মাইনে পায়—ওর দেড় মাসের রোজগার কোথা থেকে দেবে ও? শৈলদির টাকা আমি এর পরে যে ক'রে হয় শোধ দেবো।

দাদা নিজেই বললে—বাড়ি যাবি তো জিতু, গোটা দশেক টাকা নিয়ে যা। আমার বড্ড ইচ্ছে সীতাকে একছড়া হার গড়িয়ে দিই—কিন্তু টাকাই জমে না হাতে। তোর টাকার যদি

দরকার থাকে, তবে আলাদা-করা হারের জন্ত কুড়িটা টাকা তোলা আছে—তাই থেকে নিয়ে যা, দেবো এখন। হার এর পর দেখব।—সাত-পাঁচ ভেবে টাকা নেওয়াই ঠিক করলাম। শৈলদির ওপর বড় জুলুম করা হয়, নইলে শৈলদিকে মনে হয় না যে সে পর। এত আপনার মত ক'জন আপনার লোকই বা দেখে? মায়ের পরেই শৈলদিকে ভক্তি করি। সে লুকিয়ে টাকা দিয়েচে—তাকে আর বিপন্ন ক'রবো না।

যে দাদা সকাল আটটার কমে বিছানা থেকে উঠত না, তাকে ভোর পাঁচটার সময় উঠে কারখানায় গিয়ে কাজে লাগতে হয়। আমিও দাদার সঙ্গে গেলাম। কারখানার মালিকের নাম মতিলাল দাস, বয়েস পঞ্চাশের ওপর, তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী আছে সংসারে, আর দ্বিতীয় পক্ষের ছেলেমেয়ে। দাদা মতিলালের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীকে মাসীমা ব'লে ডাকে। মতিলাল আমায় দেখে বললে—তুমি নিতাই ঠাকুরের ভাই? বেশ, বেশ। আজকাল কি বই পড়ায় তোমাদের?

তার প্রশ্ন শুনে আমার হাসি পেল। আমি জবাব দেবার আগেই মতিলাল বললে—আমাদের সময়ে যে-সব বই পড়ানো হ'ত, আজকাল কি আর সে-সব বই আছে? এই ধর পদ্যপাঠ, তৃতীয় ভাগ, যদুবাবুর। আহা!

কুব্জপৃষ্ঠ ন্যুব্জদেহ উষ্ট্র সারি সারি
কি আশ্চর্য্য শোভাময় যাই বলিহারি

কি সব শব্দ লাগিয়েচে দেখেচ একবার। ভাষার জ্ঞান হ'ত কত পড়লে! বলো দিকি ন্যুব্জদেহ মানে কি? আমাদের হরিশ পণ্ডিত পড়াত কালনার স্কুলে, আমি তখন ছাত্রবৃত্তি পড়ি। তখন ছাত্রবৃত্তি পড়লে মোক্তার হ'ত, দারোগা হ'ত। এখন হয়েচে তো সব ছেলেখেলা।

আমি এসেছি শুনে মতিলালের স্ত্রী দুপুরে খেতে বললে। আমায় দেখে বললে—এস বাবা, তুমি নিতাইয়ের ভাই? তুমিও মাসীমা ব'লে ডেকো। কাছে দাঁড়িয়ে থেকে মাসীমা দাদাকে রান্না দেখিয়ে দিতে লাগল, কারণ আমরা খেতে চাইলেও ওরা রেঁধে আমাদের খেতে দেবে কেন?

মাসীমা সংসারে নিতান্ত একা। মতিলালের ও-পক্ষের ছেলেমেয়েরা বাপের তৃতীয় পক্ষের পরিবারকে দু-চোখ পেড়ে দেখতে পারে না, বা এখানে থাকেও না কেউ। অথচ মাসীমার ইচ্ছে তাদের নিয়ে মিলেমিশে সংসার করা। আমরা খেতে বসলে কত দুঃখ করতে লাগল।

—এই ত্যাখো বাবা, কেষ্টকে বলি বৌমাকে নিয়ে এখানে এস, এসে দিব্যি থাক। বৌমাটি বড় চমৎকার হয়েচে। তা যদি আসে! সেই নিয়ে রেখেচে শ্বশুরবাড়ি, কালনার কাছে দাঁইহাট—সেখানেই থাকে। আমার নিজের পেটে তো হ'ল না কিছু, ওরাই আমার সব—তা এমুখো হয় না কেউ। বড় মেয়ে দুটি শ্বশুরবাড়ি আছে, আনতে পাঠালে বলে, সৎমায়ের আর অত আত্যিহয়ো দেখাতে হবে না। শোন কথা। আমায় মা বলে কেউ ডাকেও না। ডাকলে তাদের মান যাবে।

মাসীমাকে খুশী করবার জন্তে আমি কারণে-অকারণে খুব 'মাসীমা' 'মাসীমা' ব'লে ডাকতে লাগলাম। আমাদের পাতে আবার মাসীমা খেতে বসলেন, বললেন—ব্রাহ্মণের পেরসাদ পাবো, ওতে কি আর ছোট বড় আছে বাবা?

আমার মনে অস্বস্তি হ'ল; আমি তো এঁদের এসব মানিনে, ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম পালন করিনে, সে কথা তো ইনি জানেন না। অথচ খুলে বললে মাসীমার মনে কষ্ট দেওয়া হবে হয়ত।

দাদার কাছ থেকে আটঘরায় এলাম। আসবার সময় সীতার জন্যে ভাল সাবান কিনে নিয়ে এলাম, বই পড়তে ভালবাসে ব'লে দু-তিনখানা বাংলা বইও আনলাম। সীতা বড় হয়ে উঠেচে—মাথায় খুব লম্বা হয়েচে, দেখতে সুন্দর হয়েচে আরও।

আমার হাত থেকে সাবান নিয়ে হেসে বললে—দেখি দাদা কেমন সাবান···আমার একখানাও আস্ত সাবান ছিল না। একখানা সানলাইট সাবান আনিয়েছিলুম বাজার থেকে—সে আধখানা হয়ে গিয়েচে।

সীতার সে পুরোনো অভ্যাস এখনও আছে, কথা বলতে বলতে হঠাৎ খোঁপায় হাত দিয়ে দেখে ঠিক আছে কি-না। লম্বা ঢেঙা, চওড়া নক্সা-পাড় কাপড় পরনে, খোঁপার ধরনও সেকেলে। আজকাল শহরে দেখে এসেচি ও-রকম খোঁপা উঠে গিয়েচে। ও-ধরনের কাপড় পরলে সেখানে লোকে হাসবে, বেচারী সীতা! লেখাপড়া শেখবার, বই পড়বার ওর কত আগ্রহ! অথচ এই পাড়াগাঁয়ে পরের বাড়ি দাসীবৃত্তি ক'রেই ওর জীবন কাটল। না হ'ল লেখাপড়া শেখা, না মিটল কোন সাধ। অথচ ওর বুদ্ধি ছিল এত চমৎকার, মিশনারী মেয়েরা কত প্রশংসা করত, ওকে কি ভালই বাসত মিস্ নর্টন। কিন্তু কি হ'ল ওর? এখন, সেই কত কাল আগেকার পুরোনো বইগুলোই পড়চে, কিছুই শেখেনি, কিছুই দেখেনি।

সীতা বললে—দাদা পাস করেচ?

—পাসের খবর এখনও বেরোয় নি। পাস করবো ঠিকই।

—পাস হ'লে আমায় জানিও দাদা। আমি তোমাকে একটা জিনিস প্রাইজ দেবো!

—কি জিনিস রে?

—একটা মনিব্যাগ বুনচি লাল উলের। তোমার জন্যে একটা, বড়দার জন্যে একটা। তোমাদের নাম লিখে দেবো। মিস্ নর্টন আমাদের দিত কত কি প্রাইজ—না?

—মিস্ নর্টনকে তোর মনে আছে সীতা? তুই তো তখন খুব ছোট।

—খুব মনে আছে, তার দেওয়া জিনিস আমার বাক্সে এখনও রয়েচে। দেখলেই তাদের কথা মনে পড়ে।

জ্যাঠামশায় আমায় ডেকে বললেন—জিতু শোনো। এখন তুমি বড় হয়েচ, তোমার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে কাজ করাই ভাল। সীতার বিয়ে না দিলে নয়। ওর পনের-ষোল বছর হ'ল, আর ঘরে রাখা যায় না। কিন্তু এদিকে টাকাকড়ি খরচ করবে কে? হাজার টাকার কমে আজকাল ভদ্রলোকের ঘরের বিয়ের কথাই তোলা যায় না। দেখে এসেচ তো শহর-বাজারে? তা আমি এক জায়গায় ঠিক করেচি; পাত্রটির বাপ আমার এখানে এসেছিল। জমিজমা আছে, চাষা গেরস্ত, খেতে পরতে কষ্ট পাবে না। আখের চাষই আছে অমন বিশ-বাইশ বিঘে। পাত্রটি চাষবাস দেখে, রং একটু কালো—তা হোক, পুরুষ মানুষের রঙে কি আসে যায়, তবে বংশ ভাল, কামদেব পণ্ডিতের সন্তান, সবে তিন পুরুষে ভঙ্গ, আমাদেরই স্বঘর।

আমি বললাম—লেখাপড়া কতদূর করেচে?

—লেখাপড়া কি আর এম-এ, বি-এ পাস করেচে? তবে বাংলা ছাত্রবৃত্তি পর্য্যন্ত পড়েচে, দিব্যি হাতের লেখা। হ্যাঁ, একটা কথা ভুলে যাচ্ছি,—অল্পদিন হ'ল পাত্রটির প্রথম পক্ষের স্ত্রী মারা গিয়েচে—তবে সে কিছু নয়, বয়েস কমই। একটি বুঝি ছেলে আছে ও-পক্ষের।

ছাত্রবৃত্তির কথায় আমার মতিলালের উটের কবিতাটি মনে পড়ল। আমি বললাম—আচ্ছা আমি ভেবে বলব জ্যাঠামশাই। লেখাপড়া জানে না আর তাতে দোজবরে, এতে বিয়ে দেওয়া আমার মন সরে না। সীতার মত মেয়ে, আপনি বলুন না জ্যাঠামশাই?

জ্যাঠামশাই নিজের কথার প্রতিবাদ সহ্য করতে পারেন না—তিনি এ অঞ্চলের মানী ব্যক্তি, আগের চেয়ে বিষয়-আশয় টাকাকড়ি এখন তাঁর আরও বেশী, এদিকের সব লোক তাঁকে খাতির করে চলে, কেনই বা তিনি প্রতিবাদ সহ্য করবেন? সে জানি এ গাঁয়ের রাম বাঁড়ুয্যের ব্যাপারে। রাম বাঁড়ুয্যে কি জন্যে রাত্রে আফিম খেয়ে শুয়েছিল—সকালে উঠে খবর পেয়ে জ্যাঠামশায় গেলেন। রাম বাঁড়ুয্যে ছিল জ্যাঠামশায়ের খাতক। জ্যাঠামশায় গিয়ে কড়া স্বরে বললেন—কি হয়েচে রাম? রাম বাঁড়ুয্যে তখন কথা বলতে পারচে না—জ্যাঠামশায়ের কথার উত্তর সে দিতে পারল না। জ্যাঠামশায় ভাবলেন, বাঁড়ুয্যে তাঁর প্রতি অসম্মান দেখিয়ে ইচ্ছে করেই কথার উত্তর দিচ্চে না। বললেন—ভাল ক'রে কথার উত্তর দাও—কার সামনে কথা বলচ জান না? সঙ্গের সব লোক বললে—হাঁ, কর্ত্তা যা বলচেন, জবাব দাও ওঁর কথার। কিন্তু রাম বাঁড়ুয্যে জ্যাঠামশায়ের চোখরাঙানির চৌহদ্দি পার হয়ে চলে গেল ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যেই—কি জন্যে সে আফিম খেয়েছিল কেউ জানে না—তার মৃত্যুর পরে জ্যাঠামশায় তার ভিটেমাটি বিক্রী ক'রে নিয়ে নিলেন—তার বিধবা স্ত্রী নাবালক একটি মাত্র মেয়ের হাত ধরে ভাইদের দোরে গিয়ে পড়লো। আমি যেবার ম্যাট্রিক দিই, সে বছরের কথা।

আমার কথার উত্তরে জ্যাঠামশায় আমায় অনেকগুলো কথা শুনিয়ে দিলেন। আমাদের এদিক নেই, ওদিক আছে। রাজামহারাজাদের ঘরে বোনের বিয়ে দেবার ইচ্ছে থাকলেই তো হয় না, পয়সা চাই। পনের-ষোল বছরের মেয়ে গ্রামে সমাজের মধ্যে বাস করতে গেলে আর ঘরে রাখা চলে না। তা ছাড়া তিনি কথা দিয়ে ফেলেচেন—তাঁর কথার মূল্য আছে ইত্যাদি।

জ্যাঠামশায়দের বাড়ির জীবনযাত্রার ধারা সেই পুরোনো দিনের মতই চলেচে। এখানে এলেই বুঝি, এদের মন নানা দিক থেকে কত ভাবে শৃঙ্খলিত। বাড়িতে এতটা জমি রয়েচে, ঠাকুরপূজার উপযোগী ছোট্ট একখানা গাঁদা ও করবী ফুলের বাগান ছাড়া আর কোথাও একটা ফুলের গাছ নেই। উঠোনের কোন জায়গায় এরা কোথাও একটু সবুজ ঘাস রাখবে না—মেজকাকার কাজ হচ্চে এতটুকু কোথাও ঘাস গজালে তখনি নিজের হাতে নিড়েন ধরে উঠিয়ে ফেলা। প্রকাণ্ড উঠোন চাঁচাছোলা, সাদা মাটি বার করা, সবুজের লেশ নেই। ব'লে দেখেছি এরা তা বোঝে না। সামনের উঠোনটা লাউ-মাচা, পুঁই-মাচায় ভরা—প্রত্যেক জায়গাটুকুতেই তরকারি লাগিয়েচে, নয়ত মান-কচুর ঝাড়।

একদিন জ্যাঠামশায়ের ছেলে হারুদাকে বললাম—আমি শ্রীরামপুর থেকে ভাল মরশুমী বীজ এনে দেবো আর এক রকম লতা আছে আমাদের কলেজে, চমৎকার নীল ফুল ফোটে। বাড়ির সামনেটা বাগান করো আর চণ্ডীমণ্ডপের চালে সেই লতা উঠিয়ে দাও—

হারুদা বললে—তোমার যেমন বুদ্ধি, ফুলগাছে কি দুধ দেবে শুনি? মিছিমিছি জায়গা জোড়া—চণ্ডীমণ্ডপের চালে কি বছর ত্রিশ-চল্লিশখানা চালকুমড়া হয় জানিস্ তা?

অর্থাৎ আহারের আয়োজন হ'লেই হ'ল, আর কিছু দরকার নেই এদের।

মেজকাকার ঘরে একদিন শুয়েছিলাম, কাকীমা এখানে নেই—মেজকাকার আবার একলা শুতে ভয় করে, তাই আমাকে শুতে বলেছিলেন। সারাদিন গরমের পরে অনেক রাত্রে এক পশলা বৃষ্টি হ'ল—কি সুন্দর ভিজেমাটির গন্ধ আসতে লাগল—মেজকাকা দেখি উঠে তাড়াতাড়ি জানলা বন্ধ করচেন।

আমি বললাম—বন্ধ করচেন কেন মেজকাকা, বেশ ভিজে হাওয়া আসচে—

মেজকাকা বললেন—উঁহু, উঁহু—ঠাণ্ডা লাগবে—শেষরাতের বিষ্টির হাওয়া বড় খারাপ, কাল সর্দ্দি ধরবে—আমার ধাতই একে সর্দ্দির!

দুপুরে সীতার সম্বন্ধে মাকে বললাম। মায়ের ইচ্ছে নয় ওখানে সীতার বিয়ে দেওয়া, তবে মা নিরুপায়, এ বাড়িতে তাঁর কোন কথা খাটে না। আমি বললাম—আমি কোথাও চাকরি খুঁজে নিই মা। সীতার বিয়ে নিজে থেকে দেব।

মা বললেন—শোন কথা ছেলের। তুই লেখা-পড়া ছেড়ে এখন করবি কি? তোদের মুখের দিকে চেয়ে এখানে কষ্ট করে পড়ে থাকি। নিতুর তো কিছু হ'ল না, তুই বি-এটা পাস্ কর্। সীতার কপালে যা থাকে হবে। তুই এখন চাকরিতে কত টাকা পাবি যে সীতার বিয়ে দিবি নিজে? মাঝে পড়ে তোর পড়াটা হবে না। আর শোন্, এ নিয়ে কোন কথা যেন বলিস নে কারুর সঙ্গে। তোর জ্যাঠাইমা শুনতে পেলে রক্ষে রাখবে না।

মা এত ভয় করেও চলেন ওদের! প্রথম জীবনে কোন কষ্ট পান নি, তারপর চা-বাগান থেকে এসে দুঃখের মধ্যে পড়ে গিয়ে এমন ভীতু হয়ে উঠেচেন। সদাই ওঁর ভয় থাকে জ্যাঠাইমা ওঁদের দু-জনকে এ বাড়িতে জায়গা দিতে না চাইলে, আমার লেখাপড়া না হয়, সীতার বিয়ে নিয়ে দাদা জড়িয়ে পড়ে—এই সব।

সীতাকে জলে ফেলে দিতে পারব না, মা যাই বলুন।

জ্যাঠামশায়দের বাড়িতে বেশীক্ষণ আমার থাকলে হাঁপ লাগে। গাঁয়ের বাইরে নির্জ্জন মাঠে গিয়ে বসে ভাবি সীতার সম্বন্ধে কি করা যায়। কিন্তু হঠাৎ কেমন ক'রে অন্য চিন্তা এসে পড়ে। এই রৌদ্রালোকিত দুপুরে একা বসলেই তাঁর কথা আমার মনে পড়ে। মন থেকে দূর করতে পারি নে। প্যালেস্টাইনের ঊষর, পর্ব্বতময় মরুদেশের রৌদ্র—সারা গায়ে ঘাম ঝরচে তাঁর, রোদে মুখ রাঙা, নিজের ভারী ক্রুশটা নিজেই বয়ে চলেছেন বধ্যভূমিতে। পিছনের অন্ধ জনতা জানে না যে ঝড়ে গ্যালিলির সমুদ্রের নোনা জলে দুকূল ছাপিয়ে মাঝে মাঝে যে তরঙ্গ ওঠায়, তাও তুচ্ছ হয়ে যাবে সে বৃহত্তর তুফানের কাছে, আজকার দিনটি জগতে যে তুফান তুলবে। তারা জানে না যে মানুষের মনে ব্যথা না দেওয়ার চেয়ে বড় আচার নেই, প্রেমের চেয়ে বড় ধর্ম্ম নেই। তাঁর আবির্ভাব কে ব্যর্থ করবে?—ঐ বজ্র-বিদ্যুতের মত শক্তিমান তাঁর বাণী। বিষ্ণুর সুদর্শন যে শক্তির প্রতীক। নিত্যকালের দেবতা তাঁরা, দেশের অতীত, কালের অতীত, সকল দেশের, সকল অবতারের স্বগোত্র।

তারপর আমি যেন কোথায় চলে গিয়েচি। সেখানে নদী, মাঠ, বন সবই আছে, কিন্তু সবই যেন ঝাড়লণ্ঠনের কাঁচের পরকলার মধ্যে দিয়ে দেখচি। রাত কি দিন বুঝতে পারলাম না, মাথার ওপরকার আকাশে তারা নেই। অথচ সূর্য্যও দেখলাম না আকাশে। আমি যেন সেখানে বেশ সহজ অবস্থাতেই আছি। একটু পরেই মনে হ'ল সে জায়গাটাতে আমি অনেক বার গিয়েচি, নতুন নয়, ছেলেবেলা থেকে কতবার গিয়েচি। একটা বাড়ি আছে সেখানে, বাড়িতে যারা আছে তারা আমার সঙ্গে গল্প করে, কত কথা বলে—স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে যেন মনে হয় তারা আমার খুব পরিচিত। কতবার তাদের দেখেচি। সেখানে গেলেই আমার মনে পড়ে যায় সেখানকার পথ-ঘাট, ওইখানে মাঠের মধ্যে একটা পুরোনো বাড়ি আছে, ওরও পাশে সেই বনটা। সেখানে যেমনি যাই, মজা এই যে অমনি মনে হয় এ তো নতুন নয়, সেই যে একবার ছেলেবেলায় চা-বাগানে থাকতে এসেছিলাম! কিন্তু সে দেশটা যেন অন্য রকম, যখন সেখানে থাকি তখন স্বাভাবিক মনে হ'লেও, পরে মনে হয় সেটা এই পৃথিবীর মত নয়।

সেখানে আমি কতক্ষণ ছিলাম জানি না—উঠে দেখি গাছে ঠেস্ দিয়ে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু এত ঘুম ঘুমিয়েচি—উঠে চোখ মুছে চারিদিকে চেয়ে দেখি প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেচে। কেবল এইটুকু আমার মনে ছিল, স্বপ্নের দেশে কাকে যেন জিজ্ঞেস করেছিলুম—

বটগাছের নীচে একটা সুন্দর ঠাকুর আছেন, শুনেচি বিষ্ণুমূর্ত্তি, আমার বড় ভাল লাগে—জ্যাঠাইমারা পুজো করেন না কেন? ঘুম কি সত্যি, কিছুই বুঝতে পারলুম না। মনের সে আনন্দটা কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে ছিল।

জ্যাঠামশায়রা কি একটা মোকদ্দমার সাক্ষীসাবুদ দু-তিন দিন ধরে চণ্ডীমণ্ডপে তালিম দিয়ে শেখালেন। যে কেউ শুনলে বুঝতে পারতো যে এরা সে-সব জায়গায় যায় নি কস্মিন-কালেও—সে-সব ঘটনা দেখেও নি—এঁদের খামার-সংক্রান্ত কি একটা দখলের মামলা।

একদিন শুনলাম মামলায় এঁরা জিতেচেন—আবার সেই ব্যাপার দেখলুম বাড়িতে। গৃহদেবতার প্রতি ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে উঠলেন সবাই—মহাসমারোহে পূজা হ'ল, সপক্ষের যারা সাক্ষী ছিল, তাদের পরম যত্নে তোয়াজ ক'রে খাওয়ালেন। খাওয়ান তাতে ক্ষতি নেই—কিন্তু দেবতাকে এর মধ্যে জড়ান কেন?

এঁরা ভাবেন কি যে দেবতা তাঁদেরই বাঁধা, হাতধরা—ওঁদের মিথ্যাকে অবিচারকেও সমর্থন করবেন তিনি ভোগ নৈবিদ্যের লোভে?

জ্যাঠাইমা যখন ব্যস্ত হয়ে গরদের শাড়ি প'রে পূজার আয়োজনে ছুটোছুটি করছিলেন, তখন আমার ভারি রাগ হ'ল—আজকাল এসব মূঢ়তা আমার আদৌ সহ্য হয় না, ছেলেবেলার মত ভয়ও করি না আর জ্যাঠাইমাকে—ভাবলুম এ নিয়ে খুব তর্ক করি, দু-কথা শুনিয়ে দেবো, তাতে ওঁদের উপকারই হবে—দেবতাকে নিয়ে ছেলেখেলা বন্ধ হবে—কিন্তু সীতা ও মায়ের কথা ভেবে চুপ ক'রে রইলুম।

॥ ৮ ॥

মাস দুই হ'ল চাকুরি পেয়েছি কলকাতায়। এ চাকুরি পাওয়ার জন্যেও আমি শৈলদির কাছে কৃতজ্ঞ। শৈলদির স্বামীর এক বন্ধুর যোগাযোগে এটা ঘটেচে। যাদের বাড়ি চাকরি করি, এরা বেশ বড় লোক।

বাড়ির কর্ত্তা নীলাম্বর রায় হাওড়া জেলার কি একটা গ্রামের জমিদার এবং সেখানকার তাঁদেরই পূর্ব্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত এক মঠের বর্ত্তমান মালিক—এঁদের মঠের অধীনে একটা ধর্ম্মসম্প্রদায় গ'ড়ে উঠেচে গত ষাট-সত্তর বছরে এবং এঁরাই সেই সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগুরু। বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম এই তিন জেলাতে এই সম্প্রদায়ের লোক যত বেশী, অন্য জেলাতে তত নয়। ওঁদের কাগজপত্র ও দেশের নায়েবের সঙ্গে ওঁদের যে চিঠিপত্র লেখালেখি হয়েচে—তা থেকেই আমি এ-সব সংবাদ জানতে পারলাম অল্পদিনের মধ্যেই। এঁদের প্রধান আয় বৈশাখ মাসে মঠবাড়ির মহোৎসব থেকে—নানা অঞ্চল থেকে শিষ্যসেবকের দল জড় হয়ে সেই সময় বার্ষিক প্রণামী, পূজা, মানত শোধ দেয়, তা ছাড়া বিবাহ ও অন্নপ্রাশনের সময়ও মঠের গদিতে প্রত্যেক শিষ্যের কিছু প্রণামী পাঠিয়ে দেওয়া নিয়ম।

নীলাম্বরবাবুর তিন ছেলেই ঘোর শৌখিন ও উগ্র ধরনের শহুরে বাবু। বড় ছেলে অজয়-বাবু এঞ্জিনিয়ারীং পড়েছিলেন কিন্তু পাস করেন নি—মেজ ছেলে নবীনবাবু এম-এ পাস, ছোট ছেলে অমরনাথ এখনও ছাত্র—প্রেসিডেন্সি কলেজে থার্ড-ইয়ারে পড়ে। অজয়বাবুর বয়স পঞ্চাশের কম নয়, কিন্তু পোশাক-পরিচ্ছদে কুড়ি বছরের ছোকরাও হার মানে তাঁর শৌখিনতার কাছে—নবীনবাবুর বয়স চল্লিশ-বিয়াল্লিশ, লম্বা, ফর্সা, সুপুরুষ—পেছনের ঘাড় একদম ক্ষুর

দিয়ে সাদা বার-করা, চোখে চশমা—প্রায়ই পরনে সাহেবী পোশাক থাকে। বাঙালী পোশাক পরলে পরেন হাত-গিলে-করা মিহি আদ্দির পাঞ্জাবি ও কোঁচানো কাঁচি ধুতি, পায়ে কালো অ্যাল্‌বার্ট জুতো।

কর্ত্তা নীলাম্বর রায়কে আমি বেশী দেখিনি। তিনি তাঁর তাকিয়া বালিশ, গড়গড়া, পিকদানী নিয়ে দোতলাতে থাকেন। কালেভদ্রে তাঁর কাছে আমার যাওয়া দরকার হয়। বড় ছেলে অজয়বাবুই কাজকর্ম্ম দেখাশুনা করেন—তাঁর সঙ্গেই আমার পরিচয় বেশী। অজয়বাবু লোক মন্দ নন—কিন্তু নবীনবাবু ও অমরনাথের মুখে প্রথম দিনেই একটা উগ্র দাম্ভিকতার ছাপ লক্ষ্য করলুম। আমি এ ধরনের লোকের সংস্পর্শে জীবনে এ পর্য্যন্ত আসি নি—কি জানি আমার কোন্ ব্যবহারে এঁরা কি দোষ ধ'রে ফেলেন—সেই চিন্তা আমায় সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত ক'রে তুললে।

ওদের বাড়ি হরি ঘোষের স্ট্রীটে; বাড়িটার পূর্ব্ব দিকে একটা ছোট গলি—কিন্তু সেই দিকেই বাড়ির সদর। হরি ঘোষের স্ট্রীটের দিকটা রেলিং-বসানো লম্বা বারান্দা—বারান্দায় উঠবার সিঁড়ি নেই সেদিকে। রাস্তার ওপরের ছোট ঘরটাতেই আমার থাকবার জায়গা নির্দ্দিষ্ট হ'ল। এই ঘরে আমি যে একলা থাকি তা নয়, পাশাপাশি নীচু চার-পাঁচটা তক্তাপোশের ওপর ঢালা ফরাস পাতা, তার ওপরে রাত্রে যে কত লোক শোয় তার হিসেব রাখা শক্ত; এদের দেশের কাছারীর নায়েব কুঞ্জ বসু প্রায়ই আসে কলকাতায়, সে আমার পাশেই বিছানা পাতে, তার সঙ্গে একজন মুহুরী আসে, সে নায়েবের পাশে শোয়। বাড়ির দুজন চাকর শোয় ওদিকটাতে। ওস্তাদজী ব'লে একজন গানের মাস্টার বাড়ির ছেলেমেয়েদের গান ও হারমোনিয়ম বাজাতে শেখায়—সে আর তার একজন ভাইপো শোয় চাকরদের ও আমাদের মধ্যে। এতগুলো অপরিচিত লোকের সঙ্গে একসঙ্গে শোয়া কখনো অভ্যেস নেই—প্রথম দিনেই এদের গল্পগুজব, হাসি-কাশি, তামাকের ধোঁয়া আমাকে অতিষ্ঠ ক'রে তুললে। সীতার মুখ মনে ক'রে সব অসুবিধাকে সহ্য করবার জন্যে প্রস্তুত হই।

একদিন আমি সেরেস্তা-ঘরে বসে কাজ করচি—হঠাৎ দেখি মেজবাবু ঘরে ঢুকেচেন। আমি মেজবাবুকে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালাম। মেজবাবু চারদিকের দেওয়ালের দিকে চোখ তুলে চেয়ে বললেন—এ ঘরের এই ছবিগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্চে, তুমি নজর রাখো না?

মেজবাবুর সামনাসামনি হওয়া এই আমার প্রথম। আমাকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করতে আমি মনে আঘাত পেলাম এবং আমার ভয়ও হ'ল। তা ছাড়া ছবি নষ্ট হওয়ার কৈফিয়ত আমি কি দেবো বুঝতে না পেরে চুপ ক'রে আছি, এমন সময় মেজবাবু বাজখাঁই আওয়াজে ডাকলেন—দৈতারী—

দৈতারী সেরেস্তার কালির বোতল গুনে গুনে আলমারিতে তুলছিল পাশের ঘরে, সে ঘরের পাশে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে বললে—হুজুর—

—এই উল্লুক, তুমি দেখতে পাও না ঘরের ছবিগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে?

দৈতারী ঘরের দেওয়ালের দিকে বিপন্ন মুখে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

মেজবাবু হঠাৎ আমার ডেস্ক থেকে রুলটা তুলে নিয়ে তাকে হাতে পিঠে ঘা-কতক বসিয়ে দিয়ে বললেন—স্টুপিড পাজি, বসে বসে শুধু মাইনে খাবে? এক ডজন চাকর বাড়িতে মাইনে দিয়ে রাখা হয়েচে শুধু ফাঁকি দেবার জন্যে? পাড়ো ছবিগুলো এক-একখানা ক'রে—পাড়ো আমার সামনে—

দৈতারীর সে রুলের ঘা যেন আমার পিঠেই পড়ল। আমি ভয়ে ভয়ে দৈতারীকে ছবি পাড়তে সাহায্য করতে লাগলুম। আমি সামান্য মাইনের চাকুরি করি—মেজবাবু আমাকেও

ঠেস্ দিয়ে কথাটা বললেন। তারপর আধঘণ্টা তিনি ঘরে দাঁড়িয়ে রইলেন—আমি ও দৈতারী তাঁর সামনে সমস্ত ছবিগুলো একে একে পেড়ে পরিষ্কার করলাম। সাহস ক'রে যেন মাথা তুলে চাইতে পারলাম না, যেন আমি নিজেই ছবির তদারক না ক'রে প্রকাণ্ড অপরাধ ক'রে ফেলেচি।

সেইদিন প্রথম বুঝলাম আমার মত সামান্য মাইনের লোকের কি খাতির—আর কি মান এঁদের কাছে। সীতার বিয়ের একটা বন্দোবস্ত করতে পারি তবে আবার পড়বো। ছোট বৌঠাকুরুনের কথা এই সময় মনে হ'ল—শৈলদির কথাও মনে পড়ল। কত ধরনের মানুষই আছে সংসারে! অমরনাথবাবুর বৈঠকখানা আমাদের ঘরের সামনে। খুব শৌখীন জিনিস-পত্র সাজানো এবং প্রত্যেক দিনই কোন-না-কোন শৌখীন জিনিস কেনা লেগেই আছে। সে-ঘরে রোজ সন্ধ্যার পর বন্ধুবান্ধবেরা এসে গানের আড্ডা বসায়—কেউ ডুগি-তবলা, কেউ হারমোনিয়ম বাজায়—গান-বাজনায় অমরবাবুর খুব ঝোঁক। সে-দিন আড়াইশো টাকার একটা গানের যন্ত্র রাখবার কাঁচের আলমারি কেনা হ'ল। তিনি কলেজের ছাত্র বটে, কিন্তু আমি পড়াশুনা করতে একদিনও দেখিনি তাঁকে। একদিন বেলা দশটার সময় অমরনাথবাবু ঘরে ঢুকে বললেন—ওহে, পাঁচটা টাকা দাও তো, আছে তোমার কাছে?

আমি প্রথমটা অবাক্ হয়ে গেলাম। আমার কাছে টাকা চাইতে এসেচেন ছোটবাবু! ব্যস্তভাবে আমার বাক্সটা খুলে টাকা বার ক'রে সসম্ভ্রমে তাঁর হাতে দিলাম। দিনকতক কেটে গেল, আর একদিন তিনটে টাকা চাইলেন। মাইনের টাকা সব এখনও পাইনি—দশটা টাকা মোটে পেয়েছিলাম—তা থেকে দিয়ে দিলুম আট টাকা। দু-তিন মাসে ছোটবাবু আমার কাছে পঁচিশ টাকা নিলেন—বাড়ির ও আমার হাতখরচ বাদে যা-কিছু বাড়তি ছিল, সবই তাঁর হাতে তুলে দিলাম।

একদিন দাদা চিঠি লিখলে—তার বিশেষ দরকার। পনেরটা টাকা যেন আমি পাঠিয়ে দিই। আমার হাতে তখন মোটেই টাকা নেই। ভাবলুম, ছোটবাবুর টাকাটা তো দেওয়ার কথা এতদিনে—দিচ্চেন না কেন! বড়মানুষের ছেলে, সামান্য টাকা খুচরো কিছু কিছু ক'রে নেওয়া, সে ওর মনেই নেই বোধ হয়। লজ্জায় চাইতেও পারলাম না। অগত্যা বারোটা টাকা আগাম পাওয়ার জন্যে একটা দরখাস্ত করলুম। সে-দিন আপিসে আবার বসেচেন মেজবাবু। দরখাস্ত পড়ে আমার দিকে চেয়ে বললেন—কি হবে তোমার আগাম টাকা?

মেজবাবুকে আমার বড় ভয় হয়। বললুম—দাদা চেয়ে পাঠিয়েচেন, হাতে আমার কিছু নেই তাই।

মেজবাবু বললেন—তুমি কতদিন সেরেস্তায় কাজ করচ? চার মাস মোটে? না, এত কম দিনের লোককে অ্যাডভান্স দেওয়া স্টেটের নিয়ম নেই—তা ছাড়া তুমি তো এখনও পাকা বহাল হওনি—এখনও প্রোবেশনে আছ।

কই, চাকুরিতে ঢোকবার সময় সে-কথা তো কেউ বলেনি যে আমি প্রোবেশনে বাহাল হচ্চি বা কিছু। যাই হোক্ দরখাস্ত ফিরিয়ে নিয়ে এলাম; দাদাকে টাকা পাঠানো হ'লই না, এদিকে ছোটবাবুও টাকা দিলেন না, ভুলেই গিয়েচেন দেখচি সে-কথা। প্রথমে আসবার সময় ভেবেছিলাম এঁরা কোন দেবস্থানের সেবায়েত, সাধু-মোহান্ত মানুষ হবেন—ধর্ম্মের একটা দিক এঁদের কাছে জানা যাবে—কিন্তু এঁরা ঘোর বিলাসী ও বিষয়ী, এখন তা বুঝচি। মেজবাবু এই চার মাসের মধ্যে এটর্নির বাড়ি পাঠিয়েচেন আমায় যে কতদিন, কোথায় জমি নিয়ে ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের সঙ্গে প্রকাণ্ড মোকদ্দমা চলচে—এ বাদে কুঞ্জ নায়েব তো প্রায়ই দেশ

থেকে আপীলের কেস্ আনচেন। মেজবাবু মামলা-মোকদ্দমা নাকি খুব ভাল বোঝেন, কুঞ্জ নায়েব সেদিন বল্‌ছিল।

অপরে কি ক'রে ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, তারা কি মানে, কি বিশ্বাস করে, এসব দেখে বেড়াতে আমার বড় ভাল লাগে।

একদিন হাওড়া পুলের ওপারে হেঁটে অনেক দূর বেড়াতে গেলুম। এক জায়গায় একটা ছোট মন্দির, জায়গাটা পাড়াগাঁ-মত, অনেক মেয়েরা জড় হয়েচে, কি পূজো হচ্চে। আমি মন্দির দেখে সেখানে দাঁড়িয়ে গেলাম—দেবতার স্থানে পূজা-অর্চ্চনা হ'তে দেখলে আমার বড় কৌতূহল হয় দেখবার ও জানবার জন্যে। একটা বড় বটগাছের তলায় ছোট্ট মন্দিরটা, বটের ঝুরি ও শেকড়ের দৃঢ় বন্ধনে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা—মন্দিরের মধ্যে সিঁদুর-মাখানো গোল গোল পাথর, ছোট একটা পেতলের মূর্ত্তিও আছে। শুনলাম ষষ্ঠীদেবীর মূর্ত্তি। বাড়ি থেকে মেয়েরা নৈবিদ্যি সাজিয়ে এনেচে, পুরুত ঠাকুর পূজো ক'রে সকলকে ফুলবেলপাতা নির্ম্মাল্য দিলেন—ছেলেমেয়েদের মাথায় শান্তিজল ছিটিয়ে দিলেন। সবাই সাধ্যানুসারে কিছু কিছু দক্ষিণা দিলে পুরুত ঠাকুরকে, তারপর নিজের নিজের ছেলেমেয়েদের নিয়ে, নৈবিদ্যির খালি থালা হাতে সবাই বাড়ি চলে গেল। কাছেই একটা পুকুর, পুরুত ঠাকুর আমার হাতেও দুখানা বাতাসা ও ফুলবেলপাতা দিয়েছিলেন—বাতাসা দুখানা খেয়ে পুকুরে জল খেলাম—ফুলবেলপাতা পকেটে রেখে দিলাম। ছোট্ট গ্রামখানা—দূরে রেলের লাইন, ভাঙা পুকুরের ঘাটটা নির্জ্জন, চারিধারেই বড় বড় গাছে ঘেরা—শান্ত, স্তব্ধ অপরাহ্ণ—অনেক দিন পরে এই পূজোর ব্যাপারটা, বিশেষ ক'রে মেয়েদের মুখে একটা ভক্তির ভাব, পূজোর মধ্যে একটা অনাড়ম্বর সারল্য আমার ভাল লাগল।

হাওড়া-পুল পার হয়েচি, এক জায়গায় একজন ভিখারিণী আধ-অন্ধকারের মধ্যে চেঁচিয়ে কার সঙ্গে ঝগড়া করচে আর কাঁদচে। কাছে গিয়ে দেখলাম ভিখারিণী অন্ধ, বেশ ফর্সা রং, হিন্দুস্থানী—বৃদ্ধা না হ'লেও প্রৌঢ়া বটে। তার সামনে একখানা ময়লা ন্যাকড়া পাতা—সেটাতে একটা পয়সাও নেই—গোটা-দুই টিনের কালো তোবড়া মগ, একটা ময়লা পুঁটুলি, একটা ভাঁড়—এই নিয়ে তার কারবার। সে একটা সাত-আট বছরের মেয়ের সঙ্গে ঝগড়া করচে—হিন্দীতে বলচে—তুই অমন ক'রে মারবি কেন? তোকে আমি ভিক্ষে ক'রে খাইয়ে এত বড়টা করলাম আর তুই আমাকেই মার দিতে শুরু করলি—আমার কপাল পোড়া, নইলে নিজের পেটের সন্তান এমন বদ হবে কেন? স্থাখ দেখি কি দিয়ে মারলি, কপালটা কেটে গেছে—

মেয়েটা হি-হি ক'রে হাসচে এবং কৌতুকের সঙ্গে রাস্তা থেকে ধুলো বালি খোয়া কুড়িয়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে মাকে মারছে।

আমি মেয়েটাকে একটা কড়া ধমক দিয়ে বললাম—ফের মাকে যদি অমন করবি, তবে পুলিসে ধরিয়ে দেবো। পকেটে হাত দিয়ে দেখি, আনা সাতেক পয়সা আছে—সেগুলো সব তার ময়লা নেকড়াখানায় রেখে দিয়ে বললুম—তুমি কেঁদো না বাছা—আমি কাল এসে তোমায় আরও পয়সা দেবো। তোমার মেয়ে আর মারবে না। যদি মারে তো বলে দিও, কাল আমি দেখে নেবো—

এমন ছন্নছাড়া করুণ দুরবস্থার রূপ জীবনে কোনদিন দেখিনি। পরদিন হাওড়া-পুলে গিয়েছিলাম কিন্তু সেদিন বা আর কোনদিন সেই অন্ধ ভিখারিণীর দেখা পাইনি। তাকে কত খুঁজেছি, ভগবান জানেন। প্রতিদিন শোবার আগে তার কথা আমার মনে হয়।

মনে মনে বলি, আটঘরার বটতলায় তোমায় প্রথম দেখেছিলুম ঠাকুর, তোমার মুখে অত

করুণা মাখানো, মানুষকে এত কষ্ট দাও কেন? তা হবে না, তার ভাল করতেই হবে তোমায়, তোমার আশীর্ব্বাদের পুণ্যধারায় তার সকল দুঃখ ধুয়ে ফেলতে হবে তোমাকে।

এর মধ্যে একদিন কালীঘাটের মন্দিরে গেলুম।

সেদিন বেজায় ভিড়—কি একটা তিথি উপলক্ষে মেলা যাত্রী এসেচে। মেয়েরা পিষে যাচ্ছে ভিড়ের মধ্যে, অথচ কেউ এদের সুবিধে-অসুবিধে দেখবার নেই। আমার সামনেই একটি তরুণী বধূ হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল—আমি একজন প্রৌঢ়া বিধবাকে বললাম—গেল, গেল, ও মেয়েটির হাত ধরে তুলুন—। কাদামাখা কাপড়ে বধূটি দিশাহারা ভাবে উঠে দাঁড়াল, আমি তার সঙ্গের লোকদের খোঁজ নিয়ে ভিড়ের ভেতর থেকে অতিকষ্টে খুঁজে বার করলাম—ভিড়ের দ্বারা চালিত হয়ে তারা অনেক দূর গিয়ে পড়েছিল। এত করেও অনেকেরই দেবদর্শন ঘটল না, পাণ্ডারা সকলকে মন্দিরে ঢুকতে দিচ্ছে না শুনলুম, কেন তা জানিনে। মেয়েদের দুঃখ দেখে আমার নিজের ঠাকুর দেখার ইচ্ছে আর রইল না।

আষাঢ় মাসের শেষ দিন। বৈকালের দিকটা মেজবাবু মোটরে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, বেলা পাঁচটার সময় ফিরে এসে আমায় হিসেবের খাতা দেখাতে ডেকে পাঠালেন। রোজ তিনি দুপুরের পরে আপিসে বসে খাতা সই করেন, আজ তিনি ছিলেন না। মেজবাবুকে খাতা দেখানো বড় মুশকিলের ব্যাপার, আবার মেজবাবুকে আমার একটু ভয় হয়, তার ওপরে তিনি প্রত্যেক খরচের খুঁটিনাটি কৈফিয়ত চাইবেন। খাতা দেখতে দেখতে মুখ না তুলেই বললেন—তামাকওয়ালার ভাউচার কোথায়?

আমি বললাম—তামাকওয়ালা ভাউচার দেয়নি। খুচরো দোকান—ওরা ভাউচার রাখে না—

মেজবাবু ভ্রূ কুঁচকে বললেন—কেন, নবীন মুহুরী তো ভাউচার আনতো?

তাঁর মুখ দেখে মনে হ'ল তিনি আমায় অবিশ্বাস করচেন। আমি জানি নবীন মুহুরী যেখানে ভাউচার মেলে না—মনিবকে বুঝিয়ে দেবার জন্যে সেখানে ভাউচার নিজেই বানাতো। আমি সে মিথ্যার আশ্রয় নিই না। বললাম—আপনি জেনে দেখবেন ওরা ভাউচার কখনো দেয় না। আমি এসে পর্য্যন্ত তো দেখছি—

আমি যেখানে দাঁড়িয়ে কথা বলচি, তার সামনেই বড় জানালা—তার ঠিক ওপরে—মেজবাবুর অফিসের সামনাসামনি একটা শানবাঁধানো চাতাল। অন্দরমহলের একটা দোর দিয়ে চাতালটায় আসা যায় ব'লে জানলায় প্রায়ই পরদা টাঙানো থাকে। আজ সেটা গোটানো ছিল।

আমি একবার মুখ তুলতেই জানালা দিয়ে নজর পড়ল, অন্দরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কাদের ছোট্ট একটি খোকা, নিতান্ত ছোট, বছর দুই বয়স হবে। বোধ হ'ল যেন দরজা খোলা না পেয়ে চুপ ক'রে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। আমি ভাবচি, বেশ খোকাটি তো, কাদের খোকা? এ বাড়িতে যতদূর জানি অত ছোট ছেলে কারুর তো নেই? এ ওখানে এল কার সঙ্গে?

মেজবাবু বললেন—এদিকে মন দাও, ওদিকে কি দেখচ?

আমি বললাম—কাদের খোকা দাঁড়িয়ে রয়েচে ওখানে—আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললাম—ওই যে দাঁড়িয়ে রয়েচে চাতালের দরজায়, বাড়িতে ঢুকতে পাচ্চে না বোধ হয়।

মেজবাবু সেদিকে চেয়ে বললেন—কই? কোথায় কে?

ঠিক সেই সময় অন্দরের দরজা খুলে মেজবাবুর স্ত্রী (তাঁকে অনেকবার মোটরে উঠতে-

নামতে দেখেছি) বার হয়ে এলেন এবং খোকাকে কোলে তুলে নিলেন। আমি চোখ নামিয়ে নিলাম। মেজবাবু বললেন—কোথায় তোমার খোকা না কি ?

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম—বা রে, ওই তো উনি খোকাকে কোলে নিলেন !

চোখ তুলে চাতালের দিকে চেয়ে মেজবাবুর স্ত্রীকে আর দেখতে পেলাম না, অন্দরের দরজাও বন্ধ, নিয়ে বোধ হয় বাড়ির মধ্যে চলে গিয়েচেন। মেজবাবু বললেন—কে নিয়ে গেলেন ? উনি মানে কি ? কি বকচ পাগলের মত !···

মেজবাবু আমার দিকে কেমন এক ধরনে চেয়ে রয়েছেন দেখলাম। আমি তাঁর সে দৃষ্টির সামনে থতমত খেয়ে গেলাম—আমার মনে হ'ল মেজবাবু সন্দেহ করচেন আমার মাথা খারাপ আছে নাকি ? সঙ্গে সঙ্গে বিস্মিত হলুম একথা ভেবে যে এই ওঁর স্ত্রী দরজা খুলে এলেন, খোকাকে কোলে তুলে নিলেন, এই তো দিনমানে আর এই ত্রিশ হাতের মধ্যে চাতাল, এ উনি দেখতে পেলেন না কেন ? পরক্ষণেই চট ক'রে আমার সন্দেহ হ'ল আমার সেই পুরানো রোগের ব্যাপার এর মধ্যে কিছু আছে নাকি ? এত সাধারণ ও স্বাভাবিক ঘটনার মধ্যে যে অন্য কিছু আছে বা হতে পারে, এ এতক্ষণ আমার মনেই ওঠেনি। তা হ'লে কোন কথা কি বলতাম ? এক্ষুনি চাকুরি থেকে ছাড়িয়ে দিতে পারে। বলতেই পারে, এর মাথা খারাপ, একে দিয়ে চলবে না।

কিন্তু আমার বড় কৌতূহল হ'ল। সন্ধ্যার সময় মোহিনী ঝি আমার বারান্দার সামনে দিয়ে যাচ্চে, তাকে জিজ্ঞেস করলুম—শোন, আচ্ছা বাড়িতে দেড়-বছর দু'বছরের খোকা কার আছে বল তো ? ঝি বললে—এত ছোট খোকা তো কারুর নেই !

সেইদিন রাত বারোটায় খুব হৈ-চৈ। মেজবাবুর স্ত্রীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন, লোক ছুটলো ডাক্তার আনতে। মেজবাবুর স্ত্রী যে অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন বা সন্ধ্যার পর থেকে পাস-করা ধাত্রী এসে বসে আছে এ-সব কথা তখন আমি শুনলাম। কারণ সবাই বলাবলি করচে। শেষরাত্রে শুনলাম তাঁর একটি পুত্রসন্তান হয়েচে।

মনে মনে বিস্মিত হ'লেও কারও কাছে এ নিয়ে আর কোন কথা বললাম না। নিজেই দেখি, অথচ নিজেই বুঝিনে এ-সবের মানে কি। চুপচাপ থাকাই আমার পক্ষে ভাল।

এই ঘটনার পরে আমার ভয় হ'ল আমার সেই রোগ আবার আরম্ভ হবে। ও যখন আসে তখন উপরি-উপরি অনেকবার হয়—তার পর দিনকতকের জন্যে আবার একেবারেই বন্ধ থাকে। এইবার বেশী ক'রে শুরু হ'লে আমার চাকুরি ঘুচে যাবে—সীতার কোন কিনারাই করতে পারব না।

মেজবাবু হিসেবের খাতা লেখার কাজ দিলেন নবীন মুহুরীকে। তার ফলে আমার কাজ বেজায় বেড়ে গেল—ঘুরে ঘুরে এঁদের কাজে খিদিরপুর, বরানগর, কালীঘাট করতে হয়—আর দিনের মধ্যে সতের বার দোকানে বাজারে যেতে হয় চাকরকে সঙ্গে নিয়ে। খাওয়া-দাওয়ার নির্দ্দিষ্ট সময় নেই, দিনে রাতে শুধু ছুটোছুটি কাজ। এই দোকানের হিসেব নবীন মুহুরীকে বুঝিয়ে দেওয়া একটা ঝঞ্ঝাট—রোজ সে আমাকে অপমান করে ছুতোয়-নাতায়, আমার কথা বিশ্বাস করে না, চাকরদের জিজ্ঞেস করে আড়ালে সত্যি সত্যি কি দরে জিনিসটা এনেচি। সীতার মুখ মনে ক'রে সবই সহ্য ক'রে থাকি।

কার্ত্তিক মাসে ওদের দেশের সেই মহোৎসব হবে—আমাদের সকলকে দেশে পাঠানো হ'ল। আমি অনেক আগে থেকেই শুনে আসচি—অত্যন্ত কৌতূহল ছিল দেখবো ওদের

সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মানুষ্ঠান কি রকম।

গ্রামে এঁদের প্রকাণ্ড বাড়ি, বাগান, দীঘি, এঁরাই গ্রামের জমিদার। তবে বছরে এই একবার ছাড়া আর কখনও দেশে আসেন না। কুঞ্জ নায়েব বাকী দশ মাস এখানকার মালিক।

একটা খুব বড় ফাঁকা মাঠে মেলা বসেচে—এখানকার দোকান-পসারই বেশী। অনেকগুলো খাবারের দোকান, মাটির খেলনার দোকান, মাদুরের দোকান।

একটা বড় বটগাছের তলাটা বাঁধানো, সেটাই নাকি পীঠস্থান। লোকে এসে সেইখানে পুজো দেয়—আর বটগাছটার ডালে ও ঝুরিতে ইঁট বাঁধা ও লাল নীল নেকড়া বাঁধা। লোকে মানত করার সময় ওই সব গাছের গায়ে বেঁধে রেখে যায়, মানত শোধ দেওয়ার সময় এসে খুলে দিয়ে পূজো দেয়। বটতলায় সারি সারি লোক ধর্ণা দিয়ে শুয়ে আছে, মেয়েদের ও পুরুষদের ধর্ণা দেওয়ার জায়গা আলাদা আলাদা।

বড়বাবু ও মেজবাবুতে মোহন্তের গদিতে বসেন—কর্ত্তা নীলাম্বর রায় আসেননি, তাঁর শরীর সুস্থ নয়। এঁদের বেদীর ওপরে আশপাশে তাকিয়া, ফুল দিয়ে সাজানো, সামনে ঝক্‌ঝকে প্রকাণ্ড রূপোর থালাতে দিন-রাত প্রণামী পড়চে। দুটো থালা আছে—একটাতে মোহন্তের নজর, আর একটাতে মানত ও পুজোর প্রণামী।

নবীন মুহুরী, বেচারাম ও আমার কাজ হচ্চে এই সব টাকাকড়ির হিসেব রাখা। এর আবার নানা রকম রেট বাঁধা আছে, যেমন—পাঁচ সিকার মানত থাকল গদীর নজর এক টাকা, তিন টাকার মানতে দু টাকা ইত্যাদি। কেউ কম না দেয় সেটা মুহুরীদের দেখে নিতে হবে, কারণ মোহন্তরা টাকাকড়ির সম্বন্ধে কথা বলবেন না।

কাজের ফাঁকে আমি বেড়িয়ে দেখতে লাগলাম চারিধার। সবারই সঙ্গে মিশে এদের ধর্ম্মমতটা ভাল ক'রে বুঝবার আগ্রহে যাদের ভাল লাগে তাদেরই নানা কথা জিজ্ঞেস করি, আলাপ ক'রে তাদের জীবনটা বুঝবার চেষ্টা করি।

কি অদ্ভুত ধর্ম্মবিশ্বাস মানুষের তাই ভেবে অবাক হয়ে যাই। কতদূর থেকে যে লোক এসেচে পোঁটলাপুঁটলি বেঁধে, ছেলেমেয়ে সঙ্গে নিয়েও এসেচে অনেকে। এখানে থাকবার জায়গা নেই, বড় একটা মাঠে লোকে এখানে-ওখানে এই কার্ত্তিক মাসের হিমে চট, শতরঞ্জি, হোগলা, মাদুর যে যা সংগ্রহ করতে পেরেছে তাই দিয়ে থাকবার জায়গা তৈরি ক'রে তারই তলায় আছে —কেউ বা আছে শুধু গাছতলাতে। যে যেখানে পারে মাটি খুঁড়ে কি মাটির ঢেলা দিয়ে উনুন বানিয়ে রান্না করচে। একটা সজ্‌নে-গাছতলায় এক বুড়ী রান্না করছিল—সে একাই এসেচে হুগলী জেলার কোন্ গাঁ থেকে। তার এক নাতি হুগলীর এক উকিলের বাসার চাকর, তার ছুটি নেই, বুড়ী প্রতি বছর একা আসে।

আমায় বললে—বড্ড জাগ্রত ঠাকুর গো বটতলার গোসাঁই। মোর মাল্‌সি গাছে ক্যাঁটাল মোটে ধরতো নি, জালি পড়ে আর খসে খসে যায়। তাই বল্লু, বাবার থানে ক্যাঁটাল দিয়ে আসবো, হে ঠাকুর ক্যাঁটাল যেন হয়। বললে না পেত্যয় যাবে ছোটর-বড়র এ-বছর সতেরো গণ্ডা এঁচড় ধরেচে গোসাঁইয়ের কিরপায়।

আর এক জায়গায় খেজুরডালের কুঁড়েতে একটি বৌ ব'সে রাঁধচে। আর তার স্বামী কুঁড়ের বাইরে ব'সে খোল বাজিয়ে গান করচে। কাছে যেতেই বসতে বললে। তারা জাতে কৈবর্ত্ত, বাড়ি খুলনা জেলায়, পুরুষটির বয়স বছর চল্লিশ হবে। তাদের ছোট্ট একটি ছেলে মায়ের কাছে ব'সে আছে, তারই মাথার চুল দিতে এসেচে।

পুরুষটির নাম নিমচাঁদ মণ্ডল। স্বামী-স্ত্রী দু-জনেই বড় ভক্ত। নিমচাঁদ আমার হাতে

একখানা বই দিয়ে বললে—পড়ে শোনাও তো বাবু, দু-আনা দিয়ে মেলা থেকে কাল কেনলাম একখানা। বইখানার নাম 'বটতলার কীর্ত্তন'। স্থানীয় ঠাকুরের মাহাত্ম্যসূচক তাতে অনেকগুলো ছড়া। বটতলার গোসাঁই ব্রহ্মার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে এখানে এসে আস্তানা বেঁধেচেন, কলিরাজ ভয়ে তাঁর সঙ্গে এই সন্ধি করলে যে বটতলার হাওয়া যত দূর যাবে ততদূর পর্য্যন্ত কলির অধিকার থাকবে না। বটতলার গোসাঁই পাপীর মুক্তিদাতা, সর্ব্ব জীবের আশ্রয়, সাক্ষাৎ শ্রীহরির একাদশ অবতার।

কলিতে নতুন রূপ শুন মন দিয়া
বটতলে স্থিতি হৈল ভক্তদল নিয়া
খেদে কহে কলিরাজ, এ বড় বিষম কাজ
মোর দশা কি হবে গোসাঁই ?
ঠাকুর কহিলা হেসে, মনে না করিহ ক্লেশে
থান ত্যজি কোথাও না যাই।
শ্রীদাম সুবল সনে হেথায় আসিব
বটমূলে বৃন্দাবন সৃষ্টি করি নিব।

নিমচাঁদ শুনতে শুনতে ভক্তিগদ্গদ্কণ্ঠে বললে—আহা! আহা! বাবার কত লীলাখেলা!

তার স্ত্রীও কুঁড়ের দোরগোড়ায় এসে বসে শুনচে। মানে বুঝলাম এরা নিজেরা পড়তে পারে না, বইপড়া শোনার আনন্দ এদের কাছে বড্ড নতুন, তা আবার যাঁর ওরা ভক্ত, সেই বটতলার গোসাঁই সম্বন্ধে বই।

নিমচাঁদ বললে—আচ্ছা, বটতলার হাওয়া কত দূর যায় দা-ঠাকুর ?

—কেন বল তো ?

—এই যে বলচে কলির অধিকার নেই ওর মধ্যি, তা কত দূর তাই শুধুচ্চি।

—কত দূর আর, তা আধ ক্রোশ, বড়জোর—

নিমচাঁদ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কি ভেবে বললে—কি করবো দা-ঠাকুর, দেশে লাঙল-গরু ক'রে ফেলেচি, কুড়ো-দুই জমিতে এবার বাগুন রুইয়ে রেখে এসেচি—নয়ত এ বাবার থান ত বিন্দাবন, আপনি পড়লেন—এ স্বগ্‌গো ছেড়ে বিলির মোষের মত বিলি ফিরে যাই দা-ঠাকুর ? কি বলিস্ রে তুই, সরে আয় না এদিকে, দা-ঠাকুরকে লজ্জা কি, উনি তো ছেলেমানুষ।

নিমচাঁদের স্ত্রী গলার সুরকে খুব সংযত ও মিষ্টি ক'রে, অপরিচিত পুরুষ মানুষের সামনে কথা বলতে গেলে মেয়েরা যেমন সুরে কথা বলে তেমনি ভাবে বললে—হ্যাঁ ঠিকই তো। বাবার চরণের তলা ছেড়ে কোথাও কি যেতে ইচ্ছে ক'রে ?

নিমচাঁদ বললে—দু-মণ কোষ্টা ছিল ঘরে, তা বলি বিক্রী ক'রে চল বাবার থানে বাবার ছিচরণ দর্শন ক'রে আসি আর অমনি গঙ্গাছেনটাও সারবো। টাকা বাবা যোগাবেন, সেজন্য ভাবিনে। ওরে শোন্, কাল তুই তো ধন্না দিবি সকালে, আজ রাতে ভাতে জল দিয়ে রেখে দিস—

জিজ্ঞেস ক'রে জানলাম ছেলের অসুখের জন্যে ধর্ণা দেবার ইচ্ছে আছে ওদের।

নিমচাঁদের বৌ বললে—বুঝলেন দাদাঠাকুর, খোকার মামা ওর মুখ দেখে তিনটে টাকা দিলে খোকার হাতে। তখন পয়সার বড় কষ্ট যাচ্চে, কোষ্টা তখন জলে, কাচলি তো পয়সা ঘরে আসবে ? তো বলি, না, এ টাকা খরচ করা হবে না। এ রইল তোলা বাবার থানের

জন্যি। মোহন্ত বাবার গদীতে দিয়ে আসব।

সেই দিন বিকেলে নিমচাঁদ ও তার বৌ পুজো দিতে এল গদীতে। নবীন মুহুরী তাদের কাছে রেট-মত প্রণামী ও পুজোর খরচ আদায় করলে অবিশ্যি—তা ছাড়া নিমচাঁদের বৌ নিজের হাতে সেই তিনটে টাকা বড়বাবুর সামনের রূপোর থালায় রেখে দিয়ে বড়বাবুর পায়ের ধুলো নিয়ে কোলের খোকার মাথায় মুখে দিয়ে দিলে।

তার পর সে একবার চোখ তুলে মোহন্তদের দিকে চাইলে এবং এদের ঐশ্বর্য্যের ঘটাতেই সম্ভবত অবাক হয়ে গেল—বুদ্ধিহীন চোখে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের সঙ্গে টাকা-পয়সাতে পরিপূর্ণ ঝকঝকে রূপোর থালাটার দিকে বার-কতক চাইলে, রঙীন শালু ও গাঁদাফুলের মালায় মোড়া থামগুলোর দিকে চাইলে—জীবনে এই প্রথম সে গোসাঁইয়ের থানে এসেচে, সব দেখেশুনে লোকের ভিড়ে, মোহন্ত মহারাজের আড়ম্বরে, অনবরত বর্ষণরত প্রণামীর ঝমঝমানি আওয়াজে সে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেল। কতক্ষণ হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল, বাইরে থেকে ক্রমাগত লোক ঢুকচে, তাকে ক্রমশঃ ঠেলে একধারে সরিয়ে দিচ্চে, তবুও সে দাঁড়িয়েই আছে।

ওকে কে একজন ঠেলা দিয়ে এগিয়ে আসতে গেল, আমি ওর দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারিনি। ওর মুখচোখের মুগ্ধ ভক্তিস্তব্ধ দৃষ্টি আমায়ও মুগ্ধ করেচে—এ এক নতুন অভিজ্ঞতা আমার জীবনের, এই বাজে শালুর বাহার আর লোকের হৈ চৈ আর মেজবাবু, বড়বাবুর চশমা-মণ্ডিত দাম্ভিক মুখ দেখে এত ভাব ও ভক্তি আসে!—যে ঠেলা দিয়ে এদিকে আসছিল, আমি তাকে ধমক দিলুম। তার পর ওর চমক ভাঙতে ফিরে বাইরে বেরিয়ে গেল।

ওরা চলে গেলে একটি বৃদ্ধা এল, তার বয়স অনেক হয়েচে, বয়সে গলার স্বর কেঁপে গিয়েচে, হাত কাঁপচে, সে তার আঁচল থেকে একটি আধুলি খুলে থালায় দিতে গেল। নবীন মুহুরী বললে—রও গো, রাখ—আধুলি কিসের?

বুড়ী বললে—এই-ই ঠা-কু-রে-র মা-ন-ত শো-ধে-র পে-র-ণা-মী—

নবীন মুহুরী বললে—পাঁচ সিকের কমে ভোগের পুজো নেই—পাঁচ সিকিতে এক টাকা গদীর নজর—

বুড়ী শুনতে পায় না, বললে—কত?

নবীন আঙুল দেখিয়ে চেঁচিয়ে বললে—এক টাকা—

বুড়ী বললে—আর নে-ই, মা-দু-র কি-নে-লা-ম ছ-আ-না-র, আর—

নবীন মুহুরী আধুলি ফেরত দিয়ে বললে—নিয়ে যাও, হবে না। আর আট আনা নিয়ে এস—

বড়বাবু একটা কথাও বললেন না। বুড়ী কাঁপতে কাঁপতে ফিরে গেল এবং ঘণ্টাখানেক পর সিকিতে, দু আনিতে, পয়সাতে একটা টাকা নিয়ে এসে প্রণামীর থালায় রাখলে।

ওরা চলে গেলে আমার মনে হ'ল এই সরল, পরম বিশ্বাসী পল্লীবধূ, এই বৃদ্ধা ওদের কষ্টার্জ্জিত অর্থ কাকে দিয়ে গেল—মেজবাবুকে, বড়বাবুকে? এই এত লোক এখানে এসেছে, এরা সবাই চাষী গরীব গৃহস্থ, কি বিশ্বাসে এখানে এসেছে জানি নে—কিন্তু অম্লানবদনে খুশীর সঙ্গে এদের টাকা দিয়ে যাচ্চে কেন? এই টাকায় কলকাতায় ওঁদের স্ত্রীরা গহনা পরবেন, মোটরে চড়বেন, থিয়েটার দেখবেন, ওঁরা মামলা করবেন, বড়মানুষি, সাহেবিয়ানা করবেন—ছোটবাবু বন্ধুবান্ধব নিয়ে গানবাজনার মজলিসে চপ-কাটলেট ওড়াবেন, সেই জন্যে?

পরদিন সকালে দেখলাম নিমচাঁদের স্ত্রী পুকুরে স্নান ক'রে সারাপথ সাষ্টাঙ্গ নমস্কার করতে করতে ধুলোকাদা-মাখা গায়ে বটতলায় ধর্ণা দিতে চলেচে—আর নিমচাঁদ ছেলে কোলে নিয়ে

ছলছল চোখে তার পাশে পাশে চলেচে।

সেই দিন রাত্রে শুনলাম মেলায় কলেরা দেখা দিয়েচে। পরদিন দুপুরবেলা দেখি বটতলার সামনের মাঠটা প্রায় ফাঁকা হয়ে গিয়েচে, অনেকেই পালিয়েচে। নিমচাঁদের কুঁড়েঘরের কাছে এসে দেখি নিমচাঁদের স্ত্রী বসে—আমায় দেখে কেঁদে উঠল। নিমচাঁদের কলেরা হয়েচে কাল রাত্রে—মেলার যারা তদারক করে, তারা ওকে কোথায় নাকি নিয়ে যেতে চেয়েচে, মাঠের ওদিকে কোথায়। আমি ঘরে ঢুকে দেখি নিমচাঁদ ছটফট করচে, খুব ঘামচে।

নিমচাঁদের স্ত্রী কেঁদে বললে—কি করি দাদাঠাকুর, হাতে শুধু যাবার ভাড়াটা আছে—কি করি কোথা থেকে—

মেজবাবুকে কথাটা বললাম গিয়ে—তিনি বললেন—লোক পাঠিয়ে দিচ্চি, ওকে সিগ্রিগেশন ক্যাম্পে নিয়ে যাও—মেলার ডাক্তার আছে সে দেখবে—

নিমচাঁদের বৌ-এর কি কান্না ওকে নিয়ে যাবার সময়। আমরা বোঝালুম অনেক। ডাক্তার ইন্‌জেক্‌শন দিলে। মাঠের মধ্যে মাদুর দিয়ে সিগ্রিগেশন্ ক্যাম্প করা হয়েছে—অতি নোংরা বন্দোবস্ত। সেখানে সেবাশুশ্রূষার কোন ব্যবস্থাই নেই। ভাবলুম চাকুরি যায় যাবে, ওকে বাঁচিয়ে তুলব, অন্ততঃ বিনা তদারকে ওকে মরতে দেবো না। সারারাত জেগে রোগীকে দেখা-শুনা করলুম একা। সিগ্রিগেশন্ ক্যাম্পে আরও চারটি রোগী এল—তিনটে সন্ধ্যার মধ্যেই মরে গেল। মেলার ডাক্তার অবিশ্যি নিয়মমত দেখলে। এদের পয়সা নিয়ে যারা বড়-মানুষ, তারা চোখে এসে দেখেও গেল না কাউকে। রাত্রিটা কোন রকমে কাটিয়ে বেলা উঠলে নিমচাঁদও মারা গেল। সে এক অতি করুণ ব্যাপার! ওদের দেশের লোক খুঁজে বার ক'রে নিমচাঁদের সৎকারের ব্যবস্থা করা গেল। নিমচাঁদের স্ত্রীর দিকে আমি আর চাইতে পারি নে—বটতলায় ধর্ণা দেওয়ার দিন থেকে সেই যে সে উপবাস ক'রে আছে, গোলমালে আর তার খাওয়াই হয়নি। রুক্ষ চুল একমাথা, সেই ধূলিধূসরিত কাপড়—খবর পেয়ে সে ধর্ণা ফেলে বটতলা থেকে উঠে এসেছে—চোখ কেঁদে কেঁদে লাল হয়েছে, যেন পাগলীর মত দৃষ্টি চোখে। এখন আর সে কাঁদচে না, শুধু কাঠের মত বসে আছে, কথাও বলে না, কোনো দিকে চায় না।

মেজবাবুকে বলাতে তিনি ওকে দেশে পাঠিয়ে দেওয়ার খরচ দু-টাকা মঞ্জুর করলেন। কিন্তু সে আমি যথেষ্ট বললাম ও অনুরোধ করলাম ব'লে। আরও কত যাত্রী এ-রকম মরে গেল বা তাদের কি ব্যবস্থা হ'ল এ-সব দেখবার দায়িত্ব এঁদেরই তো। ওঁরাই রইলেন নির্ব্বিকার ভাবে ব'সে। আমার কাছে কিছু ছিল, যাবার সময় নিমচাঁদের স্ত্রীর হাতে দিলুম। চোখের জল রাখতে পারি নে, যখন সে চলে গেল।

দিন-দুই পরে রাত্রে বসে আমি ও নবীন মুহুরী হিসেব মেলাচ্চি মেলার দেনা-পাওনার। বেশ জ্যোৎস্না রাত, কার্ত্তিকের সংক্রান্তিতে পরশু মেলা শেষ হয়ে গিয়েছে, বেশ শীত আজ রাত্রে।

এমন সময় হঠাৎ আমার কি হ'ল বলতে পারিনে—দেখতে দেখতে নবীন মুহুরী, মেলার আটচালা ঘর, সব যেন মিলিয়ে গেল—আমি যেন এক বিবাহ-সভায় উপস্থিত হয়েচি—অবাক হয়ে চেয়ে দেখি সীতার বিবাহ-সভা। জ্যাঠামশায় কন্যাসম্প্রদান করতে বসেছেন, খুব বেশী লোকজনের নিমন্ত্রণ হয়নি, বরপক্ষেও বরযাত্রী বেশী নেই। দাদাকেও দেখলুম—দাদা ব'সে ময়দা ঠাসচে।··· আরও সব কি কি···ঘষা কাঁচের মধ্যে দিয়ে যেন সবটা দেখচি—খানিকটা স্পষ্ট, খানিকটা অস্পষ্ট।

চমক ভাঙলে দেখি নবীন মুহুরী আমার মাথায় জল দিচ্ছে। বললে—কি হয়েচে তোমার, মাঝে মাঝে কিছু হয় নাকি?

আমি চোখ মুছে বললুম—না। ও কিছু না—

আমার তখন কথা বলতে ভাল লাগচে না। সীতার বিবাহ নিশ্চয়ই হচ্ছে, আজ এখুনি হচ্ছে। আমি ওকে বড় ভালবাসি—আমার চোখকে ফাঁকি দিয়ে জ্যাঠামশায় ওর বিবাহ দিতে পারবেন না। আমি সব দেখেচি।

নবীন মুহুরীকে বললাম—তুমি আমাকে ছুটি দাও আজ, শরীরটা ভাল নেই, একটু শোব।

পরদিন বড়বাবুর চাকর কলকাতা থেকে এল। মায়ের একখানা চিঠি কলকাতার ঠিকানায় এসে পড়েছিল, মায়ের জবানি জ্যাঠামশায়ের লেখা আসলে। ২রা অগ্রহায়ণ সীতার বিয়ে, সেই জ্যাঠামশায়ের ঠিক করা পাত্রের সঙ্গেই। তিনি কথা দিয়েচেন, কথা খোয়াতে পারেন না। বিশেষ অত বড় মেয়ে ঘরে রেখে পাঁচজনের কথা সহ করতে প্রস্তুত নন। আমরা কোন্ কালে কি করব তার আশায় তিনি কতকাল বসে থাকেন—ইত্যাদি।

বেচারী সীতা! ওর সাবান মাখা, চুলবাঁধা, মিথ্যে শৌখীনতার অক্ষম চেষ্টা মনে পড়ল। কত ক'রে ওর মুখের দিকে চেয়ে এতকাল কিছু গ্রাহ্য করিনি। বেশ দেখতে পেলাম ওর ঘন কালো চুলের সিঁতিপাটি ব্যর্থ হয়ে গেল—ওর শুভ্র, নিষ্পাপ জীবন নিয়ে সবাই ছিনিমিনি খেললে।

॥ ৯ ॥

এখান থেকে কলকাতায় যাবার সময় হয়ে এল। বিকেলে আমি বটতলার পুকুরের ঘাটে বসে মাছ ধরা দেখচি, নবীন মুহুরী এসে বললে—তোমায় ডাকচেন মেজবাবু।

ওর মুখ দেখে আমার মনে হ'ল গুরুতর একটা কিছু ঘটেছে কিংবা ও-ই আমার নামে কি লাগিয়েচে। নবীন মুহুরী এ-রকম বার-কয়েক আমার নামে লাগিয়েচে এর আগেও। কারণ তার চুরির বেজায় অসুবিধে ঘটচে আমি থাকার দরুণ।

মেজবাবু চেয়ারে বসে, কুঞ্জ নায়েবও সেখানে দাঁড়িয়ে।

মেজবাবু আমাকে মানুষ বলেই কোনো দিন ভাবেননি। এ পর্য্যন্ত আমি পারতপক্ষে তাঁকে এড়িয়েই চলে এসেচি। লোকটার মুখের উগ্র দাম্ভিকতা আমাকে ওঁর সামনে যেতে উৎসাহিত করে না। আমায় দেখে বললেন—শোন এদিকে। কলকাতায় গিয়ে তুমি অন্য জায়গায় চাকুরির চেষ্টা করবে। তোমাকে এক মাসের নোটিশ দিলাম।

—কেন, কি হয়েচে?

—তোমার মাথা ভাল না, এ আমিও জানি, নবীনও দেখেচে বলচে। হিসেব-পত্রে প্রায়ই গোলমাল হয়। এ-রকম লোক দিয়ে আমার কাজ চলবে না। স্টেটের কাজ তো ছেলেখেলা নয়!

নবীন এবার আমায় শুনিয়েই বললে—এই তো সেদিন আমার সামনেই হিসেব মেলাতে মেলাতে মৃগীরোগের মত হয়ে গেল—আমি তো ভয়েই অস্থির—

মেজবাবুকে বিদ্বান ব'লে আমি সম্ভ্রমের চোখেও দেখতাম—বললাম—দেখুন, তা নয়। আপনি তো সব বোঝেন, আপনাকে বলচি। মাঝে মাঝে আমার কেমন একটা অবস্থা হয় শরীরের ও মনের, সেটা ব'লে বোঝাতে পারি নে—কিন্তু তখন এমন সব জিনিস দেখি, সহজ অবস্থায় তা দেখা যায় না। ছেলেবেলায় আরও অনেক দেখতুম, এখন কমে গিয়েচে। তখন বুঝতাম না, মনে ভয় হ'ত, ভাবতাম এ-সব মিথ্যে, আমার বুঝি কি রোগ হয়েচে। কিন্তু এখন

বুঝেচি ওর মধ্যে সত্যি আছে অনেক।

মেজবাবু কৌতুক ও বিদ্রূপ মিশ্রিত হাসি-মুখে আমার কথা শুনছিলেন—কথা শেষ হ'লে তিনি কুঞ্জ নায়েবের দিকে চেয়ে হাসলেন। নবীন মুহুরীর দিকে চাইলেন না, কারণ সে অনেক কম দরের মানুষ। স্টেটের নায়েবের সঙ্গে তবুও দৃষ্টি-বিনিময় করা চলে। আমার দিকে চেয়ে বললেন—কতদূর পড়াশুনা করেচ তুমি?

—আই-এ পাস করেছিলাম শ্রীরামপুর কলেজ থেকে—

—তাহ'লে তোমায় বোঝানো আমার মুশকিল হবে। মোটের ওপর ও-সব কিছু না। নিউরোটিক যারা—নিউরোটিক বোঝ? যাদের স্নায়ু দুর্ব্বল তাদের ওই রকম হয়। রোগই বইকি, ও এক রকম রোগ—

আমি বললাম—মিথ্যে নয় যে তা আমি জানি। আমি নিজের জীবনে অনেকবার দেখেচি—ও-সব সত্যি হয়েচে। তবে কেন হয় এইটেই জানি নে, সেই জন্যেই আপনাকে জিজ্ঞেস করচি। আমি সেণ্ট ফ্রান্সিস্ অফ্ আসিসির লাইফ-এ পড়েচি তিনিও এ-রকম দেখতেন—

মেজবাবু ব্যঙ্গের সুরে বললেন—তুমি তাহ'লে—তুমি সেণ্ট হয়ে গিয়েচ দেখচি? পাগল কি আর গাছে ফলে?

নবীন ও কুঞ্জ দুজনেই মেজবাবুর প্রতি সম্ভ্রম বজায় রেখে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হাসতে লাগল।

আমি নানাদিক থেকে খোঁচা খেয়ে মরীয়া হয়ে উঠলাম। বললাম—আর শুধু ওই দেখি যে তা নয়, অনেক সময় মরে গিয়েচে এমন মানুষের আত্মার সঙ্গে কথা বলেচি, তাদের দেখতে পেয়েচি।

নবীন মুহুরীর বুদ্ধিহীন মুখে একটা অদ্ভুত ধরনের অবিশ্বাস ও ব্যঙ্গের ছাপ ফুটে উঠল, কিন্তু নিজের বুদ্ধির ওপর তার বোধ হয় বিশেষ আস্থা না থাকাতে সে মেজবাবুর মুখের দিকে চাইলে। মেজবাবু এমন ভাব দেখালেন যে, এ বদ্ধ উন্মাদের সঙ্গে আর কথা ব'লে লাভ কি আছে! তিনি কুঞ্জ নায়েবের দিকে এভাবে চাইলেন যে, একে আর এখানে কেন? পাগলামি চড়ে বসলেই একটা কি ক'রে ফেলবে এক্ষুনি!

আমি আরও মরীয়া হয়ে বললাম—আপনি আমার কথায় বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন তাতে যে-জিনিস সত্যি তা মিথ্যে হয়ে যাবে না। আমার মনে হয়, আপনি আমার কথা বুঝতেও পারেননি। যার নিজের অভিজ্ঞতা না হয়েচে, সে এ-সব বুঝতে পারবে না, এ-কথা এতদিনে আমি বুঝেচি। খুব বেশী লেখাপড়া শিখলেই বা খুব বুদ্ধি থাকলেই যে বোঝা যায় তা নয়। আচ্ছা, একটা কথা আপনাকে বলি, আমি যে-ঘরটাতে থাকি, ওর ওপাশে যে ছোট্ট বাড়িটা আছে, ভাঙা রোয়াক যার সামনে—ওখানে আমি একজন বড়োমানুষের অস্তিত্ব অনুভব করতে পেরেচি—কি করে পেরেচি, সে আমি নিজেই জানি নে—খুব তামাক খেতেন, বয়স অনেক হয়েছিল, খুব রাগী লোক ছিলেন, তিনি মারা গিয়েচেন কি বেঁচে আছেন তা আমি জানি নে। ওই জায়গাটায় গেলেই এই ধরনের লোকের কথা আমার মনে হয়। বলুন তো ওখানে কেউ ছিলেন এ-রকম?

কুঞ্জ নায়েবের সঙ্গে মেজবাবুর অর্থসূচক দৃষ্টি-বিনিময় হ'ল। মেজবাবু শ্লেষের সঙ্গে বললেন—তোমাকে যতটা সিম্পল্ ভেবেছিলাম তুমি তা নও দেখচি। তোমার মধ্যে ভণ্ডামিও বেশ আছে—তুমি বলতে চাও তুমি এত দিন এখানে এসেচ, তুমি কারও কাছে শোননি ওখানে কে থাকতো?

—আপনি বিশ্বাস করুন, আমি তা শুনিনি। কে আমায় বলেচে আপনি খোঁজ নিন্ ?

—ওখানে আমাদের আগেকার নায়েব ছিল, ওটা তার কোয়ার্টার ছিল, সে বছর-চারেক আগে মারা গিয়েছে, শোননি এ-কথা ?

—না আমি শুনিনি। আরও কথা বলি শুনুন, আপনার ছেলে হওয়ার আগের দিন কলকাতায় আপিসে আপনাকে কি বলেছিলুম মনে আছে ? বলেছিলুম একটি খোকা দাঁড়িয়ে আছে—দরজা খুলে মেজবৌরাণী এসে তাকে নিয়ে গেলেন—এ-কথা বলেছিলুম কিনা ? মনে ক'রে দেখুন।

—হ্যাঁ, আমার খুব মনে আছে। সেও তুমি জানতে না যে আমার স্ত্রী আসন্ন-প্রসবা ছিল ? যদি আমি বলি তুমি একটা বেশ চাল চেলেছিলে—যে কোনো একটি সন্তান তো হ'তই—তুমি অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়েছিলে, দৈবাৎ লেগে গিয়েছিল। শার্লাটান্‌রা ও-রকম বুজরুকি করে—আমি কি বিশ্বাস করি ওসব ভেবেচ ?

—বুজরুকি কিসের বলুন ? আমি কি তার জন্যে আপনার কাছে কিছু চেয়েছিলুম ? বা আর কোনোদিন সে-কথার কোনো উল্লেখ করেছিলুম ? আমি জানি আমার এ একটা ক্ষমতা—ছেলেবেলায় দার্জ্জিলিঙের চা-বাগানে আমরা ছিলাম, তখন থেকে আমার এ ক্ষমতা আছে। কিন্তু এ দেখিয়ে আমি কখনও টাকা রোজগারের চেষ্টা তো করিনি কারোর কাছে ? বরং বলিই নে—

মেজবাবু অসহিষ্ণুভাবে বললেন—অল্ ফিড্‌ল্‌স্টিক্—মনের ব্যাপার তুমি কিছু জানো না। তোমাকে বোঝাবার উপায় আমার নেই। ইট্ প্লেজ্ কুইয়ার ট্রিক্‌স উইথ্ আস্—যদি ধরে নিই তুমি মিথ্যাবাদী নও—ইউ মে বি এ সেল্‌ফ ডিলিউডেড্ ফুল্ এবং আমার মনে হয় তুমি তাই-ই। আর কিছু নয়। যাও এখন—

আমি চলে এলাম। নবীন মুহুরী আমার পিছু পিছু এসে বললে—তোমার সাহস আছে বলতে হবে—মেজবাবুর সঙ্গে অমন ক'রে তর্ক আজ পর্য্যন্ত কেউ করেনি। না! যা হোক, তোমার সাহস আছে। আমার তো ভয় হচ্চিল এই বুঝি মেজবাবু রেগে ওঠেন—

আমি জানি নবীনই আমার নামে লাগিয়েছিল, কিন্তু এ নিয়ে ওর সঙ্গে কথা কাটাকাটি করবার প্রবৃত্তি আমার হ'ল না। কেবল একটা কথা ওকে বললাম—দেখ নবীন-দা, চাকুরির ভয় আমি আর করি নে। যে-জন্যে চাকুরি করছিলাম, সে কাজ মিটে গিয়েচে। এখন আমার চাকুরি করলেও হয় না-করলেও হয়। ভেবো না, আমি নিজেই শীগ্‌গির চলে যাবো ভাই।

ক-দিন ধরে একটা কথা ভাবছিলাম। এই যে এতগুলো পাড়াগেঁয়ে গরীব চাষীলোক এখানে পুজো দিতে এসেছিল—এরা সকলেই মূর্খ, ভগবানকে এরা সে ভাবে জানে না, এরা চেনে বটতলার গোসাঁইকে। কে বটতলার গোসাঁই ? হয়ত একজন ভক্ত বৈষ্ণব, গ্রাম্য লোক, বছর পঞ্চাশ আগে থাকত ওই বটতলায়। সেই থেকে লৌকিক প্রবাদ এবং বোধ হয় মেজবাবুদের অর্থগৃধ্নুতা দুটোতে মিলে বটতলাকে করেচে পরম তীর্থস্থান। কোথায় ভগবান, কোথায় প্রথিতযশা ঐতিহাসিক অবতারের দল—এই বিপুল জনসঙ্ঘ তাঁদের সন্ধানই রাখে না হয়ত। এদের এ কি ধর্ম্ম ? ধর্ম্মের নামে ছেলেখেলা।

কিন্তু নিমচাঁদকে দেখেছি। তার সরল ভক্তি, তাদের ত্যাগ। তার স্ত্রীর চোখে যে অপূর্ব্ব ভাবদৃষ্টি, যা সকল ধর্ম্মবিশ্বাসের উৎসমুখ—এ-সব কি মূল্যহীন, ভিত্তিহীন, জলজ শেওলার মত মিথ্যার মহাসমুদ্রে ভাসমান ? এ রকম কত নিমচাঁদ এসেছিল মেলায়। জ্যাঠাইমাদের আচারের শেকলে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা ঐশ্বর্য্যের ঘটা দেখানো দেবার্চ্চনার চেয়ে এ আমার ভাল

লেগেচে। ঘুমুড়ির সেই ষষ্ঠীমন্দিরের মত।

কোন্ দেবতার কাছে নিমচাঁদের তিনটে টাকার ভোগ অর্ঘ্য গিয়ে পৌছুলো, জীবনের শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে পরম ত্যাগে সে যা নিবেদন করলে?

আর একটা কথা বুঝেচি। কাউকে কোন কথা ব'লে বুঝিয়ে বিশ্বাস করানো যায় না। মনের ধর্ম্ম মেজবাবু আমায় কি শেখাবেন, আমি এটুকু জেনেচি নিজের জীবনে—মানুষের মন কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না সে জিনিসকে, যা ধরা-ছোঁয়ার বাইরের। আমি যা নিজের চোখে কতবার দেখলুম, বাস্তব ব'লে জানি—ঘরে-বাইরে সব লোক বললে ও মিথ্যে। পণ্ডিত ও মূর্খ এখানে সমান—ধরা-ছোঁয়ার গণ্ডীর সীমানা পার হয়ে কারুর মন অন্তত অজানার দিকে পাড়ি দিতে চায় না। যা সত্যি তা কি মিথ্যে হয়ে যাবে?

কলকাতায় ফিরে এলাম বড়বাবুর মেয়ের বিবাহ উপলক্ষে। জামাইকে বিয়ের রাত্রে বেবি অস্টিন্ গাড়ি যৌতুক দেওয়া হ'ল—বিবাহ মণ্ডপের মেরাপ বাঁধতে ও ফুল দিয়ে সাজাতেই ব্যয় হ'ল আটশ টাকা। বিয়ের পরে ফুলশয্যার তত্ত্ব সাজাতে আট-দশজন লোক হিমসিম খেয়ে গেল। ছোটবাবুর বন্ধুবান্ধবদের একদিন পৃথক ভোজ হ'ল, সেদিন শখের থিয়েটারে হাজার টাকা গেল এক রাত্রে। তবুও তো শুনলাম এ তেমন কিছু নয়—এরা পাড়াগাঁয়ের গৃহস্থ জমিদার মাত্র, খুব বড়মানুষি করবে কোথা থেকে।

ফুলশয্যার তত্ত্ব সাজাতে খুব খাটুনি হ'ল। দু মণ দই, আধ মণ ক্ষীর, এক মণ মাছ, লরি-বোঝাই তরিতরকারি, চল্লিশখানা সাজানো থালায় নানা ধরনের তত্ত্বের জিনিস—সব বন্দোবস্ত ক'রে তত্ত্ব বার ক'রে ঝি-চাকরের সারি সাজাতে ও তাদের রওনা করতে—সে এক রাজসূয় ব্যাপার।

ওদের রঙীন কাপড়-পরা ঝি-চাকরের লম্বা সারির দিকে চেয়ে মনে হ'ল এই বড়মানুষির খরচের দরুণ নিমচাঁদের স্ত্রী তিনটে টাকা দিয়েচে। অথচ এই হিমবর্ষী অগ্রহায়ণ মাসের রাত্রে হয়ত সে অনাথা বিধবার খেজুরডালের ঝাঁপে শীত আটকাচ্চে না, সেই যে বুড়ী যার গলা কাঁপছিল, তার সেই ধার-করে দেওয়া আট আনা পয়সা এর মধ্যে আছে। ধর্ম্মের নামে এরা নিয়েচে, ওরা স্বেচ্ছায় হাসিমুখে দিয়েচে।

সব মিথ্যে। ধর্ম্মের নামে এরা করেচে ঘোর অধর্ম্ম ও অবিচারের প্রতিষ্ঠা। বটতলার গোসাঁই এদের কাছে ভোগ পেয়ে এদের বড়মানুষ ক'রে দিয়েচে, লক্ষ গরীব লোককে মেরে—জ্যাঠামশায়দের গৃহদেবতা যেমন তাদের বড় ক'রে রেখেছিল, মাকে, সীতাকে ও ভুবনের মাকে করেছিল ওদের ক্রীতদাসী।

সত্যিকার ধর্ম্ম কোথায় আছে? কি ভীষণ মোহ, অনাচার ও মিথ্যের কুহকে ঢাকা পড়ে গেছে দেবতার সত্য রূপ সেদিন, যেদিন থেকে এরা হৃদয়ের ধর্ম্মকে তুলে অর্থহীন অনুষ্ঠানকে ধর্ম্মের আসনে বসিয়েছে।

দাদার একখানা চিঠি পেয়ে অবাক হয়ে গেলাম। দাদা যেখানে কাজ করে, সেখানে এক গরীব ব্রাহ্মণের একটি মাত্র মেয়ে ছিল, ওখানকার সবাই মিলে ধরে-পড়ে মেয়েটির সঙ্গে দাদার বিয়ে দিয়েচে। দাদা নিতান্ত ভালমানুষ, যে যা বলে কারও কথা ঠেলতে পারে না। কাউকে জানানো হয়নি, পাছে কেউ বাধা দেয়, তারাই জানাতে দেয়নি। এদিকে জ্যাঠামশায়ের ভয়ে বাড়িতে বৌ নিয়ে যেতে সাহস করচে না, আমায় লিখেচে, সে বড় বিপদে পড়েচে, এখন সে কি করবে? চিঠির বাকী অংশটা নববধূর রূপগুণের উচ্ছ্বসিত সুখ্যাতিতে ভর্ত্তি।

"জিতু, আমার বড় মনে কষ্ট, বিয়ের সময় তোকে খবর দিতে পারিনি। তুই একবার অবিশ্যি অবিশ্যি আসবি, তোর বউদিদির বড় ইচ্ছে তুই একবার আসিস্। মায়ের সম্বন্ধে কি করি আমায় লিখবি। সেখানে তোর বউদিকে নিয়ে যেতে আমার সাহসে কুলোয় না। ওরা ঠিক কুলীন ব্রাহ্মণ নয়, আমাদের স্বঘরও নয়, অত্যন্ত গরিব, আমি বিয়ে না করলে মেয়েটি পার হবে না সবাই বললে, তাই বিয়ে করেচি। কিন্তু তোর বৌদিদি বড় ভাল মেয়ে, ওকে যদি জ্যাঠামশায় ঘরে নিতে না চান, কি অপমান করেন, সে আমার সহ্য হবে না ··"

পত্র পড়ে বিস্ময় ও আনন্দ দুই-ই হ'ল। দাদা সংসারে বড একা ছিল, ছেলেবেলা থেকে আমাদের জন্যে খাটচে, জীবনটাই নষ্ট করলে, সেজন্যে অথচ ওর দ্বারা না হ'ল বিশেষ কোনো উপকার মায়ের ও সীতার, না হ'ল ওর নিজের। ভালই হয়েচে ওর মত স্নেহপ্রবণ, ত্যাগী ছেলে যে একটি আশ্রয়নীড় পেয়েছে, ভালবাসার ও ভালবাসা পাবার পাত্র পেয়েচে, এতে ওর সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হলুম। কত রাত্রে শুয়ে শুয়ে দাদার দুঃখের কথা ভেবেচি!

মাকে কাছে নিয়ে আসতে পত্র লিখে দিলাম দাদাকে। জ্যাঠামশায়ের বাড়িতে রাখবার আর দরকার নেই। আমি শীগগিরই গিয়ে দেখা করবো।

•

মাঘ মাসের প্রথমে আমি চাকরি ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। মনে কেমন একটা উদাস ভাব, কিসের একটা অদম্য পিপাসা। আমার মনের সঙ্গে যা খাপ খায় না, তা আমার ধর্ম্ম নয়। ছেলেবেলা থেকে আমি যে অদৃশ্য জগতের বার বার সম্মুখীন হয়েচি, অথচ যাকে কখনও চিনিনি, বুঝিনি—তার সঙ্গে যে ধর্ম্ম খাপ খায় না, সেও আমার ধর্ম্ম নয়।

অথচ চারিদিকে দেখচি সবাই তাই। তারা সৌন্দর্য্যকে চেনে না, সত্যকে ভালবাসে না, কল্পনা এদের এত পঙ্গু যে, যে-খোঁটায় বদ্ধ হয়ে ঘাসজল খাচ্চে গরুর মত—তার বাইরে ঊর্দ্ধের নীলাকাশের দেবতার যে-সৃষ্টি বিপুল ও অপরিমেয় এরা তাকে চেনে না।

বছরখানেক ঘুরে বেড়ালুম নানা জায়গায়। কতবার ভেবেচি একটা চাকরি দেখে নেবো, কিন্তু শুধু ঘুরে বেড়ানো ছাড়া আর কিছু ভাল লাগতো না। যেখানে শুনতাম কোনো নতুন ধর্ম্মসম্প্রদায় আছে, কি সাধু-সন্ন্যাসী আছে, সেখানে যেন আমায় যেতেই হবে, এমন হয়েছিল।

কাল্‌নার পথে গঙ্গার ধারে একদিন সন্ধ্যা হয়ে গেল। কাছেই একটা ছোট গ্রাম, চাষী-কৈবর্ত্তের বাস। ওখানেই আশ্রয় নেবো ভাবলাম। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন খড়ের ঘর, বেশ নিকানো পুছোনো, উঠোন পর্য্যন্ত এমন পরিষ্কার যে সিঁদুর পড়লে উঠিয়ে নেওয়া যায়। সকলের ঘরেই ধানের ছোটবড় গোলা, বাড়ির সাম্‌নে-পিছনে ক্ষেত-খামার। ক্ষেতের বেড়ায় মটরশুঁটির ঝাড়ে সাদা গোলাপী ফুল ফুটে মিষ্টি সুগন্ধে সন্ধ্যার অন্ধকার ভরিয়ে রেখেচে।

একজন লোক গোয়ালঘরে গরু বাঁধছিলো। তাকে বললাম—এখানে থাকবার জায়গা কোথায় পাওয়া যাবে? সে বললে—কোত্থেকে আসা হচ্চে? আপনারা?

'ব্রাহ্মণ' শুনে নমস্কার ক'রে বললে—ওই দিকে একটু এগিয়ে যান—আমাদের অধিকারী মশাই থাকেন, তিনি ব্রাহ্মণ, তাঁর ওখানে দিব্বি থাকার জায়গা আছে।

একটু দূরে গিয়ে অধিকারীর ঘর। উঠোনের এক পাশে একটা লেবুগাছ। বড় আটচালা ঘর, উঁচু মাটির দাওয়া। একটি ছোট ছেলে বললে, অধিকারী বাড়ি নেই, হলুদপুকুরে কীর্ত্তনের বায়না নিয়ে গাইতে গিয়েচে—কাল আসবে।

আমি চলে যাচ্ছি এমন সময় একটি মেয়ে ঘরের ভেতর থেকে বললে—চলে কেন যাবেন? পায়ের ধুলো দিয়েছেন যদি রাতে এখানে থাকুন না কেনে?

কথার মধ্যে রাঢ় দেশের টান। মেয়েটি তারপর এসে দাওয়ার দাঁড়াল। বয়স সাতাশ-আটাশ হবে, রং ফর্সা, হাতে টেমির আলোয় কপালের উল্কি দেখা যাচ্ছে।

মেয়েটি দাওয়ায় একটা মাদুর বিছিয়ে দিয়ে দিলে, এক ঘটি জল নিয়ে এল। আমি হাত পা ধুয়ে সুস্থ হয়ে বসলে মেয়েটি বললে—রান্নার কি যোগাড় ক'রে দেবো ঠাকুর ?

আমি বললাম—আপনারা যা রাঁধবেন, তাই খাবো।

রাত্রে দাওয়ায় শুয়ে রইলাম। পরদিন দুপুরের পরে অধিকারী মশাই এল্ল। পেছনে জনতিনেক লোক, একজনের পিঠে একটা খোল বাঁধা। তামাক খেতে খেতে আমার পরিচয় নিলে, খুব খুশী হ'ল আমি এসেচি বলে।

বিকেলে উল্কি-পরা স্ত্রীলোকটির সঙ্গে কি নিয়ে তার ঝগড়া বেধে গেল। স্ত্রীলোকটি বলচে শুনলাম—এমন যদি করবি মিন্সে, তবে আমি বলরামপুরে চলে যাব। কে তোর মুখনাড়ার ধার ধারে ? একটা পেট চলে যাবে ঢের, সেজন্যে তোর তোয়াক্কা রাখি ভেবেচিস্ তুই !

আগুনে জল পড়ার মত অধিকারীর রাগ একদম শান্ত হয়ে গেল। রাত্রে ওদের উঠোনে প্রকাণ্ড কীর্ত্তনের আসর বসল। রাত তিনটে পর্য্যন্ত কীর্ত্তন হ'ল। আসরসুদ্ধ সবাই হাত তুলে নাচতে শুরু করলে হঠাৎ। দু-তিন ঘণ্টা উদ্দণ্ড নৃত্যের পরে ক্লান্ত হয়ে পড়ার দরুনই হোক বা বেশী রাত হওয়ার জন্যেই হোক, তারা কীর্ত্তন বন্ধ করলে।

আমি যেতে চাই, ওরা—বিশেষ ক'রে সেই স্ত্রীলোকটি—আমায় যেতে দেয় না। কি যত্ন সে করলে ! আরো একটা দেখলাম, অধিকারীকেও সেবা করে ঠিক ক্রীতদাসীর মত—মুখে এদিকে যখন-তখন যা-তা শুনিয়ে দেয়, তার মুখের কাছে দাঁড়াবার সাধ্যি নেই অধিকারীর।

যাবার সময়ে মেয়েটি দিব্যি করিয়ে নিলে যে আমি আবার আসবো। বললে—তুমি তো ছেলেমানুষ, যখন খুশী আসবে। মাঝে মাঝে দেখা দিয়ে যাবে। তোমার খাওয়ার কষ্ট হচ্চে এখানে—মাছ মিলে না, মাংস মিলে না। বোশেখ মাসে এস, আম দিয়ে দুধ দিয়ে খাওয়াবো।

কী সুন্দর লাগল ওর স্নেহ !

আমার সেই দর্শনের ক্ষমতাটা ক্রমেই যেন চলে যাচ্চে। এই দীর্ঘ এক বছরের মধ্যে মাত্র একটিবার জিনিসটা ঘটেছিল।

ব্যাপারটা যেন স্বপ্নের মত। তারই ফলে আটঘরায় ফিরে আসতে হচ্চে। সেদিন দুপুরের পরে একটি গ্রাম্য ডাক্তারের ডিস্‌পেন্সারী-ঘরে বেঞ্চিতে শুয়ে বিশ্রাম করচি—ডাক্তারবাবু জাতিতে মাহিষ্য, সর্ব্বদা ধর্ম্মকথা বলতে ও শুনতে ভালবাসে ব'লে আমায় ছাড়তে চাইত না, সব সময় কেবল ঘ্যান্ ঘ্যান্ ক'রে ওই সব কথা পেড়ে আমার প্রাণ অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছিল—আমি ধর্ম্মের কথা বলতেও ভালবাসি না, শুনতেও ভালবাসি না—ভাবছি শুয়ে শুয়ে কাল সকালে এর এখান থেকে চলে যাব—এমন সময় একটু তন্দ্রা-মত এল। তন্দ্রাঘোরে মনে হ'ল আমি একটা ছোট্ট ঘরের কুলুঙ্গি থেকে বেদানা ভেঙে কার হাতে দিচ্চি, যার হাতে দিচ্চি সে তার রোগজীর্ণ হাত অতিকষ্টে একটু ক'রে তুলে বেদানা নিচ্চে, আমি যেন ভাল দেখতে পাচ্চি নে, ঘরটার মধ্যে ধোঁয়া-ধোঁয়া কুয়াশা—বারকতক এই রকম বেদানা দেওয়া-নেওয়ার পরে মনে হ'ল রোগীর মুখ আর আমার মায়ের মুখ এক। তন্দ্রা ভেঙে মন অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠল এবং সেই দিনই সেখান থেকে আঠারো মাইল হেঁটে এসে ফুলসরা ঘাটে স্টীমার ধরে পরদিন বেলা দশটায় কলকাতা পৌঁছুলাম। মায়ের নিশ্চয়ই কোনো অসুখ করেচে, আটঘরা যেতেই হবে।

শেয়ালদ' স্টেশনের কাছে একটা দোকান থেকে আঙুর কিনে নেবো ভাবলাম, পকেটেও বেশী পয়সা নেই। পয়সা গুনচি দাঁড়িয়ে, এমন সময় দূর থেকে মেয়েদের বিশ্রাম ঘরের সামনে

দণ্ডায়মানা একটি নারীমূর্ত্তির দিকে চেয়ে আমার মনে হ'ল দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা আমার পরিচিত। কিন্তু এগিয়ে গিয়ে দেখতে পারলাম না—আঙুর কিনতে চলে গেলাম। ফিরবার সময় দেখি ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডের কাছে একটি পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের যুবকের সঙ্গে দাঁড়িয়ে শ্রীরামপুরের ছোট বৌঠাকরুন। আমি কাছে যেতেই বৌঠাকরুণ চমকে উঠলেন প্রায়। বললেন—আপনি! কোত্থেকে আসচেন? এমন চেহারা?

আমি বললুম—আপনি একটু আগে মেয়েদের ওয়েটিং-রুমের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন?

—হ্যাঁ, এই যে আমরা এখন এলাম যোগবাণীর গাড়িতে—আমরা শ্রীরামপুরে যাচ্চি। ইনি মেজদা, এঁকে দেখেন কি কখনও?

যুবকটি আমায় বললে—আপনি তা হ'লে একটু দাঁড়ান দয়া ক'রে—আমি একটা ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে আসি—এখানে দরে বনচে না—

সে চলে গেল। ছোট বৌঠাকরুন বললেন—মাগো কি কালীমূর্ত্তি চেহারা হয়েচে! বড়দি বলছিল আপনি নাকি কোথায় চলে গিয়েছিলেন, খোঁজ নেই—সত্যি?

—নিতান্ত মিথ্যে কি ক'রে বলি! তবে সম্প্রতি দেশে যাচ্চি।

ছোট বৌঠাকরুন হাসিমুখে চুপ ক'রে রইলেন একটু, তার পর বললেন—আপনার মত লোক যদি কখনও দেখে থাকি! আপনার পক্ষে সবই সম্ভব। জানেন, আপনি চলে আসবার পর বড়দির কাছ থেকে আপনার সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞেস ক'রে ক'রে শুনেচি। তখন কি অত জানতাম? বড়দি বাপের বাড়ি গিয়েচে আশ্বিন মাসে—আপনার সঙ্গে দেখা হবে'খন। আচ্ছা, আর শ্রীরামপুরে গেলেন না কেন? এত ক'রে বললাম, রাখলেন না কথা? আমার ওপর রাগ এখনও যায়নি বুঝি?

—রাগ কিসের? আপনি কি সত্যি ভাবেন আমি আপনার ওপর রাগ করেছিলাম?

ছোট বৌঠাকরুন নত মুখে চুপ ক'রে রইলেন।

—বলুন!

ছোট বৌঠাকরুন নতমুখেই বললেন—ও কথা যাক্। আপনি এ-রকম ক'রে বেড়াচ্চেন কেন? পড়াশুনো করলেন না কেন?

—সে সব অনেক কথা। সময় পাই তো বলব একদিন।

—আসুন না আজ আমাদের সঙ্গে শ্রীরামপুরে? দিনকতক থেকে যান, কি চেহারা হয়ে গিয়েচে আপনার! সত্যি, আসুন আজ।

—না, আজ নয়, দেশে যাচ্চি, খুব সম্ভব মায়ের বড় অসুখ—

ছোট বৌঠাকরুন বিস্ময়ের সুরে বললেন—কই, সে কথা তো এতক্ষণ বলেননি! সম্ভব মানে কি, চিঠি পেয়েচেন তো, কি অসুখ?

একটু হেসে বললাম—না, চিঠি পাইনি। আমার ঠিকানা কেউ জানতো না। স্বপ্নে দেখেছি—

ছোট বৌঠাকরুন একটু চুপ ক'রে থেকে মৃদু শান্ত সুরে বললেন—আমি জানি। তখন জানতাম না আপনাকে, তখন তো বয়সও আমার কম ছিল। বড়দি তার পর বলেছিল। একটা কথা রাখবেন? চিঠি দেবেন একখানা? অন্ততঃ একখানা লিখে খবর জানাবেন?—

ছোট বৌঠাকরুন আগের চেয়ে সামান্য একটু মোটা হয়েছেন, আর চোখে সে বালিকা-সুলভ তরল ও চপল দৃষ্টি নেই, মুখের ভাব আগের চেয়ে গম্ভীর। আমি হেসে বললাম—আমি চিঠি না দিলেও, শৈলদির কাছ থেকেই তো জানতে পারবেন খবর—

এই সময় ওঁর মেজদাদা ট্যাক্সিতে চড়ে এসে হাজির হ'লেন। আমি বিদায় নিলুম।

সন্ধ্যার সময় আটঘরা পৌছে দেখি সত্যিই মায়ের অসুখ। আমাদের ঘরখানায় মেঝের ওপর পাতা বিছানায় মা শুয়ে। অন্ধকারে আমায় চিনতে না পেরে ক্ষীণস্বরে বললে—কে ওখানে, হারু?

তারপর আমায় দেখে কেঁদে উঠে বললেন—কে জিতু, আয় বাবা আয়, এতদিন পরে মাকে মনে পড়লো তোর? আয় এই বালিশের কাছে আয়—ওমা, এ কি হয়ে গিয়েছিস্ রে! রোগা কালো চেহারা—ওরা সত্যিই বলত তো!

মা একটি ঘরে শুয়ে—জনপ্রাণী কেউ কাছে নেই। সন্ধ্যা হব-হব, ঘরে একটা আলো পর্য্যন্ত কেউ জ্বালেনি। এমনিই বাড়ি বটে! কেন, এত ছেলে মেয়ে বৌ বাড়িতে, একজন কাছে থাকতে নেই? অথচ—, কিন্তু পরের দোষ দিয়ে লাভ কি, আমিই বা কোথায় ছিলুম এতদিন?

বললাম—মা, দাদা কোথায়? সীতা আসেনি?

মা নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলেন। বললেন—ওরা কেউ চিঠি দেয় না, ব'লে ব'লে আজ বুঝি হারু একখানা পত্র দিয়েচে সীতাকে।

—ক'দিন অসুখ হয়েচে তোমার, মা? ওরা কেউ দেখে না? জ্যাঠাইমা কাকীমারা আসে না?

—ভুবনের মা মাঝে মাঝে আসে। এই বিকেলে সাবু দিয়ে গেল—তা সাবু কি খেতে পারি, ওই রয়েচে বাটিতে। ছোটবৌ এসেছিল বিকেলবেলা। বট্‌ঠাকুর বাড়ি নেই বুঝি—আর কেউ এদিকে মাড়ায় না।

তারপর আমার গায়ে হাত বুলিয়ে বললেন—হ্যাঁরে জিতু, তুই নাকি সন্নিসী হয়ে গিয়েচিস—দিদি, হারু, মেজবৌ, ঠাকুরপোরা সবাই বলে—সত্যি? বলে সে আর আসবে না, সে কোন্ দিকে বেরিয়ে চলে গিয়েচে, তার ঠিকানা কেউ জানে না। আমি ভাবি জিতু আমায় ভুলে যাবে এমনি হবে? আবার ভাবি আমার কপাল খারাপ, নইলে এ-সব হবেই বা কেন—ভেবে ভেবে রাতে জেগে বসে থাকি।

—কেঁদো না, কেঁদো না, ছিঃ। ওসব মিথ্যে কথা। কে বলেচে সন্নিসী হয়ে গেছি! এই ছাখ না সাদা কাপড় পরনে, সন্নিসী কি সাদা কাপড় পরে?

মনে বড় অনুতাপ হ'ল—কি অন্যায় কাজ করেচি এতদিন এভাবে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে! আর এদেরও কি অন্যায়, সবাই মিলে মাকে এমন ক'রে ভয় দেখানোই বা কেন, মা সরল মানুষ, সকলের কথা বিশ্বাস করেন। কিন্তু আমার দোষ ছিল না, আমি ভেবেছিলাম মা আছেন দাদার কাছে। নিশ্চিন্ত ছিলুম অনেকটা সেজন্যে। জিজ্ঞেস করলাম—মা, দাদা তোমায় নিয়ে যায়নি?

—সে অনেক কথা। নিতু নিতেও এসেছিল, বট্‌ঠাকুর বললেন—যাও, কিন্তু আমার এখানে আর আসতে পাবে না। সীতার শ্বশুরবাড়ির লোক ভাল না এখন দেখচি—তারাও বট্‌ঠাকুরের হাতের লোক; বললে, তা হ'লে মেয়ে-জামাইয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ ঘুচে যাবে। মেয়ে তারা আর পাঠাবে না। বৌমাকেও এখনও দেখিনি, এমনি আমার কপাল। বট্‌ঠাকুর সে বউকে এ-বাড়ি নাকি ঢুকতে দেবেন না। তা নিতু আমায় লিখলে, মা, এই কটা মাস যাক—কোথায় নাকি ভাল চাকরি পাবে—এখানে পাড়াগাঁয়ে বাসাও পাওয়া যায় না। আমি আবার গিয়ে ওর শ্বশুরবাড়ি উঠবো সেটা ভাল দেখাবে না। মাঘ মাসে একেবারে নিয়ে যাবে এখান

থেকে। এই তো নিতু ও মাসেও এসেছিল। আহা, বাছাকে কি অপমান করলে সবাই মিলে। আমার কপালে কেবল চারদিকে অপমান ছাড়া আর কিছু জোটে না—

কেন চাকরি ছেড়ে দিলাম? কেন এভাবে ঘুরে ঘুরে বেড়াই? এখন দেখতে পাচ্চি সীতার বিবাহ হয়ে গেলেই আমার কর্ত্তব্য শেষ হয়েচে ভাবা উচিত ছিল না। মাকে আমি উপেক্ষা করে এসেচি এতদিন, দাদা সাধ্যমত অবিশ্যি করেচে—কিন্তু আমি কিছুই করিনি। কেন আমার এমনধারা মতিগতি হ'ল? কোথায় আমার কর্ত্তব্য, সে সম্বন্ধে আমি অন্ধ ছিলাম কেন?

লজ্জিত ও অনুতপ্ত স্বরে বললাম—মা, আঙুর খাবে?···আঙুর এনেছি, ভাল আঙুর শেয়ালদ' থেকে—

—ভূতোকে বললাম, একটা আলো দিয়ে আয়, তা দেয় নি দেখচি—বলতে বলতে ছোট-কাকীমা ঘরের দোরের কাছে এসে আমায় দেখে থমকে দাঁড়িয়ে বললেন—কে বসে ওখানে?

আমি অপরাধীর মত কুণ্ঠিত স্বরে বললাম—আমি কাকীমা।

এগিয়ে এসে বললেন—কে, নিতু?

—না, আমি।

কাকীমা অবাক হয়ে বললেন—ওমা, জিতু যে দেখচি, কোত্থেকে, কি ভাগ্যি তোমার মায়ের? তারপর, কি মনে ক'রে?

আমি মাথা হেঁট ক'রে বসে রইলাম, কি আর বলব।

কাকীমা বললেন—তোমার কাণ্ডজ্ঞান যে কবে হবে, তা ভেবেই পাই নে। একেবারে এ-কটা বছর নিরুদ্দেশ নিখোঁজ।—আর এই এ-ভাবে মাকে ফেলে রেখে! তোমাদের একটু জ্ঞান নেই যে এটা কার বাড়ি? এখানে কে থাকে তোমার মাকে? সবাই তো জানে—বয়েস হয়েচে, এখনও বুদ্ধি হ'ল না? বট্‌ঠাকুর বাড়ি নেই, একটা ডাক্তার-বদ্যি কে দেখায় তার নেই ঠিক। হরি ডাক্তারকে একবার আনতে হয়—টাকাকড়ি কি আছে? নেই বোধ হয়, সে দেখেই বুঝিচি—নেই। আচ্ছা, টাকা আমি দেব এখন, ভেবো না, ডাক্তার আনো।

ছোটকাকীমার পায়ের ধুলো নেবার ইচ্ছা হ'ল। এ বাড়িতে সবাই পশু, সবাই অমানুষ—সত্যিকার মেয়ে বটে ছোটকাকীমা।

রাত্রেই ডাক্তার এল। ওষুধপত্রও হ'ল। দাদাকে পত্র দিলাম পরদিন সকালে।

আমায় নিয়ে খুব হৈ-চৈ হ'ল। জ্যাঠাইমা আমায় রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে খেতে দেবেন না—আমি জাতবিচার মানি নে, বাগ্‌দি দুলে সবার হাতে খেয়ে বেড়াই, এ-সব কথা কে এসে গাঁয়ে বলেচে। নানা রকম অলঙ্কার দিয়ে কথাটা রাষ্ট্র হয়েচে গাঁয়ে।

মায়ের অবস্থা শেষরাত থেকে বড় খারাপ হ'ল। সকালে আমাকে আর চিনতে পারেন না—ভুল বকতেও লাগলেন।

সন্ধ্যার সময় একটা মিটমিটে টেমি জ্বলচে ঘরের মেঝেতে—আমি একা বসে আছি মায়ের শিয়রে, এমন সময় বাইরে উঠোনে একখানা গরুর গাড়ি এসে দাঁড়াবার শব্দ হ'ল। একটু পরেই ব্যস্তসমস্ত ভাবে মাটিতে আঁচল লুটোতে লুটোতে সীতা ঘরে ঢুকল। আমায় দেখে বললে, ছোড়দা? মা কেমন আছেন ছোড়দা?

আমি ওর দিকে চেয়ে রইলাম। সীতা একেবারে বদলে গিয়েচে, মাথায় কত বড় হয়েচে, দেখতেও কি সুন্দর হয়েচে—ওকে চেনা যায় না আর।

মাকে বললাম—মা, ওমা, সীতা এসেচে,—

মা চাইলেন, কি বললেন বোঝা গেল না। বোধ হয় বুঝতে পারলেন না যে সীতা

এসেচে।

সীতা খুব শক্ত মেয়ে। সে কেঁদেকেটে আকুল হয়ে পড়লো না। আমায় বললে—ছোড়দা, আমার বালাজোড়াটা দিচ্চি, তাই দিয়ে ভাল ডাক্তার নিয়ে এস। এখানকার হরি ডাক্তার তো? তার কাজ নয়।

আমি অক্ষমতার লজ্জায় কুণ্ঠিত সুরে বললাম—তার পর তোর শ্বশুরবাড়ির লোকে তোকে বকবে। সে কি ক'রে হয়—

সীতা বললে—ইস্! বক্‌বে কিসের জন্যে, বালা কি ওদের? মায়ের বালা, মা দিয়েছিলেন বিয়ের সময়। বাবা গড়িয়ে দিয়েছিলেন মাকে। তুমি বালা নিয়ে যাও, তারপর ওরা যা বলে বলবে—

এই সময় সীতার স্বামী ঘরে ঢুকল। আমি যে-রকম চেহারা কল্পনা করছিলাম, লোকটা তার চেয়েও খারাপ। কালো তো বটেই, পেটমোটা, বোধ হয় পিলে আছে, কাঠখোট্টা গড়ন, চোয়ালের হাড় উঁচু—গায়ে একটা ছেলেমানুষের মত ছিটের জামা, একটা রাঙা আলোয়ান, পায়ে কেম্বিসের জুতো! আমায় দেখে দাঁত বার করে হেসে বললে—এই যে, ছোটবাবু না? কখন আসা হ'ল? বড়বাবু বুঝি এখনও আসবার ফুরসুৎ পাননি—তার পর অসুখটা কি?··· এখন কেমন আছেন?

তারপর সে খানিকক্ষণ বসে থেকে বললে—বসো তোমরা। আমি জ্যাঠাইমাদের সঙ্গে দেখা করে আসি—একটু চায়ের চেষ্টাও দেখা যাক্, গরুর গাড়িতে গা-হাত ব্যথা হয়ে গিয়েচে।

ওর কথার ভঙ্গিতে একটা চাষাড়ে ভাব মাখানো। এই লোকটা সীতার স্বামী! সীতার মত মেয়ের! সীতাকেও আমরা সবাই মিলে উপেক্ষা করেচি।

এই সময় হঠাৎ শৈলদিদির কথা আমার মনে পড়ল। শেয়ালদ' স্টেশনে ছোট বৌঠাকুরুন বলেছিলেন শৈলদি এখানেই আছে। সীতার বালাজোড়াটা নেব না—ওকে তার জন্যে অনেক দুঃখ পোয়াতে হবে সেখানে। ও যে-রকম চাপা মেয়ে, কোন অভিযোগ করবে না কখনও কারু কাছে। শৈলদিদির কাছ থেকে টাকা ধার নেবো, মায়ের অসুখের পরে যে ক'রে হোক্ দেনা শোধ হবেই।

একবার বাড়ির মধ্যে গিয়ে দেখি সীতার স্বামী ওদের রান্নাঘরে বসে হুঁকো হাতে তামাক খেতে খেতে খুব গল্প জমিয়েচে—আমার খুড়তুতো জ্যাঠতুতো ভায়েদের সকলেরই প্রায় বিয়ে হয়ে গিয়েচে এবং বৌয়েরা সকলেই ওর শালাজ—তাদের সঙ্গে।

রাত দশটার সময় শৈলদিদি এসে হাজির। আমায় দেখে বললে—এই যে সন্নিসী-ঠাকুর, ফিরে এসেচ দেখচি। এই যে সীতা—এস এস, সাবিত্রীসমান হও, কখন এলে ভাই? আমি শুনলাম এই খানিকটা আগে, আমাদের ও-পাড়ায় কে খবর দেবে বল।

আমি আর সীতা শুধু ঘরে মায়ের পাশে বসে। সীতার স্বামী খেয়ে-দেয়ে শুয়েচে, অবিশ্যি সে বসে থাকতে চেয়েছিল—আমি বলেছিলাম, তার দরকার নেই, তুমি খেয়ে একটু বিশ্রাম কর—দরকার হলে ডাকব রাত্রে।

শৈলদিদিও রাত্রে থাকতে চাইলে, বললে—আজ রাতে লোকের দরকার। তোরা দুটিতে মোটে বসে আছিস। আমি খেয়ে আসি, আমিও থাকব।

আমি বললাম—না শৈলদি, আমরা দুজন আছি, ভগ্নীপতি এসেচে—তোমায় আর কষ্ট করতে হবে না।

তারপর বাইরে ডেকে টাকার কথা বললাম। শৈলদি বললে—কত টাকা?

—গোটাকুড়ি দাও গিয়ে এখন। কাল সকালেই আমি তা হ'লে চলে যাই ডাক্তার আনতে—

—তা হ'লে কাল সকালে যাবার সময় আমার কাছ থেকে নিয়ে যাবি। ওখান দিয়েই তো পথ—কেমন তো?

ছোটকাকীমা এই সময় এলেন। শৈলদিকে দেখে বললেন—জিতুর মাকে নিয়ে বেজায় মুশকিল হয়েচে ভাই—ওরা ছেলেমানুষ, কি বা বোঝে—নিতু এখনও তো এল না। হঠাৎ চার পাঁচ দিনের জ্বরে যে মানুষ এমন হয়ে পড়বে তা কি ক'রেই বা জানবো। তবুও তো জিতু কোথা থেকে ঠিক সময়ে এসে পড়েছিল তাই রক্ষে।

রাতে জ্যাঠাইমাও এসে খানিকটা বসে রইলেন। অনেক রাত্রে সবাই চলে গেল, আমি সীতাকে বললাম—তুই ঘুমিয়ে নে সীতা। আমি জেগে থাকি। রাতে কোন ভয় নেই।

সকাল বেলা আটটা-নটার পর থেকে মা'র অবস্থা খুব খারাপ হ'ল। দশটার পর দাদা এল—সঙ্গে বৌদিদি ও দাদার খোকা। বৌদিদিকে প্রথম দেখেই মনে হ'ল শান্ত, সরল, সহিষ্ণু মেয়ে। তবে খুব বুদ্ধিমতী নয়, একটু অগোছালো, আনাড়ি ধরনের। নিতান্ত পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, বাইরে কোথাও বেরোয়নি বিশেষ, এই বোধ হয় প্রথম, কিছু তেমন দেখেও নি। গরম জলের বোতল পায়ে সেঁক করতে হবে শুনে ব্যাপারটা না বুঝতে পেরে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে বিপন্ন মুখে সীতার দিকে চেয়ে রইল। কাপড়-চোপড় পরবার ধরনও অগোছালো—আজকালকার মত নয়। বৌদিদি যেন বনে-ফোটা শুভ্র কাঠমল্লিকা ফুল, তুলে এনে তোড়া বেঁধে ফুলের দোকানে সাজিয়ে রাখবার জিনিস নয়। আর একেবারে অদ্ভুত ধরনের মেয়েলী, ওর সবটুকুই নারীত্বের কমনীয়তা মাখানো।

সীতা আমায় আড়ালে বললে—চমৎকার বৌদি হয়েচে, ছোড়দা। আহা, মা যদি একটি-বারও চোখ মেলে দেখতেন। আমাদের কপাল!

বেলা তিনটের সময় মা মারা গেলেন। যে মায়ের কথা তেমন ক'রে কোন দিন ভাবি নি, আমাদের কাজকর্ম্মে, উদ্যমে, আশায়, আকাজ্ক্ষায়, উচ্চাভিলাষে মায়ের কোন স্থান ছিল না, সবাই মিলে যাকে উপেক্ষা ক'রে ক'রে এসেচি এত দিন—আজ সেই মা কত দূরে কোথায় চলে গেল—সেই মায়ের অভাবে হঠাৎ আমরা অনুভব করলাম অনেকখানি খালি হয়ে গিয়েচে জীবনের। ঘরের মধ্যে যেমন প্রকাণ্ড ঘরজোড়া খাট থাকে, আজন্ম তার ওপর শুয়েচি, বসেচি, খেলেচি, ঘুমিয়েচি, সর্ব্বদা কে ভাবে তার অস্তিত্ব, আছে তো আছে। হঠাৎ একদিন খাটখানা ঘরে নেই—ঘরের পরিচিত চেহারা একেবারে বদলে গিয়েচে—সে ঘরই যেন নয়, একদিন সে ঘরের নিবিড় সুপরিচিত নিজস্বতা কোথায় হারিয়ে গেল, তখন বোঝা যায় ঘরের কতখানি জায়গা জুড়ে কি গভীর আত্মীয়তায় ওর সঙ্গে আবদ্ধ ছিল সেই চিরপরিচিত একঘেয়ে সেকেলে খাটখানা—ঘরের বিরাট ফাঁকা আর কিছু দিয়েই পূর্ণ হবার নয়।

সীতার ধৈর্য্যের বাঁধ এবার ভাঙলো। সে ছোট মেয়ের মত কেঁদে আবদার ক'রে যেন মাকে জড়িয়ে থাকতে চায়। মা আর সে দুজনে মিলে এই সংসারে সকালে-সন্ধ্যায় দু-বেলা খেটে দুঃখের মধ্যে দিয়ে পরস্পরের অনেক কাছাকাছি এসেছিল—সে-সব দিনের দুঃখের সঙ্গিনী হিসাবে মা আমাদের চেয়েও ওর কাছে বেশী আপন, বেশী ঘনিষ্ঠ—অভাগী এত দিনে সত্যি সত্যি নিঃসঙ্গ হ'ল সংসারে। ওর স্বামী যে ওর কেউ নয়, সে আমার বুঝতে দেরি হয় নি এতটুকু। কিন্তু ও হয়ত এখনও তা বোঝেনি।

দিন দুই পরে বৌদিদি দুপুরবেলা ওদের রান্নাঘরে একটা ঘড়া আনতে গিয়েচেন। জ্যাঠাইমা বলেচেন—ওখানে দাঁড়াও, দাওয়াটাতে—অমনি হুট্ ক'রে ঘরে ঢুকলে যে?

বৌদিদি অবাক হয়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েচেন, জ্যাঠাইমা ঘড়া বার ক'রে দিয়েচেন দাওয়াতে। বৌদিদি নিয়ে এসেচে। কিন্তু বুঝতে পারেনি ব্যাপারটা কি, বুদ্ধিমতী মেয়ে হ'লে তখনই বুঝত।

এ-কথা তখন সে কাউকে বলেনি।

পরদিন মেজকাকা আমায় ডেকে বললেন—একটা কথা আছে, শোন। তোমার মায়ের কাজটা এখানে না ক'রে অন্য জায়গায় গিয়ে করো। মানে তোমার দাদার বৌয়ের এখানে তো পাকস্পর্শ হয়নি, বড়দাদাও নেই বাড়ি—এ অবস্থায় শ্রাদ্ধের সময় কেউ খেতে আসবে না। তোমার দাদার বৌকে আমরা সে-ভাবে ঘরে তো নিইনি। এই বুঝে যা হয় ব্যবস্থা করো। বলো তোমার দাদাকে।

তলায় তলায় এঁরা সীতার স্বামী গোপেশ্বরকে কি পরামর্শ দিয়েচেন জানি নে, সে হঠাৎ বেঁকে দাঁড়িয়ে বললে চতুর্থীর শ্রাদ্ধ সীতাকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে করবে—অথচ আগে ঠিক হয়েছিল চতুর্থীর শ্রাদ্ধ এখানেই হবে। কালই শ্রাদ্ধের দিন, সুতরাং আজই সে সীতাকে নিয়ে যেতে প্রস্তুত হ'ল। এর কোনও দরকার ছিল না, সীতা এখানে শ্রাদ্ধ করলে তাতে কোন দোষ সমাজের মতেও হবার কথা নয়—কিন্তু সে কিছুতেই কথা শুনলে না; এই অবস্থায় বৌদিদিকে পেয়ে সীতা অনেকটা সান্ত্বনা পেয়েছিল—কিন্তু সে ওদের সইল না। বৌদিদির সঙ্গে সীতার বেশী মেশামেশিটা যেন গোড়া থেকেই আমার ভগ্নীপতি পছন্দ করে নি। নিজেই হোক আর ওদের পরামর্শেই হোক।

যাবার সময় সীতা বৌদিদির গলা জড়িয়ে কাঁদতে লাগল। আমায় আড়ালে বললে—ছোড়দা, আমায় বনবাসে ফেলে রেখে ভুলে থেকো না যেন, মাঝে মাঝে আসবে বল? আর শোনো, বৌদি বড্ড ভালমানুষ, ও এখনও জানে না যে ওর জন্যেই মায়ের কাজ এখানে করতে দিচ্চে না ওরা। এ কথা যেন বৌদিদির কানে না যায়, ব'লে দিও দাদাকে।

বৌদিদিকে বুঝিয়ে দেওয়া হ'ল এখানে শ্রাদ্ধ করতে খরচ বেশী পড়বে, কারণ জেঠামশায়দের নাম বেশী, লোকজন নিমন্ত্রণ করতে হয় অনেক। গঙ্গাতীরে শ্রাদ্ধের কাজ করলে অনেক কম খরচ হবে। বৌদিদি তাই বুঝে গেল।

যাবার সময় আমাদের ঘরের চাবিটা ছোটকাকীমার হাতে দিয়ে বললুম—এ বাড়িতে আর কাউকে আপন ব'লে জানি নে, কাকীমা। সীতার খোঁজখবর মাঝে মাঝে একটু নিও—ওর তো এ বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক একরকম মিটেই গেল।

ছোটকাকীমার চোখে জল এল। বললেন—আমার কোন ক্ষমতা নেই, নইলে নিতুর বৌকে এ বাড়ি থেকে আজকে অন্য জায়গায় যেতে বলে?

আমি বললুম—সে কথা ব'লো না কাকীমা। আমরা এখানে এসেছিলাম প্রার্থী হয়ে, পরের দয়ার ওপর নির্ভর করে। এখানে কোন অধিকার নেই আমাদের।

কাকীমা বললেন—তুই ও কি কথা বলচিস জিতু? এ তোদের যে সাতপুরুষের ভিটে। জায়গা-জমি আর দুখানা ইট থাকলেই বা কি, আর গেলেই বা কি? এ ভিটেতে হারুর কি যোগেশের যে অধিকার, তোদের দু-ভায়ের তার চেয়ে এক চুল কম নয়।

ছোটকাকীমার এক মূর্ত্তি দেখেছিলাম বাল্যে, এ আর এক মূর্ত্তি। এই একজনই এ-বাড়ির মধ্যে বদলে গিয়েচে একেবারে। গাড়িতে যেতে যেতে সেই কথাটা বার বার মনে হলচ্ছি।

॥ ১০ ॥

মাস পাঁচ-ছয় পরে ঘুরতে ঘুরতে একবার গেলাম দাদার বাড়িতে।

দাদা ছিল না বাড়ি, বৌদিদি বাটনা-মাখা হাতে ছুটে বার হয়ে এল—আমার হাত থেকে পুঁটুলিটা নিয়ে বললে—এস এস ঠাকুরপো, রদ্দুরে মুখ রাঙা হয়ে গিয়েচে একেবারে। কই, আসবে ব'লে চিঠি দেও নি তো! তা হ'লে একখানা গরুর গাড়ি স্টেশনে যেত।

তখনই বৌদিদি চিনি ভিজিয়ে শরবৎ ক'রে নিয়ে এল। বললে—ঠাকুরপো, তোমার মায়া নেই শরীরে। এত দেরি ক'রে আসতে হয়? উনি কেবল বলেন তোমার কথা।

বিকেলে দাদা এল। আমায় পেয়ে যেন হাতে স্বর্গ পেলে। কিসে আমার সুখ-সুবিধে হবে, কিসে আমায় বড় মাছ, ভালটা-মন্দটা খাওয়ানো যাবে, এই যোগাড়েই ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

এরা বেশ সুখে আছে। দাদা যা চাইত, তা সে পেয়েচে। সে চিরকালই সংসারী মানুষ, ছেলেপুলে গৃহস্থালী নিয়েই ও সুখী, তাই নিয়েই ও থাকতে ভালবাসে। ছেলেবেলা থেকে দাদাকে দেখে এসেচি, সংসার কিসে গোছালো হবে, কিসে সংসারের দুঃখ ঘুচবে, এই নিয়েই সে ব্যস্ত থাকত। লেখাপড়াই ছেড়ে দিলে আমাদের দু-পয়সা এনে খাওয়াবার জন্যে। কিন্তু পরের বাড়িতে পরের তৈরী ব্যবস্থার গণ্ডীর মধ্যে সেখানে তো কোন স্বাধীনতা ছিল না, কাজেই দাদার সে সাধ তখন আর মেটে নি। যার জন্যে ওর মন চিরকাল পিপাসিত ছিল, এত দিনে তার সন্ধান মিলেচে, তাই দাদা সুখী। দাদা ও বৌদিদি একই ধরনের মানুষ। নীড় বাঁধবার আগ্রহ ওদের রক্তে মেশানো রয়েছে। বৌদিদির বাপের বাড়ির অবস্থা খারাপই। একান্নবর্তী প্রকাণ্ড পরিবারের মেয়ে সে। তার বাপের বাড়িতে সবাই একসঙ্গে কষ্ট পায়, সবাই ছেঁড়া কাপড় পরে, এক ঘরে পুরানো লেপকাঁথা পেতে শীতের রাতে তুলো বেরুনো, ওয়াড়-হীন ময়লা লেপ টানাটানি ক'রে ছেলেপুলেরা রাত কাটায়—সব জিনিসই সকলের, নিজের বলে বিশেষ কোন ঘরদোরও নেই, তৈজসপত্রও নেই—সেই রকম ঘরে বৌদিদি মানুষ হয়েচে। এতকাল পরে সে এমন কিছু পেয়েছে যাকে সে বলতে পারে এ আমার। এ আমার স্বামী, আমার ছেলে, আমার ঘরদোর—আর কারও ভাগ নেই এতে। এ অনুভূতি বৌদিদির জীবনে একেবারে নতুন।

দাদা আমায় তার পরদিন সকালে ওর কপির ক্ষেত, শাকের ক্ষেত দেখিয়ে বেড়ালে। বৌদিদি বললে—শুধু ওদিক দেখলে হবে না ঠাকুরপো, তুমি আমার গোয়াল দেখে যাও ভাই এদিকে। এই ত্যাখো এই হচ্চে মুংলী। মঙ্গলবারে সন্দেবেলা ও হয়, ওই সজনেগাছতলায় তখন গোয়াল ছিল। ও হ'ল, সেই রাতেই বিষম ঝড় ভাই। গোয়ালের চালা তো গেল উড়ে। তারপর এই নতুন গোয়াল হয়েচে এই বোশেখ মাসে—বৌদিদি বাছুরের গলায় হাত বুলিয়ে আদর করতে করতে বললে—বড্ড পয়মন্ত বাছুর, যে-মাসে হ'ল সেই মাসেই ওঁর সেই মনিব আমায় শাঁখা-শাড়ি পাঠিয়ে দিলে, ওর দু-টাকা মাইনে বাড়ালে।

দিনকতক যাবার পরে বৌদিদির একটা গুণ দেখলাম, লোককে খাওয়াতে বড় ভালবাসে। অসময়ে কোন ফকির বৈষ্ণব, কি চুড়িওয়ালী বাড়িতে এসে খেতে চাইলে নিজের মুখের ভাত তাদের খাওয়াবে। নিজে সে-বেলাটা হয়ত মুড়ি খেয়ে কাটিয়ে দিলে।

এক দিন একটা ছোকরা কোথা থেকে একখানা ভাঙা খোল ঘাড়ে ক'রে এসে জুটলো। তার মুখে ও গালে কিসের ঘা, কাপড়-চোপড় অতি নোংরা, মাথায় লম্বা লম্বা চুল। ছ-সাত দিন রইল, দাদাও কিছু বলে না, বৌদিদিও না। আমি একদিন বৌদিদিকে বললাম—বৌদি,

দেখচো না ওর মুখে কিসের ঘা। বাড়ির থালা গেলাসে ওকে খেতে দিও না। ও ভাল ঘা নয়, ছেলেপুলের বাড়ি, ওকে পাতা কেটে আনতে বললেই তো হয়, তাতেই খাবে। আট দিন পর ছোকরা চলে গেল। বোধ হয় আরো আট দিন থাকলে দাদা বৌদিদি আপত্তি করত না।

বৌদিদি খাটতে পারে ভূতের মত। ঝি নেই, চাকর নেই, এক হাতে কচি ছেলে মানুষ করা থেকে শুরু করে ধানসেদ্ধ, কাপড়-কাচা, বাসন-মাজা, জল-তোলা—সমস্ত কাজই করতে হয়। কোনদিন ব্যাজার হ'তে দেখলাম না সেজন্যে বৌদিদিকে।

এদের মায়ায় আমিও যেন দিনকতক জড়িয়ে গেলাম। এরকম শান্তির সংসার কতকাল ভোগ করি নি—বোধ হয় চা-বাগানেও না, কারণ সেখানে বাবা মাতাল হয়ে রাত্রে ফিরবেন, সে ভয় ছিল। ভেবে দেখলাম সত্যিকার শান্তি ও আনন্দভরা জীবন আমরা কাকে বলে কোনদিন জানি নি—স্রোতের শেওলার মত বাবা স্ত্রী-পুত্র নিয়ে এ চা-বাগানে ও চা-বাগানে ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন, শেষকালে না-হয় কিছুদিন উমপ্লাং বাগানে ছিলেন—এতে মন আমাদের এক জায়গায় বসতে না বসতেই আবার অন্য জায়গায় উঠে যেতে হ'ত—এই সব নানা কারণে নিজের ঘর, নিজের দেশ, এমন কি নিজের জাতি ব'লে কোন জিনিস আমাদের ছিল না। তার অভাব যদিও আমরা কোনদিন অনুভব করি নি—অত অল্পবয়সে করবার কথাও নয়—বিশেষ ক'রে যখন হিমালয় আমাদের সকল অভাবই পূর্ণ করেছিল আমাদের ছেলেবেলাতে।

এখানে সকলের চেয়ে আমার ভাল লেগেচে বৌদিকে। আমি বৌদিদির ধরনের মেয়ে কখনও দেখি নি। যা তা জিনিস দিয়ে বৌদিকে খুশী করা যায়, যে-কোন ব্যাপার যত অসম্ভবই হোক না কেন—বৌদিদিকে বিশ্বাস করানো যায়, খুব অল্পেই ভয় দেখানো যায়—ঠকিয়ে কোন জিনিস বৌদিদির কাছ থেকে আদায় করা মোটেই কঠিন নয়। অথচ একটি সহজাত বুদ্ধির সাহায্যে বৌদিদি ঘরকন্না ও সংসার সম্বন্ধে দাদার চেয়েও ভাল বোঝে, বড় কিছু একটা আশা কখনও করে না, ভারি গোছালো, নিজের ধরনে ঠাকুরদেবতার ওপর ভক্তিমতী। কেবল একটা দোষ আমার চোখে বড় লাগে—নিজে যে-সব কুসংস্কার মানে, অপরকে সেই সব মানতে বাধ্য করবে। অনেক ব্যাপারে দেখলাম ভাবটা এই রকম, আমার সংসারে যতক্ষণ আছ ততক্ষণ তোমায় মানতেই হবে, তার পর বাইরে গিয়ে হয় মেনো না-হয় না-মেনো—কড়া কথা ব'লে নয়, মিনতি অনুরোধ ক'রে মানাব। কড়া কথা বলতে বৌদিদি জানে না—টকের ঝাঁজ নেই কোথাও বৌদিদির স্বভাবে, সবটাই মিষ্টি।

সপ্তাহ দুই পরে ওদের ওখান থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম। আসবার সময়ে দাদা বললে —শোন্ জিতু, আটঘরার বাড়ি সম্বন্ধে কি করা যাবে, তুই একটা মত দিস্। ছোটকাকীমা ঠিকই বলেচেন—ও বাড়ি আমরা ছাড়বো না। আর একটা কথা শোন্, একটা চাকরি দেখে নে, এরকম ক'রে বেড়াস নে। তোর বৌদিদি বলছিল এই বছরই তোর একটা বিয়ে দিয়ে দিতে। তার পর দু-ভায়ে মিলে ঘরবাড়ি করি আয়, দুজনে মিলে টাকা আনলে ভাবনা কিসের সংসার চালাবার? সংসারটা বেশ গড়ে তুলতে পারবো এখন। আর ছাখ্, পয়সা রোজগার করতে না পারলে, ঘরবাড়ি না থাকলে কি কেউ মানে? নিজের বাড়ি কোথাও একখানা থাকা চাই, নইলে লোকে বড় তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে।

দাদার শুধু সংসার আর সংসার। আর লোকে আমার সম্বন্ধে কি ভাবলে না-ভাবলে তাতেই বা আমার কি? লেখাপড়া শিখলে না কিছু না, দাদা যেন কেমন হয়ে গিয়েচে। লোকে কি বলবে সেই ভাবনাতেই আকুল। দাদার ওই সব ছাপোষা গেরস্তালী-ধরনের কথাবার্ত্তায় আমার হাসি পায়, দাদার ওপর কেমন একটা মায়াও হয়।

ভাবলুম, কোথায় যাওয়া যায়? কলকাতায় গিয়ে একটা চাকুরি দেখে নেবো? দাদা যদি তাতেই সুখী হয়, তাই না-হয় করা যাক। আমি নিজে বিয়ে করি আর না-করি, ওদের সংসারে কিছু কিছু সাহায্য করা তো যাবে! নৈহাটির কাছে অনেক পাটের কল আছে, কলকাতায় না গিয়ে সেখানে গেলে কেমন হয়? পাটের কলে শুনেচি চাকুরি জোটানো সহজ।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কলকাতাতেই এলাম। মাস দুই কাটল, একটা মেসে থাকি আর নানা জায়গায় চাকুরির চেষ্টা করি। কোন জায়গাতেই কিছু সুবিধে হয় না।

একদিন রবিবারে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ধরে বেড়াতে বেড়াতে অনেক দূর চলে গেছি, দমদমাও প্রায় ছাড়িয়েচি, হঠাৎ ঝড় বৃষ্টি এল। দৌড়ে একটা বাগানবাড়ির ঘরে আশ্রয় নিলাম। ঘরটাতে বোধ হ'ল বহুদিন কেউ বাস করে নি, ছাদ ভাঙা, মেজের সিমেণ্ট উঠে গিয়েচে। বাগানটাতেও জঙ্গল হয়ে গিয়েচে।

একটা লোক সেই ভাঙা ঘরের বারান্দাটাতে শুয়ে ছিল, বোধ হয় ক'দিন থেকে সেখানে সে বাস করচে, একটা দড়ির আল্‌নায় তার কাপড়-চোপড় টাঙানো। আমায় দেখে লোকটা উঠে বসল—এসো, বসো বাবা। বেশ ভিজেচ দেখচি বৃষ্টিতে! বসো।

লোকটার বয়স পঞ্চাশের ওপর, পরনে গেরুয়া আলখাল্লা, দাড়ি-গোঁফ কামানো। আমায় জিজ্ঞেস করলে—তোমার নাম কি বাবা? বাড়ি এই কাছাকাছি বুঝি?

নাম বললাম, সংক্ষেপে পরিচয় দিলাম।

বললে—বাবা, ভগবান তোমায় এখানে পাঠিয়েচেন আজ। তুমি বসো, তুমি আমার অতিথি। একটু মিষ্টি খেয়ে জল খাও—

আমি খেতে না চাইলেও লোকটা পীড়াপীড়ি করতে লাগল। তারপর কথা বলতে বলতে হঠাৎ ডান হাতটা শূন্যে একবার নেড়েই হাত পেতে বললে—এই নাও—

হাতে একটা সন্দেশ।···

আমি ওর দিকে অবাক্ হয়ে আছি দেখে বললে—আর একটা খাবে? এই নাও।

হাত যখন ওঠালে, আমি তখন ভাল ক'রে চেয়ে ছিলাম, হাতে কিছু ছিল না। শূন্যে হাত-খানা বার দুই নেড়ে আমার সামনে যখন পাতলে তখন হাতে আর একটা সন্দেশ। অদ্ভুত ক্ষমতা তো লোকটার! আমার অত্যন্ত কৌতূহল হ'ল, বৃষ্টি থেমে গিয়েছিল কিন্তু আমি আর নড়লাম না সেখান থেকে।

লোকটা অনেক গল্প করলে। বললে—আমি গুরুর দর্শন পাই কাশীতে। সে অনেক কথা বাবা। তোমার কাছে বলতে কি, আমি বাঘ হ'তে পারি, কুমীর হ'তে পারি। মন্ত্রপড়া জল রেখে দেবো, তারপর আমার গায়ে ছিটিয়ে দিলে বাঘ কি কুমীর হয়ে যাব—আর একটা পাত্রে জল থাকবে, সেটা ছিটিয়ে দিলে আবার মানুষ হবো। সাতক্ষীরেতে ক'রে দেখিয়েছিলাম, হাকিম উকিল মোক্তার সব উপস্থিত সেখানে—গিয়ে জিজ্ঞেস ক'রে আসতে পার সত্যি না মিথ্যে। আমার নাম চৌধুরী-ঠাকুর—গিয়ে নাম করো।

আমি অবাক হয়ে চৌধুরী-ঠাকুরের কথা শুনছিলাম। এসব কথা আমার অবিশ্বাস হ'ত যদি না এইমাত্র ওকে খালি-হাতে সন্দেশ আনতে দেখতুম। জিজ্ঞেস করলাম—আপনি এখন কি কলকাতায় যাচ্ছেন?

—না বাবা, মুর্শিদাবাদ জেলায় একটা গাঁয়ে একটা চাঁড়ালের মেয়ে আছে, তার অদ্ভুত সব ক্ষমতা। খাগ্‌ড়াঘাট থেকে কোশ-দুই তফাতে। তার সঙ্গে দেখা করবো ব'লে বেরিয়েচি।

আমি চাকরি-বাকরি খুঁজে নেওয়ার কথা সব ভুলে গেলাম। বললাম—আমায় নিয়ে যাবেন? অবিশ্যি যদি আপনার কোন অসুবিধা না হয়।

চৌধুরী-ঠাকুর কি সহজে রাজী হন, অতি কষ্টে মত করালুম। তারপর মেসে ফিরে জিনিস-পত্র নিয়ে এলাম। চৌধুরী-ঠাকুর বললেন—এক কাজ করা যাক এস বাবা। আমার হাতে রেলভাড়ার টাকা নেই, এস হাঁটা যাক।

আমি বললাম—তা কেন? আমার কাছে টাকা আছে, দু'জনের রেলভাড়া হয়ে যাবে।

চাঁড়াল মেয়েটির কি ক্ষমতা আছে দেখবার আগ্রহে আমি অধীর হয়ে উঠেচি।

খাগ্‌ড়াঘাট স্টেশনে পৌছতে বেলা গেল। স্টেশন থেকে এক মাইল দূরে একটা ছোট মুদির দোকান। সেখানে যখন পৌছেচি, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ প্রায়। দোকানের সামনে বট-তলায় আমি আশ্রয় নিলাম। রাত্রে শোবার সময় চৌধুরী-ঠাকুর বললেন, আমার এই দুটো টাকা রেখে দাও গে তোমার কাছে। আজকাল আবার হয়েচে চোর-ছেঁচড়ের উৎপাত। তোমার নিজের টাকা সাবধানে রেখেচ তো?

চৌধুরী-ঠাকুরের ভয় দেখে আমার কৌতুক হ'ল। পাড়াগাঁয়ের মানুষ তো হাজার হোক্, পথে বেরুলেই ভয়ে অস্থির। বললাম—কোন ভয় নেই, দিন আমাকে। এই দেখুন ঘড়ির পকেটে আমার টাকা রেখেচি, বাইরে থেকে বোঝাও যাবে না, এখানে রাখা সবচেয়ে সেফ্—

সকালে একটু বেলায় ঘুম ভাঙল। উঠে দেখি চৌধুরী-ঠাকুর নেই, ঘড়ির পকেটে হাত দিয়ে দেখি আমার টাকাও নেই, চৌধুরী-ঠাকুরের গচ্ছিত দুটো টাকাও নেই, নীচের পকেটে পাঁচ-ছ আনার খুচরা পয়সা ছিল তাও নেই।

মানুষকে বিশ্বাস করাও দেখচি বিষম মুশকিল। ঘণ্টাখানেক কাটল, আমি সেই বটতলাতে বসেই আছি। হাতে নেই একটি পয়সা, আচ্ছা বিপদে তো ফেলে গেল লোকটা! মুদিটি আমার অবস্থাটা দেখেশুনে বললে—আমি চাল ডাল দিচ্ছি, আপনি রেঁধে খান বাবু। ভদ্র-লোকের ছেলে, এমন জুয়াচোরের পাল্লায় পড়লেন কি ক'রে? দামের জন্যে ভাববেন না, হাতে হ'লে পাঠিয়ে দেবেন। মানুষ দেখলে চিনতে দেরি হয় না, আপনি যা দরকার নিন্ এখান থেকে। ভাগ্যিস আপনার সুটকেস্‌টা নিয়ে যায় নি!

দুপুরের পরে সেখান থেকে রওনা হয়ে পশ্চিমমুখে চললাম। আমার সুটকেসে একটা ভাল টর্চলাইট ছিল, মুদিকে ওর চাল-ডালের বদলে দিতে গেলাম, কিছুতেই নিলে না।

পথে হাঁটি, একেবারে নিঃসম্বল অবস্থা। সন্ধ্যার কিছু আগে একটা বড় পাকুড়গাছের তলায় পথের ধারে জনকয়েক লোক দেখে সেখানে গেলাম। চারজন পুরুষমানুষ ও একটি ত্রিশ-বত্রিশ বছরের স্ত্রীলোক—তারা গাছতলায় উনুন জ্বেলে রাঁধবার উদ্যোগ করছে।

একজন বললে—কনে থেকে আসছেন বাবু?

—খাগড়াঘাট থেকে—তোমরা আসচ কোথা থেকে?

—আমরা আসতেছি তো বড় দূর থেকে। যাব কেঁদুলির মেলায়।

একজন তামাক সেজে নিয়ে এসে বললে—তামাক ইচ্ছে করুন বাবু। ও জুড়ন, বাবুকে বসবার কিছু দে।

—আমি তামাক খাইনে, তোমরা খাও। তোমরা দেশ থেকে বেরিয়েচ কতদিন?

জুড়ন বৈরাগী এগিয়ে এসে সঙ্গীর হাত থেকে হুঁকোটা নিয়ে বললে—বাবু বড় কষ্ট, আর পুন্নিমেতে বাড়ির বার হওয়া হয়েছে। রাস্তায় কি অনাবিষ্টি! তিনদিন ধরে আর থামে না, জিনিসপত্তর ভিজে একশা, প্রায় পঞ্চাশ ষাট কোশ এখান থেকে—নওদা, চেনেন? সেই

নওদার সন্নিপত্য আমাদের বাড়ি, হাতীবাঁধা গ্রাম, যশোর জেলা।

গল্পগুজবে আধঘণ্টা কাটলো। জুড়ন বললে—দাদাঠাকুরের খাওয়াদাওয়ার কি হবে? এক কাজ করুন দাদাঠাকুর, আমাদের সঙ্গে সবই আছে, রসুই করুন, আমরা পেরসাদ পাব এখন। ব্রাহ্মণের পাতের অন্ন কতকাল খাই নি। ও কাপাসীর মা, পুকুর থেকে জলডা নিয়ে এস, আর রাত কোরো না।

আমি বিশেষ কোন আপত্তি করলাম না। এদের সঙ্গ আমার বড় ভাল লাগছিল, ওই রাত্রে তা ছাড়া যাবই বা কোথায়? রান্না চড়িয়ে দিলাম। কাপাসীর মা আলু বেগুন ছাড়াতে বসলো। ওদের মধ্যে একজনের নাম বাবুরাম—সে পুকুরে চাল ধুতে গেল। জুড়ন শুকনো কাঠকুঠো কুড়িয়ে আনতে গেল।

পথের ধারে এই দরিদ্র, সরল মানুষগুলির সঙ্গে গাছতলায় রাত্রিযাপন, জীবনের এক নতুন অভিজ্ঞতা। রাতটিও বেশ, কি রকম সুন্দর জ্যোৎস্না উঠেছে! নির্জ্জন মাঠে জ্যোৎস্নায় অনেক দূর দেখা যাচ্ছে।

এই জ্যোৎস্নারাতে আমার কেবল মনে হয় আমি আর সে সব জিনিস দেখি নে। কতদিন দেখি নি। যখন চিনতে শিখি নি, তখন রোগ ভেবে যাকে ভয় করেছি কত, এখন তা হারিয়ে বুঝেছি কি অমূল্য সম্পদ ছিল তা জীবনের। বোধ হয় মাঠের ধারের এই সবুজ দুর্ব্বাঘাসের শয্যায় শুয়ে চোখ বুজে ভাবলে আবার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাই—এই সব বিজন মাঠে শেষ প্রহরের জ্যোৎস্নাভরা রাত্রে মুখ উঁচু ক'রে চেয়ে থাকলে অনন্তপথের যাত্রীদের দেখা যায়···ওপর আকাশের জ্যোৎস্নামাখা বায়ুস্তর তাদের গমন পথে পথে দেহগন্ধে সুরভিত হয়—পরের দুঃখে কোনো দয়ালু আত্মা যে চোখের জল ফেলে, নদী-সমুদ্রে ঝিনুকের মধ্যে পড়লে তা মুক্তা হয়, বিল-বাঁওড়ের পদ্মফুলে পড়লে পদ্মমধু সৃষ্টি করে···আমার নিবে-যাওয়া দৃষ্টি-প্রদীপে আলো জেলে দিতে যদি কেউ পারে তো সে ওরাই পারবে।

সীতার কথা মনে হয়। আচ্ছা, এই রাত্রে এতক্ষণ সে কি করছে? যে জীবনের মধ্যে সে আছে, সে জীবনের জন্যে সে তৈরী হয় নি। হয়ত রান্নাঘরে বসে এতক্ষণে এইরকম রাঁধছে, ও অত বই পড়তে ভালবাসে, তাদের ঘরে একখানাও বই নেই, বই পড়া হয়ত সেখানে ঘোর অপরাধ—যেমন ছিল জ্যাঠাইমার কাছে। জীবনের যে-কোনো আনন্দভরা অভিজ্ঞতার সময়েই সীতার ব্যর্থ জীবনের কথা আমার মনে না এসে পারে না।

সবাই মিলে খেতে বসলাম। রান্না হ'ল বড়ির ঝোল, আলুভাতে, পটলভাজা। কাপাসীর মা অবিশ্যি দেখিয়ে দিল। কাল ঠিক এই সময়ে খাগড়াঘাটের পথে বটতলার চৌধুরী-ঠাকুর ভজন গাইচে। কি খারাপ লোকটা! টাকার দরকার ছিল, আমায় বললে তো আমি দিতামই। চুরি ক'রে কি হ'ল!

জুড়ন বৈরাগী খাওয়া-দাওয়ার পরে গল্প করতে লাগল। বললে—শুনুন দাদাঠাকুর, এই যে কাপাসীর মা দেখচেন, এর বাবা অনেক টাকা জমিয়ে মারা গিয়েছিল। খেতো না, শুধু টাকা জমাতো। মরবার সময় ভাইকে বললে, অমুক জায়গায় মালসায় টাকা পোঁতা আছে, নিয়ে এসে আমায় দেখা। তা এই পানচালার কোণে ভাঙা উনুনের মধ্যি মালসা পোঁতা ছিল—কেউ জানতো না। মরবার সময় তাই টাকার মাল্‌সা সামনে নিয়ে খোলে। টাকা দেখতি দেখতি মরে গেল।

—সে টাকা কে পেলে তার পর?

—তারপর বুড়ো তো মরে গেল। তার ভাই সটালে মাল্‌সাসুদ্ধ, টাকা সেই রাত্তি

গোলমালে চুরি হয়েচে। এমন কি টাকার অভাবে বুড়োর ছেরাদ্দটাও হ'ল না। পেটের ওপর বাণিজ্য ক'রে টাকা জমিয়ে গেল, নিজের ভোগে তো লাগলোই না—একটিমাত্তর মেয়ে এই কাপাসীর মা, তার ভোগেও হ'ল না। টাকার মাল্‌গা রাতারাতি কে যে কোথায় সরিয়ে ফেলল—

কাপাসীর মা ঝাঁজের সঙ্গে বলে উঠল—হ্যাঁগো হ্যাঁ, সরিয়ে ফেলতে এসেছিল পাড়ার লোক! যে নেবার সে নিয়েছে। আমি কি আর কিছু জানি নে, না বুঝি নে? ধম্ম আছেন মাথার ওপর—তিনি দেখবেন। ছ-মাসের মেয়ে নিয়ে বিধবা হয়ে লোকের দোর দোর ঘুরিচি দুটো ভাতের জন্তি—আমায় যিনি বাপের ধনে—

বাবুরাম বললে—আর শাপমন্নি করো না বাপু। তোমার অদেষ্টে থাকত, পেতে। বাদ দেও ওসব কথা। উনুনে আগুন আছে কিনা দেখো তো, আর একবার কল্‌কেটা ধরাই।

ওদের মধ্যে আর একজন বললে—ও জুড়নখুড়ো, স্বরূপগঞ্জের বাজারে কাল দুপুরের আগে পৌঁছানো যাবে না?

—দুটোর কম হবে না। ছ'ডী কোশ, তার আগে খাওয়া-দাওয়া ক'রে নেওয়া যাবে।

বাবুরাম বললে—এবা'র কেঁদুলির মেলায় লোক যাচ্ছে কই তেমন জুড়নখুড়ো···সে-বছর দেখেছিলে তো? পথে সারারাতই লোক হাঁটতো।

অদ্ভুত লাগছিল এ রাতটি আমার কাছে। এত কথাও মনে এনে দেয়! ঘুম আর আসে না। ভাবছিলাম মানুষ এত অল্পেও সুখী হয়? আর সুখ জিনিসটা কি অনির্দ্দেশ্য রহস্যময় ব্যাপার—এই নির্জ্জন রাত্রে মুক্ত অপরিচিত প্রান্তরের মধ্যে তারাখচিত আকাশের নীচে শুয়ে সবাই সুখের স্বপ্ন দেখছে—কিন্তু একজনের সুখের ধারণার সঙ্গে অন্য আর একজনের ধারণার কি বিষম পার্থক্য!

সকালে ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পশ্চিম মুখেই হাঁটি। রাঢ় দেশের বড় বড় মাঠের ওপর দিয়ে পথ। রাঙা বালি, দিগন্তে তালবনের সারি। হয়ত মাঠের মাঝে প্রাচীন কালের প্রকাণ্ড দীঘি, তালবনে ঘেরা। কি ফাঁকা জায়গা এ-সব! মনে হ'ত যেন সীমাহারা দিক্‌সমুদ্রে ভেলা ভাসিয়ে চলেছি, কোন্ অজ্ঞাত দিগন্তের বননীল উপকূলে গিয়ে ভিড়বো, কোনখানে তমালতরুনিকরে বনভূমি শ্যামায়মান, সেখানে গন্ধভরা অন্ধকার বীথিপথ বেয়ে অভিসারিকারা চিরদিন পা টিপে টিপে হাঁটে; বৃন্দাবনের দিন ফুরিয়ে গেল, মহাভারতের যুগ কেটে গেল, যমুনার তটে কেলিকদম্বের ছায়া কালের অন্ধকারে লুকিয়েছে, তবুও ওদের ও যাওয়ার শেষ হবে না, আমারও না।

মাঠের পথের প্রথমটায় কেঁদুলি মেলার লোকজনের সঙ্গে দেখা হ'ত। পরে আর তেমন লোক দেখি নি, এত বড় মাঠের মধ্যে অনেক সময় আমি একাই পথিক। এই ধু-ধু সীমাহীন প্রান্তরে সূর্য্যাস্তের কি মূর্ত্তি! আমাদের অঞ্চলে কোনোদিন তা দেখি নি। অন্ধকার হ'লে মাঠের মধ্যেই কতদিন রাত কাটিয়েছি। ছেলেবেলায় চা-বাগানে কাটিয়ে এই শিক্ষা পেয়েছিলাম, রাত্রিতে যে কোথাও আশ্রয় নিতে হবে, একথা মনেই ওঠে না। শীতের দেশ নয়, ঘন হিমারণ্যের হিংস্র শ্বাপদ নেই এখানে—নিতান্ত নিরীহ, নিরাপদ দেশ—এখানে নক্ষত্রভরা মুক্ত আকাশের চাঁদোয়ার তলায় মাটির ওপর যা-হয় একটা কিছু পেতে রাত কাটানোর মত আনন্দ খাট-পালঙ্কে শুয়ে পাই নি।

একদিন এই অবস্থায় একটি অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হ'ল। একটা অপূর্ব্ব নাম-না-জানা অনুভূতির

অভিজ্ঞতা। মুখে সে কথা বলা যায় না, বোঝানো যায় না, শুধু সে-ই বোঝে যার এ রকম হয়েছে।

সকালে বামুনহাটি ব'লে একটা গ্রামে এক গ্রাম্য হাতুড়ে কবিরাজের অতিথি হয়েছিলুম সেদিন ; তার স্ত্রী একটি রণচণ্ডী—যতক্ষণ সেখানে ছিলাম, তাঁর গালবাদ্যের বিরাম ছিল না। আমি গিয়ে সবে বসেছি, তিনি দোরের আড়াল থেকে স্বামীর উদ্দেশ্যে আরম্ভ করলেন—ও অলপ্পেয়ে মিন্‌সে, আমার সঙ্গে তোমার এত শত্তুরতা কিসের বল দিকি ? রান্নাঘরের রোয়াকে চালা তুলতে তোমায় বলেছে কে ? গরমে একে ঘরের মধ্যে টেঁকা যায় না উনুন জ্বললে, যাও বা একটু হাওয়া আসতো, চালা তুললে হাওয়া আসবে তো, ও ড্যাক্‌রা ? ওই অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে তোমার পিণ্ডি রাঁধবো খেও।

স্ত্রী চলে গেলে কবিরাজ-মশায় বললেন—আর বলেন কেন মশাই, হাড় ভাজা-ভাজা হয়ে গেল। শুনলেন তো দাঁতের বাদ্যি—ওই রকম সদাসর্ব্বদা চলছে। আর ঘোর শুচিবাই, তুনিয়ার সব জিনিস সব অশুদ্ধ। দিনের মধ্যে সাতবার নাইছে, নিমুনিয়া হয়ে যদি না মরে তবে কি বলেছি। আজ এক বছর ধরে ওই গোয়ালের একপাশে তক্তপোশ পেতে শোয় আলাদা—ঘরের জিনিস সব অশুদ্ধ যে, সেখানে কি শোয়া যায় ? ওরকম ছিল না মশায়, ছেলেটা গয়ে গিয়ে অব্‌দি ওই রকম—

তারপর যে কথা বলছিলাম। বামুনহাটি থেকে বিকেলে বার হয়ে ক্রোশতিনেক যেতে-না-যেতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। মাঠের মধ্যে একটা ছোট নদী, রাস্তা থেকে একটু দূরে। নদী এত ছোট যে তাকে আমাদের দেশ হ'লে বলতো খাল। তু-পাড়ে রাঙা কাঁকর বিছানো, ধারে ধারে কাঁটাঝোপ আর তালগাছ। সেখানে রাত্রিযাপন করবো বলে মাটির ওপর ছোট শতরঞ্চিখানা পেতে তার ওপরে বসলাম। কোনদিকে জনপ্রাণী নেই।

খালের ওপারে একটা তালগাছের মাথায় শুক্‌নো পাতা হাওয়ায় খড় খড় শব্দ করছে—এই অন্ধকার প্রদোষে তালগাছের মাথার ওপরকার আকাশে নিঃসঙ্গ একটি তারা—আমি একবার তারাটির দিকে চাইছি, একবার চারদিকের নিস্তব্ধ, পাতলা অন্ধকারের দিকে চাইছি। হঠাৎ আমার মনে কেমন একটা আনন্দ হ'ল। সে আনন্দ এত অদ্ভুত যে বেদনা থেকে তা বেশী পৃথক নয়, সে পুলক চোখে জল এনে দিল, মনে কেমন একটা অনির্দ্দেশ্য অভাবের অনুভূতি জাগিয়ে তুলেছে যেন।

কিছুক্ষণ আগেও যে জগতে ছিলাম, এ যেন সে-জগৎ নয়!

এ জগৎ যুগযুগের তুচ্ছ জনকোলাহল কত গভীর মাটির স্তরের নীচে চাপা পড়ে যাওয়ার জগৎ। ফুল ফুটে নির্জ্জনে ঝড়ে-পড়ার জগৎ···অজানা কত বনপ্রান্তের কত অশ্রুভরা আনন্দ-তীর্থের জগৎ···কত স্বপ্ন ভেঙে যাওয়া···কত আশার হাসি মিলিয়ে যাওয়া···

শুধু নির্জ্জনে চূতবীথির তালীবনরেখার মাথার ওপর শ্যামলতার পাড়টানা সীমাহীন নীল শূন্যে বহুদূরের কোন ক্ষীণরশ্মি নক্ষত্রের সঙ্গে এ জগৎ এক···শতাব্দীতে শতাব্দীতে কত লক্ষ মনের আনন্দ, আশা, গর্ব্ব, হাসি, দৃষ্টি-ক্ষমতার বাহাদুরি কোথায় মুছিয়ে নিয়ে ফেলে দেয়, ক্ষীণ তুর্ব্বল হাত প্রিয়কে নির্ম্মম জীবনের গ্রাস থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করে, না বুঝে হাসে, খুশী হয়, আশার স্বপ্নজাল বোনে···

অন্ধকারে কোন্ খনিগর্ভে চুনাপাথর হয়ে যায় তাদের হাড়···

আবার নবীন বুকে নবীন আনন্দ জেগে ওঠে। আবার হাসি, আবার খুশী হওয়া, আবার আশার স্বপ্ন-জাল বোনা···অথচ সব সময় তাদের মাথার ওপর দিয়ে অনন্ত কালের প্রবাহ ছুটে

চলে, পুরোনো পাতা ঝরে পড়ে, নতুন গান পুরোনো হয়ে যায়। গ্রহে গ্রহে, নক্ষত্রে নক্ষত্রে কত দৃশ্য-অদৃশ্য লোকে, কত অজানা জীবজগতেও এরকম বেদনা, দীনতা দুঃখ। দূরের সে-সব অজানালোকে ক্ষুদ্র গ্রাম্য নদী দীর্ঘ বটগাছের ছায়ায় বয়ে যায়, তাদের শান্ত বন-বীথির মূলে প্রিয়জনের, বহুদিন-হারা প্রিয়জনের কথা ভাবে—নদীর স্রোতে শেওলা-দাম-ভাসা জলে অনন্তের স্বপ্ন দেখে···যে অনন্ত তার চারধার ঘিরে আছে সব সময়, তার নিঃশ্বাসে, তার বুকের অদম্য প্রাণস্রোতে, তার মনের খুশীতে, নাক্ষত্রিক শূন্যপারের মিটুমিটে তারার আলোর। দূরের ওই দিগ্বলয় যেখানে চুপি চুপি পৃথিবীর পানে মুখ নামিয়ে কথা কইছে, শূন্যপথে অদৃশ্য চরণে দেবদেবীরা যেন এই সন্ধ্যায় ওখানে নেমে আসেন। যখন নদীজল শেষ-রৌদ্রে চিক্ চিক্ করে, কূলে কূলে অন্ধকার ফিরে আসে, পানকলস শেওলার ফুল কালো জলে সন্ধ্যার ছায়ায় ঢাকা পড়ে যায়—তখনই। আমার মনে সব ওলট-পালট হয়ে গেল, এমন এক দেবতার ছায়া মনে নামে—যেন জ্যাঠাইমাদের শালগ্রামশিলার চেয়ে বড়, আটঘরার বটতলার সেই পাথরের প্রাচীন মূর্ত্তিটির চেয়ে বড়, মহাপুরুষ খ্রীষ্টের চেয়েও বড়—চক্রবালরেখায় দূরের স্বপ্নরূপে সেই দেবতারই ছায়া, এই বিশাল প্রান্তরে ম্লান সন্ধ্যার রূপে মাথার ওপর উড়ে-যাওয়া বালিহাঁসের সাঁই সাঁই পাখার ডাকে। সেই দেবতা আমায় পথ দেখিয়ে দিন। আমি যা হারিয়েছি তা আর চাই নে, আমি চাই আজকার সন্ধ্যার মত আনন্দ, এবং যে নতুন দৃষ্টিতে এই এক মুহূর্ত্তের জন্যে গজৎটাকে দেখেছি সে দৃষ্টি হারিয়ে যাবে জানি, সে আনন্দ জীবনে অক্ষয় হবে না জানি—কিন্তু আর একবারও যেন অন্ততঃ তারা আসে আমার জীবনে।

॥ ১১ ॥

পরদিন দুপুরে সন্ধান মিলল ক্রোশ-চারেক দূরে দ্বারবাসিনী গ্রামে একটি প্রসিদ্ধ আখড়াবাড়ি আছে, সেখানে মাঝে মাঝে ভাল ভাল বৈষ্ণব সাধু আসেন। গাঁয়ের বাইরে আখড়াবাড়ি, সেখানে থাকবার জায়গাও মেলে।

সন্ধ্যার সামান্য আগে দ্বারবাসিনীর আখড়াবাড়িতে পৌঁছলাম। গ্রামের প্রান্তে একটা পুকুরের ধারে অনেকগুলো গাছপালা—ছায়াশূন্য, কাঁকরভরা, উষর ধূ-ধূ মাঠের মধ্যে এক জায়গায় টলটলে স্বচ্ছ জলে ভরা পুকুর। পুকুরপাড়ে বকুল, বেল, অশোক, তমাল, নিম গাছের ছায়াভরা ঘনকুঞ্জ, দু-চারটে পাখীর সান্ধ্যকাকলি—মরুর বুকে শ্যামল মরুদ্বীপের মত মনে হ'ল। এ অঞ্চলে এর নাম লোচনদাসের আখড়া। আমি যেতেই একজন প্রৌঢ় বৈষ্ণব, গলায় তুলসীর মালা, পরনে মোটা তসরের বহির্ব্বাস, উঠে এসে জিজ্ঞেস করলে,—কোত্থেকে আসা হচ্ছে বাবুর? তারপর তালপাতার ছোট চাটাই পেতে দিলে বসতে, হাত-মুখ ধোয়ার জল নিজেই এনে দিলে। গোলমত উঠোনের চারিধারে রাঙা মাটির দেওয়াল-তোলা ঘর, সব ঘরের দাওয়াতেই দুটি-তিনটি বৈষ্ণব, খুব সম্ভবতঃ আমার মতই পথিক, রাত্রের জন্য আশ্রয় নিয়েছে।

সন্ধ্যার পরে আমি তালপাতার চাটাইয়ে বসে একটি বৃদ্ধ বৈষ্ণবের একতারা বাজনা ও গান শুনচি—এমন সময় একটি মেয়ে আমার উঠোনে এসে জিজ্ঞেস করলে—আপনি রাত্তিরে কি খাবেন—?

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম—আমায় বলচেন?

মেয়েটি শান্ত স্বরে বললে—হ্যাঁ। রাত্তিরে কি ভাত খান?

আমি থতমত খেয়ে বললাম—যা হয়, ভাতই খাবো। আপনাদের যাতে সুবিধে।

মেয়েটি বললে—আমাদের সুবিধে নিয়ে নয়—এখানে আপনার যা ইচ্ছে হবে খেতে তাই বলবেন। চা খান কি আপনি ?

এ পর্য্যন্ত কোন জায়গায় এমন কথা শুনি নি, কোন মন্দিরে বা বৈষ্ণবের আখড়াতেই নয়। ডেকে কেউ জিজ্ঞেস করে নি আমি কি খেতে চাই। বললাম—চা খাওয়া অভ্যেস আছে, তবে সুবিধে না হ'লে—

মেয়েটি আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই চলে গেল এবং মিনিট কুড়ি পরে এক পেয়ালা চা নিয়ে এসে নিঃসঙ্কোচে আমার হাতেই দিলে। বললে—চিনি ঠিক হয়েছে কি না দেখুন।

আবার তাকে দেখলাম রাত্রে খাবার সময়ে। লম্বা দাওয়ায় সারি দিয়ে সাত-আট জন লোক খেতে বসেছে, মেয়েটি নিজের হাতে সবাইকে পরিবেশন করলে। প্রকাণ্ড বড় ভাতের ডেকচি নিজে দু-হাতে ধরে নিয়ে এসে আমাদের সামনে রাখলে—তা থেকে থালা ক'রে ভাত নিয়ে সকলকে দিতে লাগল। আমার পাশের লোকটিকে বললে—ও কি শ্যামাকাকা, নাউয়ের ঘণ্ট দিয়ে আর দুটো খান। ওবেলা তো খাওয়াই হয় নি !

সে সসম্ভ্রমে বললে—না দিদিঠাকুরুন, আমাকে বলতে হবে না আপনার। পেটে জায়গা নেই। তেঁতুল মেখে বরং দুটো খাবো—

—হ্যাঁ কাসছেন, তেঁতুল না খেলে চলবে কেন ? দুধ দিচ্ছি—

তারপর আমার সামনে এসে বললে—আপনার বোধ হয় ওবেলা খাওয়াই হয় নি ? আপনাকেও দুধ দিচ্ছি।

এতগুলো লোক খেতে বসেছে, দুধ দেওয়া হ'ল মোটে তিনজনকে—কিন্তু সে ব্যক্তিগত প্রয়োজন বিশেষে এবং তার বিচারকর্ত্রী ওই মেয়েটিই। আমার কৌতুক হ'ল ভারি।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভাবলাম চমৎকার মেয়েটি তো ! দেখতে সুশ্রী বটে, তবে খুব সুন্দরী নয়। কিন্তু আমি ওরকম মুখের গড়ন কখনও দেখি নি, প্রথমে সন্ধ্যাবেলায় ওকে দেখেই আমার মনে হয়েছিল একথা। বার বার চেয়ে দেখতে ইচ্ছে হয়—সে ওর সুন্দর ডাগর চোখ দুটির জন্যে, না ওর মুখের একটি বিশিষ্ট ধরনের লাবণ্যময় গড়নের জন্যে, রাত্রে তা ভাল বুঝতে পারি নি। মেয়েটি কে ? নিতান্ত ছেলেমানুষ তো নয়—সারাদেহে যৌবনশ্রী ফুটে উঠেচে পরিপূর্ণ ভাবেই —এখানে ওভাবে থাকে কেন। আখড়ার সঙ্গে ওর কি সম্পর্ক ? নানা প্রশ্ন মনে উঠে ঘুম আর আসে না।

পরদিন সকালে মেয়েটির সঙ্গে অনেকবার দেখা হ'ল। অতিথিদের কারও অযত্ন না হয় সেদিকে দেখলাম ওর বেশ দৃষ্টি আছে। এ অঞ্চলে চালে কাঁকর ব'লে সে নিজে সকালে কুলো নিয়ে বসে প্রায় আধমণ চাল ঝাড়লে। বেলা ন'টার সময় হঠাৎ এসে আমায় বললে—আপনার ময়লা জামা-কাপড় যদি পুঁটলিতে থাকে তো দিন, কেচে দেবো। আপনার গায়ের জামাটাও ময়লা হয়ে গিয়েছে, খুলে দিন। খুব রোদ, দুপুরের মধ্যে শুকিয়ে যাবে।

আমি প্রথমটা একটু সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিলাম। তার পর দেখলাম সে সকলকেই জিজ্ঞেস করছে কারও ময়লা কাপড়-চোপড় কিছু আছে কিনা। একজন বৃদ্ধ বাউলের গেরুয়া আলখাল্লা ময়লা হয়েছিল ব'লে খুলিয়ে নিয়ে গেল। পরে শুনলাম মেয়েটি ওরকম প্রায়ই করে, আখড়াতে ময়লা-কাপড়ে থাকবার জো নেই।

এখানে দিন দুই কাটাবার পরে আর একটা জিনিস আমার বিশেষ ক'রে চোখে পড়ল যে, মেয়েটির মধ্যে কোন মিথ্যে সঙ্কোচ নেই, সহজ সিধে ব্যবহার, কি কাজে, কি কথাবার্ত্তায়। সজীব ও দীপ্তিময়ী, যেন সঞ্চারিণী দীপশিখা, যদি শ্যামাঙ্গী মেয়েকে দীপশিখার সঙ্গে তুলনা করা

যায়। তৃতীয় দিন বিকেলে এসে বললে—পুকুরপাড়ের বাগান দেখেছেন? আসুন দেখিয়ে নিয়ে আসি।

এই কথাটা আমার বড় ভাল লাগল—এ পর্য্যন্ত আমি কোন মেয়ে দেখি নি যে বাগান ভালবাসে, দেখবার জিনিস ব'লে মনে করে।

ওর সঙ্গে গেলাম। অনেক গাছ আমাকে সে চিনিয়ে দিলে। কাঞ্চন ফুলের গাছ এই প্রথম চিনলাম। এক কোণে একটা বড় তমাল গাছের তলায় ইটের তুলসীমঞ্চ ও বেদী দেখিয়ে বললে—বাবা এখানে বসে জপ করতেন।

জিজ্ঞেস করলাম—আপনার বাবা এখন কোথায়?

মেয়েটি কেমন যেন একটা বিস্ময়ের দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বললে—বাবা তো নেই, এই চার বছর হ'ল মারা গিয়েছেন। এই যে পুকুরটা, বাবা কাটিয়েছিলেন, আর এই বকুল-গাছের ওপাশে বিষ্ণুমন্দির তুলছিলেন, শেষ ক'রে যেতে পারেন নি।

এই কথায় সূত্র খুঁজে পেলাম ওর সম্পূর্ণ পরিচয় জিজ্ঞেস করবার। এ দু-দিন কাউকে ওর সম্বন্ধে কোন কথা বলি নি, পাছে কেউ কিছু মনে করে। কৌতূহলের সঙ্গে বললাম—আপনার বাবার নামেই বুঝি এই আখড়া?

—কি, লোচনদাসের আখড়া? তা নয়, আমরা ব্রাহ্মণ, আমার বাবার নাম ছিল কাশীশ্বর মুখুয্যে। লোচনদাস এই আখড়া বসান, কিন্তু মরবার সময়ে বাবার হাতে এর ভার দিয়ে যান। তারপর বাবা আট-ন' বছর আখড়া চালান। আখড়ার নামে যত ধানের জমি, সব বাবার। আসুন, বিষ্ণুমন্দির দেখবেন না?

মনে ভাবি বিষ্ণুমন্দির তুচ্ছ, কিলপাইন দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত আমি সঙ্গে যেতে রাজী আছি। পুকুরপাড়ের একটা বকুলগাছের পাশে একটা আধ-তৈরি ইটের ঘর। মেয়েটি বললে—গাঁথা শেষ হয় নি তো, হঠাৎ বাবা—তাইতে আদ্দেক হয়ে আছে। কাঁচা গাঁথুনি, আর-বছরের বর্ষায় ওদিকের দেওয়ালের খানিকটা আবার ভেঙে পড়ে গিয়েছে।

বকুলগাছে কি লতা উঠেচে, দেখিয়ে বললাম—বেশ ফুল ফুটেছে তো, কি লতা এটা?

ও বললে—মালতী লতা।

একটু চুপ ক'রে থেকে হেসে বললে—জানেন? আমার নাম—

ওর কথার ভঙ্গিতে মনে হ'ল এ এখনও ছেলেমানুষ। বললাম—আপনার নাম মালতী-লতা? ও! কাল উদ্ধবদাস বাবাজী রুনি বলে ডাকছিলেন আপনাকে, তাই ভাবলাম বোধ হয়—

ও সলজ্জ মুখে বললে—লতা নয়, মালা।

দু'জনেই আখড়াবাড়ির নাটমন্দিরে ফিরে এলাম। তার পর মালতীকে আর দেখতে পেলাম না, সেই যে সে রান্নাঘরে কি কাজ নিয়ে ঢুকল রাত দশটা পর্য্যন্ত আর সেখান থেকে বেরুল না।

সকালে ঘুম ভেঙে উঠে মনে কেমন এক ধরনের মধুর অনুভূতি। মালতীকে যেন স্বপ্নে দেখেছি—ওর প্রকৃতপক্ষে কোন পার্থিব অস্তিত্ব যেন নেই। স্বপ্ন ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে তার কথা মনে পড়ল, বকুলতলায় তার সঙ্গে দাঁড়িয়েছি, সে হাসিমুখে নিজের নাম বলেছে, তার চোখ-মুখের সেই সচেতন নারীত্বের সলজ্জতা অথচ বালিকার প্রগল্ভ কৌতুক-প্রিয়তা—তার সারা দেহের সুঠাম লাবণ্য, এ-সব যেন অবাস্তব স্বপ্নজগৎ থেকে সংগ্রহ করা স্মৃতি। কিন্তু মনে সে বেদনা অনুভব করলাম না, যা আসে এই কথা ভেবে যে স্বপ্নে যা দেখেচি ও সব মিথ্যে, মায়া, মায়া—ও আর পাব না, ও ছায়ালোকের রচা স্বর্গ, ওর চন্দ্রালোকিত নির্জ্জন পর্ব্বতশিখরও

মিথ্যে, ও দিব্যাঙ্গনারাও মিথ্যে। মালতী এইখানেই আছে, কাছে কাছেই আছে, তাকে আরও কতবার দেখবো। মালতী আসবে তো?

মালতী সকালে একরাশ তুলো পিঁজতে বসল। বেলা এগারটা পর্য্যন্ত সে আর কোনো কাজে গেল না। প্রথম এখানে এসে যে প্রৌঢ় বৈষ্ণবটিকে দেখেছিলাম, তার নাম উদ্ধবদাস—সেই লোকটিই মালতীর অভিভাবক, কার্য্যতঃ কিন্তু মালতীর খেয়ালে তাকে চলতে হয়। সেও মালতীর কাছে বসে তুলো পিঁজতে ব্যস্ত আছে, মালতীর কথা ঠেলবার সাধ্য তার নেই।

মালতীর ইতিহাস উদ্ধবদাসের মুখে একদিন ইতিমধ্যে শুনলুম। উদ্ধব বাবাজীকে একদিন আখড়ার বাইরের মাঠে নিয়ে গিয়ে কৌশলে ঘুরিয়ে মালতীর কথা জিজ্ঞেস করতেই ও বললে—ওর বাবা আমার পাঠশালার পোড়ো বন্ধু। ওরা ব্রাহ্মণ, এ দেশের সমাজে কুলীন। মালতীর ঠাকুরদাদা শ্রীধর মুখুটি বেশ নামকরা কীর্ত্তন-গাইয়ে ছিলেন। নিজের দল ছিল। দু-পয়সা হাতে করেছিলেনও। একদিন রাত্তিরে বাইরে বেরুচ্চেন, দরজার চৌকাঠের কাছে বাড়ির বেড়ালটা যেন কিসের সঙ্গে খেলা করছে। ফুটফুট করছে অনন্তচতুর্দ্দশীর রাত, ভাদ্র মাস···যেমন বাইরে পা দিতে গিয়েছে অমনি সাপে ছোবল দিয়েছে পায়ে। সাপ ছিল চৌকাঠের বাইরে, আলো-আঁধারে লেগে বুড়ো তা টের পায় নি। ঘরে তখন ছেলের বৌ মালতীর মা, মালতীর বাবা বাড়ি নেই। চেঁচিয়ে বললেন—বৌমা, শীগ্‌গির আলো জ্বালো, আমায় একগাছা দড়ি দাও শীগ্‌গির। দড়ি নিয়ে বাঁধন দিয়ে উঠোনে গিয়ে বসলো। বললে—আমায় আর ঘরে যেতে হবে না বৌমা, তলব পড়েছে। লোকজন এল, ঝাড়ানো হ'ল—কিছুতেই কিছু হ'ল না, ভোররাত্রে মারা গেল।

মালতীর বাবা পৈতৃক কিছু হাতে পেয়ে একটা লবণ-কলায়ের দোকান করলে। তার মত অতিথিসেবার বাতিক আমি কখনও কারও দেখি নি। দোকান তো ছাই, বাড়ি হয়ে উঠল একটা মস্ত বড় অতিথিশালা। যত লোকই বাড়িতে আসুক, ফিরতো না। একবার রাত-দুপুরের সময় পঁচিশজন সাধু এসে হাজির, গঙ্গাসাগর যাচ্চে, অনেক দূর থেকে শুনে এসেছে এখানে জায়গা পাবে। দোকানের জিনিসপত্র ভাঙিয়ে পঁচিশমূর্ত্তি সাধুর সেবা হ'ল। সকালে তারা বললে, আমাদের জনপিছু দু-টাকা প্রণামী দাও। অত টাকা নগদ কোথায় পাবে? সাধুরা বললে—না দাও তো অভিসম্পাত দেবো। আমি বললাম—মিতে, অভিসম্পাত দেয় দিক, টাকা দিও না ওদের। ওরা লোক ভাল না। সে বললে—অভিসম্পাতের ভয় করি নে, তবে আমার কাছে চেয়েছে, আমি যেখান থেকে পাই, নিয়ে এসে দেবোই। মালতীর মায়ের কানের মাকড়ী আর ফাঁদি নথ শ্রীমন্তপুরের বাজারে বিক্রী ক'রে টাকা নিয়ে এল। তাতেও কুলোয় না, আমি বাকী সাতটা টাকা দিলাম—তবে সাধুরা বিদেয় হয়।

মালতী তখন ছোট, একদিন হঠাৎ স্ত্রীকে এসে বললে—আর এ সংসারে থাকবো না। স্ত্রীও বললে—আমায় সঙ্গে নাও। স্ত্রীকে বললে—বাঁশবাগানে ওই হাঁড়িটা পড়ে আছে, নিয়ে এসে ধুয়ে ওতে ভাত রাঁধো। খেয়ে চলো। লবণ-কলাইয়ের দোকান বিলিয়ে দিলে। ডোমপাড়া থেকে সবাইকে ডেকে নিয়ে এসে বললে—যার যা খুশী নিয়ে যাও। দশ মিনিটের মধ্যে দোকান সাফ্। সবাই বললে—পাগল হয়ে গিয়েছে। তার পর বৌ আর মেয়ের হাত ধরে কোথায় চলে গেল। বছর দুই পরে এসে এই লোচনদাস বাবাজীর আখড়ায় উঠলো। বাবাজী তখন বুড়ো হয়েছেন, বড় ভালবাসতেন, তিনি বললেন—বাবা, মহাপ্রভু তোমায় পাঠিয়ে দিয়েছেন, আমার আখড়ার ভার তোমায় নিতে হবে, আমি আর বেশী দিন নয়। পরের বছর বাবাজী দেহ রাখলেন, ওই পুকুরপাড়ের তমালতলায় তাঁকে সমাধি

দেওয়া হ'ল।

ক্রমে মালতীর বাবার নাম দেশময় ছড়িয়ে পড়ল। গোসাঁইজী বলতো সবাই। গোসাঁইজীকে দেবতা ব'লে জানতো এ-দেশের লোক। এমন নির্লোভ, অমন অমায়িক লোক কেউ কখনও দেখে নি। শরীরে অহঙ্কার ব'লে পদার্থ ছিল না। আর অমন মুক্ত মানুষ হয় না—কোন বাঁধন, কোন নিয়মগণ্ডীর ধার ধারত না। আমাদের বোষ্টমের সমাজেও অনেক আইন-কানুন আছে, মেনে না চললে সমাজে নিন্দে হয়, বড় বড় মচ্ছবের সময় নেমন্তন্ন পাওয়া যায় না। সে গ্রাহ্যও করতো না, একেবারে আপনভোলা, সদানন্দ, মুক্তপুরুষ ছিল। দ্বারবাসিনী কামারদের গাড়ির কাজ আছে কলকাতায়, একবার তাদের বাড়ি কাঙালীভোজন হচ্ছে, বেশ বড়লোক তারা। কামারদের মেজকর্ত্তা রতনবাবু দাঁড়িয়ে তদারক করছেন—এমন সময় দেখেন গোসাঁইজী কাঙালীদের সারিতে পাতা পেতে বসে খাচ্ছেন। পাছে কেউ টের পায় ব'লে থামের আড়ালে বসেছেন। হৈ হৈ কাণ্ড, বাড়িসুদ্ধ এসে হাতজোড় করে দাঁড়ালো। এ কি কাণ্ড গোসাঁইজী, আমাদের অকল্যাণ হবে যে! লোকটা এত সরল—কোনো লম্বা চওড়া কথা নয়, কোনো উপদেশ নয়, অবাক হয়ে বললে, তাতে দোষ কি? আমি শুনলাম কাঙালীভোজন হবে, ভাল-মন্দ খেতে পাওয়া যাবে, তাই এসেছি, এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম। সে জাত মানতো না, সমাজ মানতো না, আপন-পর বুঝতো না, নিয়ম-কানুনের ধার ধারতো না। কত লোক মন্ত্র নিয়ে আসতো। বলতো—মন্ত্র কি দেবো? আপনাকে ভাববে সবাইয়ের চাকর, ব্যস, এই মন্ত্র। মালতীর মা আগেই মারা গিয়েছিল। গোসাঁইজীর নিজের মরণও হ'ল স্ত্রীর মৃত্যুর তিন বছর পরে। একদিন কোথা থেকে বৃষ্টি মাথায় ভিজে আখড়ায় এলেন। তার পরদিন সকালে আমায় বললেন—উদ্ধব, কাল আমার বড় ঠাণ্ডা লেগেছে, একটু যেন জ্বর-মত হয়েছে; আজ আর ভাত খাব না, কি বলো? দু-দিন পর জ্বর নিমোনিয়ায় দাঁড়ালো। বুঝতে পেরেছিলেন বাঁচবেন না, মেয়েকে মরণের আগের দিন ডেকে বলে গেলেন—মালতী মা, তোর বিয়ে দিয়ে যেতে পারলাম না, তা আমার বলা রইলো যাকে তোর মন চায়, তাকেই বিয়ে করিস্। তিনি তো চলে গেলেন, মালতীকে একেবারে নিঃসম্বল অসহায় ফেলে রেখে। হাতে পয়সা রাখতে জানতেন না। ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবতেন না—সেটা আমি গুণ বলি নে, দোষই বলি—বিশেষ ক'রে অত বড় মেয়ে—আর ওর কেউ নেই ত্রিসংসারে। বাপ নেই, মা নেই, পয়সা নেই, বাড়ি নেই, ঘরবাড়ি এই আখড়া। মালতীও যে দেখছেন—ও মেয়েও পাগল, ও বাপের ধারায় গিয়েছে। লোকজনকে খাওয়াচ্ছে, সেবা করছে—ওই নিয়েই থাকে। কিছু মানে না, ভয় করে না। অন্য মেয়ে হ'লে এই সব পাড়াগাঁয়ে কত বদ্‌নাম রটত—গোসাঁইজীর মেয়ে বলে সবাই মানে, তাই কেউ কিছু বলে না।

দিন পনেরো কেটে গেল।

মালতীর বাবার ইতিহাস শুনে বুঝেছি আমি এখানে ছ-মাস থাকলেও এরা আমায় চলে যেতে বলবে না—বিশেষ ক'রে মালতী তো বলবেই না। কিন্তু আমার পক্ষে থাকাও যেমন অসম্ভব হয়ে উঠছে, চলে যাওয়া তার চেয়েও অসম্ভব যে! মালতীকে নতুন চোখে দেখতে শিখেছি ওর বাবার পরিচয় শুনে পর্য্যন্ত। মালতীর বাবার মত লোকের সন্ধানে কত ঘুরেছি, এতদিন পরে সন্ধান মিলেছে, কিন্তু চাক্ষুষ দেখা হ'ল না। জগতের সকল নিঃস্বার্থ নির্ম্মৎসর লোক পরস্পরের সগোত্র—তা সে লোক গঙ্গাতীরে নবদ্বীপের আকাশেই প্রথম দিনের আলো দেখুন কিংবা দেখুন কপিলাবস্তু বা প্যালেস্টাইন বা আসিসির ওপরকার ইতালীর ইন্দ্রনীল

আকাশের তলে।

মালতীকে কত কথা বলবার আছে, ভাবি কিন্তু ওর সঙ্গে আর আমার তেমন নির্জনে দেখা হয় না। আমি দেখি মালতীর আশাতেই আমি সারাদিন বসে থাকি—ও কখন আসবে। ও থাকে সারাদিন নিজের কাজে ব্যস্ত—হয়ত দেখলাম ঘর থেকে ও বার হ'ল, ভাবি আমার কাছে আসছে বুঝি—কিন্তু তা না এসে থালা হাতে কাকে ভাত দিতে গেল। নয়ত আলনাতে কাপড় টাঙাতে ব্যস্ত আছে। হয়ত একবার থাকতে না পেরে ডেকে বলি—ও মালতী—

মালতী বললে—আসছি।

আমি বসেই আছি, বেলা দুপুর গড়িয়ে গেল। ও এল কই?

দিনগুলো প্রায়ই এই রকম। তা ছাড়া আমার ওপর ওর কোন বিশেষ পক্ষপাত আছে ব'লে আমার মনে হয় না। প্রথম দিনকতক যে সে রকম ধারণা না হয়েছিল এমন নয়। কিন্তু এখন সে ভুল ভেঙেছে। সকলকে যেমন যত্ন করে, আমাকেও তেমনি করে।

একদিন ব'সে উদ্ধবদাসের একতারা মেরামত করছি—মালতী দেখতে পেয়ে উঠোনের ওকোণ থেকে চঞ্চলপদে এসে সামনে দাঁড়াল। সকৌতুক সুরে বললে—ও! কাকার সেই একতারাটা? আপনি সারাচ্ছেন নাকি? কি জানেন আপনি একতারা সারানোর?

আমি অপ্রতিভ না হয়ে বললাম—জানাজানির কি আছে এতে? খানিকটা তার হাতে এসেছিল—তাই পরিয়ে দিচ্ছি। কথা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে হাসিমুখে চোখ তুলে চাইতেই ওর সঙ্গে চোখাচোখি হ'ল। সেই মুহূর্ত্তে হঠাৎ আমার মনে হ'ল মালতীকে এখানে একা নিঃসহায়, নিরবলম্ব, রিক্ত অবস্থায় ফেলে আমি কোথাও যেতে পারব না। ওর এখানে কে আছে? একপাল অনাত্মীয়, অশিক্ষিত গেঁয়ো বৈষ্ণবের মেলার মধ্যে ওকে ফেলে রেখে যাব কি ক'রে? তারা ওর কেউ নয়। তারা ওকে বুঝবে না। তার চেয়ে আমার মনের দেশে ও আমার অনেক আপন, আমার নিকটতম প্রতিবেশী।

ভাবলাম মালতীকে সব কথা বলি। বলি, মালতী, সংসারে তোমারও কেউ নেই, আমারও কেউ নেই! তুমি সাধু বাপের সতী মেয়ে, তোমার সংসার-বিরাগী আপন-ভোলা বাপের আশীর্ব্বাদ ওই শ্যামসুন্দর তমালতরু ছায়ার মত তোমাকে ঘিরে রেখেছে জানি, কিন্তু আমিও যে-সন্ধানে বেরিয়েছি, সে-সন্ধান সফল হবে না তুমি যদি পাশে এসে না দাঁড়াও।

কিন্তু তার বদলে বললাম—ভাল কথা মালতী, তোমাকে অনেকদিন থেকে বলব ভাবচি। উদ্ধব বাবাজীকে ব'লে আমার এখানে একটা পাঠশালা করার ব্যবস্থা ক'রে দিতে পার? আমার কিছু হয় তা থেকে।

মালতী এসে দাওয়ায় পা ঝুলিয়ে বসল। ওর মুখের পাশটা দেখা যাচ্চে, একটা সুকুমার লাবণ্য যেন ওর মুখের চারিপাশ ঘিরে আছে—এক ধরনের সুন্দর মুখ আছে, মনে হয় যেন তাদের মুখের চারিপাশে একটা অদৃশ্য সৌন্দর্য্যজালের বেষ্টনী রয়েছে, যখন কথা না বলে চুপ ক'রে থাকে, তখন তাদের মুখের এই ভাবটা সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে—মালতীর মুখ সেই ধরনের। আমার কথায় ওর মুখচোখ চিন্তাকুল হয়ে উঠল, যেন কি একটা বিষম সমস্যা তার ঘাড়ে আমি চাপিয়ে দিয়েছি। বললে—কিন্তু এখানে যা ভেবে করবেন, তার কিছু হবে না। এখানে মাইনে দেবে না কেউ। এখানে ভদ্রলোক নেই। দ্বারবাসিনীতে কামারেরা আছে, ওদের কলকাতার গাড়ির কারখানা, সেইখানেই থাকে। সরকারেরা তিন বছর পরে এসেছিল পুজোর সময় দেশে।—তারপর হেসে ছেলেমানুষের মত ঘাড় দুলিয়ে বললে—খান নিয়ে ছেলে পড়াতে

পারবেন ? এদেশে মাইনের বদলে ধান দেয়। নাঃ, সে-সব আপনার কাজ নয়। তা আপনি তো এখানে জলে পড়ে নেই ? হাতে কিছু নেই, একদিন হবেই। যতদিন না হয়, এখানে থাকুন। আপনাকে এ অবস্থায় কোথাও যেতে দেব না। এখানে থাকতে কষ্ট হচ্ছে বোধ হয়, না ? সত্যি কথা বলুন।

—সত্যি কথা কি সব সময় বলা যায় মালতী ?

—কেন, বলুন না কি বলবেন ?

—এখন থাক্, আমার কাজ আছে। শোন, উদ্ধবদাসের একতারাটা এখানে রইল, ব'লো তাকে। তোমার জন্যে সারানো হ'ল না।

মালতী অবাক হয়ে চেয়ে থেকে বললে—কোথায় যাবেন ? শুনুন। বা রে, অদ্ভুত মানুষ কিন্তু আপনি !

বাইরের মাঠে এসে দাঁড়িয়ে মনে হ'ল আকাশ-বাতাসের রূপ ও রং যেন এই এক মুহূর্তের মধ্যে বদলে গেছে আমার চোখে। মালতী ও-কথা বললে কেন যে, আপনাকে এ অবস্থায় কোথাও যেতে দিতে পারব না ?—এই সেই মাঠ, সেই নীলাকাশ, মাঠের মধ্যে দ্বারবাসিনীর কামারদের কাটানো বড় দীঘিটা, সবই সেই আছে—কিন্তু মালতীর মুখের একটি কথায় সব এত সুন্দর, এত অপরূপ, এত মধুময় হয়ে উঠল কেন ?

ঠিক সেই অদ্ভুত রাত্রিটির মত—মাঠের মধ্যে নির্জ্জন নদীর ধারে শুয়ে যেমন হয়েছিল সেদিন। অনুভূতি হিসেবে দুই-ই এক। কোন প্রভেদ নেই দেখলুম। কোথায় সেই বিরাট দেবতা, আর কোথায় এই মালতী !

তারপর দিন-কতক ধরে মালতীর সঙ্গে কি জানি কেন আমার প্রায়ই দেখা হয়। সময়ে অসময়ে, কারণে-অকারণে ও আমার সামনে যখনই এসে পড়ে কিংবা কাছ দিয়ে যায়, দাঁড়িয়ে দুটো কথা না ব'লে যায় না। হয়ত অতি তুচ্ছ কথা—বসে আছি, সামনে দিয়ে যাবার সময় ব'লে গেল—বসে আছেন ? এ-কথা বলবার কোন প্রয়োজন নেই—কিন্তু সারাদিনের এই টুক্‌রো টুকরো অকারণ কথা, একটুখানি হাসি, কৃত্রিম শ্লেষ, কখন-বা শুধু চাহনি···এর মধ্যে দিয়ে ওর কাছে আমি অনেকটা এগিয়ে যাই—ও আমার কাছে এগিয়ে আসে। এত ক'রে বুঝি ও আমার অস্তিত্বকে উপেক্ষা ক'রে চলতে পারে না—ও আমার সঙ্গে কথা ব'লে আনন্দ পায়।

বিকেলে যখন ওর সঙ্গে এক-এক দিন গল্প করি, তখন দেখি ওর মনের চমৎকার একটা সজীবতা আছে। নিজে বেশী কথা বলতে ভালবাসে না—কিন্তু শ্রোতা হিসেবে সে একেবারে প্রথম শ্রেণীর। যে-কোন বিষয়ে ওর কৌতূহল জাগানো যায়—মনের দিক থেকে সেটা বড় একটা গুণ। এমনভাবে সকৌতূহল ডাগর চোখ দুটি তুলে একমনে সে শুনবে—তাতে যে বলছে তার মনে আরও নতুন নতুন কথা যোগায়, ওকে আরও বিস্মিত করবার ইচ্ছে হয়।

মালতী বড় চাপা মেয়ে কিন্তু—এতদিন পরে হঠাৎ সেদিন উদ্ধবের মুখে শুনলাম যে ও বেশ সংস্কৃত জানে। ওর বাবার এক বন্ধু ত্রিগুণাচরণ কাব্যতীর্থ নাকি শেষ বয়সে এই আখড়ায় ছিলেন, এইখানেই মারা যান। তাঁর কেউ ছিল না—মালতীর বাবা তখন বেঁচে—তিনিই এখানে তাঁকে আশ্রয় দেন। ত্রিগুণা-পণ্ডিতেরই কাছে মালতী তিন-চার বছর সংস্কৃত পড়েছিল। মালতীকে জিজ্ঞেস করতেই মালতী বললে—এখন আর ওসব চর্চ্চা নেই, ভুলে গিয়েছি। সামান্য একটা ধাতুর রূপও মনে নেই। তবে রঘুর শ্লোক অনেক মুখস্থ আছে, যা যা ভাল লেগেছিল তাই কিছু কিছু মুখস্থ করেছিলাম, সেইগুলো ভুলিনি। তবে 'সহজ ভাষা যদি হয়, পড়লে মানেটা খানিকটা বুঝতে পারি। সে এমন কিছু হাতী-ঘোড়া নয়। উদ্ধব-

জ্যাঠা আবার তাই আপনাকে গিয়েছে বলতে—উদ্ধব-জ্যাঠার যা কাণ্ড!

বৈষ্ণব-ধর্ম্মের আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছে বটে, কিন্তু ও নিজে যেন কিছুই মানে না—এই ভাবের। কখনও কোনও পূজা-অর্চ্চনা ওকে করতে দেখি নি, এক ওর বাবার বিষ্ণুমন্দিরে প্রদীপ দেখানো ছাড়া। আখড়ায় প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের পূজার যোগাড় করে উদ্ধব নিজে, মালতীকে সেদিকে বড় একটা ঘেঁষতে দেখি নি। তা ব'লে ওর মন ওর বাপের মত সংস্কার-মুক্তও নয়। ছোটখাটো বাছ-বিচার এত মানে যে, আখড়ার লোকে অতিষ্ঠ। সন্ধ্যাবেলা ঝিঙে তুলেছিল ব'লে একটি বাবাজীকে মালতীর কাছে কড়া কথা শুনতে হয়েছিল। ছোঁয়া-ছুঁয়ির বালাই বড়-একটা নেই—মুচির ছেলেকেও ঘরের দাওয়ায় বসিয়ে খাওয়াচ্ছে, কাওড়া পাড়ায় অসুখ হলে সাবু ক'রে নিয়ে গিয়ে নিজের হাতে খাইয়ে আসতে দেখেছি।

একদিন বিকেলে আখড়ার সামনে মাঠে পাঠশালা করছি, মালতী এসে বললে—দিন আজ ওদের ছুটি। আসুন একটা জিনিস দেখিয়ে আনি।

আখড়ার পাশে ছোট একটা মাঠ পেরিয়ে একটা রাঙা মাটির টিলা। তার ওপর শাল-পলাশের বন—টিলার নীচে ঘন বনসিদ্ধির জঙ্গল। টিলার ওপারে পলাশবনের আড়ালে একটা ছোট মন্দির। মালতী বললে—এই দেখাতে আনলাম আপনাকে। নন্দিকেশ্বর শিবের মন্দির—বড় জাগ্রত ঠাকুর—খৃষ্টান হ'লেও মাথাটা নোয়ান—দোষ হবে না।

মন্দিরের পূজারী দু'খানা বাতাসা দিয়ে আমাদের জল দিলে। সে উড়িয়ার ব্রাহ্মণ, উপাধি মহান্তি, বহুকাল এদেশে আছে, বাংলা জানে ভাল। মালতীকে ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছে।

তারপর আমরা তিনজনেই মন্দিরের পশ্চিম দিকের রোয়াকে বসলুম। মালতী বললে—মহান্তি কাকা, বলুন তো এই মন্দির-প্রতিষ্ঠার কথাটা এঁকে। ইনি আবার খৃষ্টান কিনা, ওসব মানেন না।

আমি বললুম—আঃ, কেন বাজে বকছ মালতী? কি মানি না-মানি—মানে প্রত্যেক মানুষের—

মালতী আমার কথাটা শেষ করতে দিলে না। বললে—আপনার বক্তৃতা রাখুন। শুনুন, এটা খুব আশ্চর্য্য কথা—বলুন তো মহান্তি-কাকা?

মহান্তি বললে—এইখানে আগে গোয়ালাদের বাগান ছিল, বছর-পঞ্চাশ আগেকার কথা। রোজ তাদের দুধ চুরি যেত। দু-তিনটে গরু সকালে একদম দুধ দিত না। একদিন তারা রাত জেগে রইল। গভীর নিষুতি রাতে দেখে টিলার নীচের ওই বনসিদ্ধির জঙ্গল থেকে কে এক ছোকরা বার হয়ে গরুর বাঁটে মুখ দিয়ে দুধ খাচ্ছে। যে-সব গরু বাছুর ভিন্ন পানায় না, তারাও বেশ দুধ দিচ্ছে। ছোকরার রূপ দেখে ওরা কি জানি কি বুঝলে, কোন গোলমাল করলে না; ছোকরাও দুধ খেয়ে ওই জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ল। পরের দিন সকালে বনে খোঁজ ক'রে দেখে কিছুই না। খুঁজতে খুঁজতে এক শিবলিঙ্গ পাওয়া গেল। ওই যে শিবলিঙ্গ দেখছেন মন্দিরের মধ্যে। মাঘ মাসে মেলা হয়—ভারি জাগ্রত ঠাকুর।

মালতী গর্ব্বের দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বললে—শুনলেন পাদ্রিমশাই? মানেন না যে বড় কিছু?

আমি বললাম—আমি বেড়াতে বেড়াতে অনেক জায়গায় এ-রকম দেখেছি। কত গাঁয়ে প্রাচীন বটতলায় নুড়ি, ষষ্ঠীদেবী, ওলাদেবী, কালিমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠার মূলে এই ধরনের প্রবাদ আছে। লোকে কত দূর থেকে এসে পুজো দেয়, তাদের মধ্যে সত্যিকার ভক্তি দেখেছি। এক

পাড়াগাঁয়ের বোষ্টমের আখড়ায় একখানা পাথর দেখেছিলাম—তার ওপরে পায়ের চিহ্ন খোদাই করা, আখড়ার অধিকারী পয়সার লোভে যাত্রীদের বলতো ওটা খোদ শ্রীকৃষ্ণের পায়ের দাগ, সে বৃন্দাবন থেকে সংগ্রহ ক'রে এনেছে পাথরখানা। আমি দেখেছি একটি তরুণী ভক্তিমতী পল্লীবধূকে চোখের জলে আকুল হয়ে পাথরটা গঙ্গাজলে ধুয়ে নিজের মাথার লম্বা চুল দিয়ে মুছিয়ে দিতে। কি জানি কোথায় পৌঁছল ওর প্রণাম। কোন্ ঊর্দ্ধমূল অধোশাখ দেবতা ওর সেবা গ্রহণ করতে সেদিন বাড়িয়ে দিয়েছিলেন তাঁর বহুপল্লবিত বাহু?

কি অপূর্ব্ব সূর্য্যাস্ত হচ্ছে বিশাল পশ্চিম দিগন্তে! দূরের তালগাছের মাথাগুলো যেন বাঁধাকপির মত ছোট দেখাচ্ছে, গুঁড়িগুলো দেখাচ্ছে যেন সরু সরু নলখাগড়ার ডাঁটা—আর তার ওপরকার নীলাকাশে রঙীন মেঘলোকে পিঙ্গলবর্ণের পাহাড়, সমুদ্র, কোন্ স্বপ্নসাগরের অজানা বেলাভূমি।···পায়ের নীচের মাটি সারাদিন রোদে পুড়েছে—বাতাসে তারই সুগন্ধ।

মালতী বললে—বিষ্ণুমন্দিরে সাঁজ জ্বলে নি এখনও। প্রদীপ দিইগে চলুন—

সেখানে ওর বাবার মন্দিরে প্রদীপ দেওয়া হয়ে গেল। আমি পুকুরপাড়ের তেঁতুলগাছের যোটা শেকড়ে বসলুম, ও দাঁড়িয়ে রইল। বললাম—আমায় তুমি যে খৃষ্টান বল, তুমি আমার কথা কিছু জান না। তার পর ওকে আমার বাল্যজীবন, মিসনারী মেমদের কথা, আমাদের দারিদ্র্য, মা, সীতা ও দাদার কথা সব বললাম। বিশেষ ক'রে উল্লেখ করলাম আমার সেই দৃষ্টিশক্তির কথাটা—যা এখন হারিয়েছি। ছেলেবেলার ঘটনা আমার এখন আর তেমন মনে নেই—তবুও বললাম যা মনে ছিল—যেমন চা-বাগানের দু-একটা ঘটনা, বাল্যে পানীর মৃত্যু-দিনের ব্যাপার, হীরু রায়ের মৃত্যুর কথা, মেজবাবুর পুত্রসন্তান হওয়া সংক্রান্ত ব্যাপার।

বললাম—যীশুখৃষ্টকে ভাক্ত করি ব'লে অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করেছি জীবনে। কিন্তু সে আমার দোষ নয়, ছেলেবেলার শিক্ষা। ওই আবহাওয়াতে মানুষ হয়েছিলাম। আমি এখনও তাঁর ভক্ত। তুমি তাঁর কথা কিছু জান না—বুদ্ধ চৈতন্য যেমনি মহাপুরুষ, তিনিও তেমনি। মহাপুরুষদের কি জাত আছে মালতী? কর আদায় করতো লেভি, ইহুদীসমাজে সে ছিল নীচ, পতিত, সমাজের ঘৃণ্য। সবাই তাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে চলে যেত। যীশু তাকে বললেন—লেভি, তুমি নীচ কে বলে? তুমি ভগবানের সন্তান। লেভি আনন্দে কেঁদে ফেললে। সমাজের যত হেয় লোককে তিনি কোল দিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে বেশ্যা ছিল, জালজীবী ছিল, কুষ্ঠী ছিল। তাঁকে সবাই বলতো পাগল, ধর্ম্মহীন, আচারভ্রষ্ট। তাঁর বাপ, মা, ভাই আপনার জনও তাঁকে বলতো পাগল—তারা জানতো না ঈশ্বরকে যে জেনেছে, তার বাইরের আচারের প্রয়োজন নেই। তাঁর ধর্ম্ম সেবার ধর্ম্ম।

তার পর আমি ওকে সেদিনকার অভিজ্ঞতার কথা বললাম। পুকুরের ওপারে দূরবিসর্পিত আকাশের দিকে চোখ রেখে আমার মনে এল যে রাঢ়দেশের এই সীমাহীন রাঙামাটির মাঠের মধ্যে সেদিন আমি অন্য এক দেবতার স্বপ্ন দেখেছি। সে কি বিরাট রূপ! ওই রাঙা গোধূলির মেঘে, বর্ণে, আকাশে তাঁর ছবি। তাঁর আসন সর্ব্বত্র—তালের সারিতে, তমাল-নিকুঞ্জে, পুকুরে-ফোটা মৃণালদলে, দুঃখে শোকে, মানুষের মুখের লাবণ্যে, শিশুর হাসিতে···সে এক অদ্ভুত দেবতা! কিন্তু কতটুকুই বা সে অনুভূতি হ'ল! যেমন আসা অমনি মিলিয়ে যাওয়া!···

মালতী, আগেই বলেছি, অদ্ভুত শ্রোতা। সে কি একান্ত মনোযোগের সঙ্গে শুনলে যখন আমি বকে গেলুম! চুপ ক'রে রইল অনেকক্ষণ, যেন কি ভাবছে।

তারপর হঠাৎ বললে—আচ্ছা, আপনাকে একটা কথা বলি। প্রেম ও সেবার ধর্ম্ম কি শুধু যীশুখৃষ্টের দেওয়া? আমাদের দেশে ওসব বুঝি বলে নি? আমাদের আখড়ায় লোচনদাস

বাবাজী ছিলেন, ঠ্যাং-ভাঙা কুকুর পথ থেকে বুকে ক'রে তুলে আনতেন। একবার একটা ষাঁড়ের শিং ভেঙে গিয়েছিল, ঘায়ে পোকা থুক্ থুক্ করছে, গন্ধে কাছে যাওয়া যায় না। লোচনজ্যাঠা তাকে জোর ক'রে পেড়ে ফেলে ঘা থেকে লম্বা লম্বা পোকা বার ক'রে ফিনাইল দিয়ে দিতেন ন্যাকড়া ক'রে। তাতেই এক মাস পরে ঘা সারলো।

—এ-সব কথা বলার দরকার করে না, মালতী। আমি তোমাকে বলেছি তো ধর্ম্মের দেশকাল নেই, মহাপুরুষদের জাত নেই। যখন শুনি তোমার বাবা গরিব প্রতিবেশীদের মেয়ের বিয়েতে নিজের বাড়ি থেকে দানসামগ্রীর বাসন বার ক'রে দিতেন—দিতে দিতে পৈতৃক আমলের বাসনের বড় সিন্দুক খালি ক'রে ফেলেছিলেন—তখনই আমি বুঝেছি ভগবান সব দেশেই অদৃশ্যলোক থেকে তাঁর বাণী প্রচার করেছেন, কোন বিশেষ দেশ বা জাতের ওপর তাঁর পক্ষপাত নেই। মানুষের বুকের মধ্যে বসে তিনি কথা কন, আর যার কান আছে, সে শুনতে পায়।

ওর বাবার কথায় ওর চোখে জল ভরে এল। অন্যমনস্ক হয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রইল। দেখেছি মালতী শুষ্ক চোখে কখনও ওর বাপের কথা শুনতে পারে না। সন্ধ্যা হয়েছে। উঠছি এমন সময় তমালছায়ায় বিষ্ণুমন্দিরের দিকে আর একবার চোখ পড়তেই আমাদের গ্রামের পুকুরপাড়ের বটতলার সেই হাডভাঙা পরিত্যক্ত সুন্দর বিষ্ণুমূর্ত্তির কথা আমার কেমন ক'রে মনে এল। মনে এল ছেলেবেলায় সীতা আর আমি কত ফুলের মালা গেঁথে মূর্ত্তির গলায় পরিয়েছি—তার পর কতদিন সেদিকে যাই নি, কি জানি মূর্ত্তিটার আজকাল কি দশা হয়েছে, সেইখানে আছে কিনা? কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেলুম যেন, মালতী কি একটা কথা বললে তা আমার কানেই গেল না ভাল ক'রে। বা রে, পুকুরপাড়ের সে ভাঙা দেবমূর্ত্তির সঙ্গে আমার কিসের সম্পর্ক?

বিষ্ণুমন্দির থেকে দু'জনে যখন ফিরছি, আখড়ায় তখন আরতি আরম্ভ হয়েছে। দিগন্ত-প্রসারী মাঠের প্রান্তে গাছপালার অন্তরালবর্ত্তী এই নিভৃত ছোট দেবালয়টির সন্ধ্যারতি প্রতি-দিনই আমায় কেমন একটা অপূর্ব্ব ভাবে অনুপ্রাণিত করত—আজ কিন্তু আমার আনন্দ যেন হাজার গুণে বেড়ে গেল। তার ওপর আজ একজন পথিক বৈষ্ণব জীবগোস্বামীর সংস্কৃত পদাবলী একতারায় অতি সুস্বরে গাইলে—আমার মানসবৃন্দাবনের বংশীবটমূলে কিশোর হরি চিরকাল বাঁশী বাজান, আমার প্রাণের গোষ্ঠে তাঁর ধেনুদল চরে; সেখানে তাঁর খেলাধুলো চলে রাখালবালকদের নিয়ে দীর্ঘ সারাদিন, দীর্ঘ সারারাত।

কেন এত আনন্দ আমার মনে এল কে বলবে? আমি যেন অন্য জন্ম গ্রহণ করেছি। ঘুম আর আসে না—সে গভীর রাত্রে তমালশাখার আড়ালে চাঁদ অস্ত গেলে আমি আখড়ার সামনের মাঠে গাছের তলায় এসে বসলুম।

আকাশের অন্ধকার দূর করেছে শুধু জলজ্বলে শুকতারার আলোয়। কে জানে হয়ত ওই শুকতারার দেশের নদীতীরে, জ্যোৎস্নামাখা বনপ্রান্তরে, উপবনে মৃত্যুহীন জরাহীন দেবকন্যারা মন্দারবীথির ঘন ছায়ায় প্রণয়ীজনের সঙ্গে গোপন মিলনে সারারাত্রি কাটায়···তৃপ্তিহীন অমর প্রেম তাদের চোখের জ্যোৎস্নায় জেগে থাকে, লজ্জাভরা হাসিতে ধরা দেয়। পীত সূর্য্যাস্তের আলোয় করুণ সুর বহুদূরের শূন্য বেয়ে সেখানে ভেসে এসে সান্ধ্য আকাশকে আরও মধুর ক'রে তোলে—কোথা থেকে সে সুর আসে কেউ জানে না···কেউ বলে বহু দূরের কোন নক্ষত্রলোকে এক বিরহী দেবতা একা বসে বসে এমনি তাঁর বীণা বাজান, সেই সুর ভেসে আসে প্রতি সন্ধ্যায় ···ঠিক কেউ বলতে পারে না···কেবল আধ-আলো আধ-ছায়ার পুষ্পবীথিতে লুকিয়ে সুখী

প্রেমিক-প্রেমিকা হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে···তাদের চোখে অকারণে জল এসে পড়ে···অবাক হয়ে তারা পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

হঠাৎ আমার সামনে অস্পষ্ট অন্ধকারে একজন তরুণ যুবক হাসিমুখে এসে দাঁড়িয়ে বললে—এস আমার সঙ্গে—

তার গেরুয়া উত্তরীয় আমার গায়ে এসে পড়ছে উড়ে। আমি বলি—কোথায় যাব? কে আপনি?

নবীন বৈষ্ণব বললে—আমি জীবগোস্বামী—আমারই পদাবলী তুমি সন্দেবেলা শুনেচ যে। এত শীগ্‌গির ভুলে যাও কেন হে ছোক্‌রা? এস আমি বৃন্দাবনে যাব। শ্রীকৃষ্ণকে আমার পাওয়া চাই।

—আপনি তো মারা গিয়েছেন আজ তিন-শো বছরের ওপর। আপনি আবার কোথায়?

—পাগল! কে বললে আমি মরেছি। আর মলেই কি আমার যাওয়া ফুরিয়েছে নাকি? এসো···এসো—আমি সংসার ছেড়েছি, সব ছেড়েছি, তাঁর জন্যে। দেখছ না পাগল হয়ে পথে পথে বেড়াচ্ছি?

এমন ভাবে কথাগুলো সে বললে আমি যেন শিউরে উঠলুম। বললাম—তা তো দেখতে পাচ্ছি, পাগলের আর বাকী কি? আপনি যান, আমি যীশুখৃষ্টের ভক্ত, আমি বৃন্দাবনে যাব না। তাছাড়া মালতীকে ফেলে এক পা-ও এখান থেকে নড়ছি নে আমি।

তরুণ বাউল হেসে একতারা বাজাতে বাজাতে চলে গেল—পথের মাঝে নাচতে নাচতে গাইতে গাইতে যেতে যেতে দূরের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল···অন্ধকারের মধ্যে থেকে তার গলার মিষ্টি সুর তখনও যেন ভেসে আসছে···

মধু রিপুরূপমুদারম্‌
মধু রিপুরূপমুদারম্‌
সুখদং সুখদং ভবসারম্‌

হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল। গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে শেষ রাতের ঠাণ্ডায় কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম কে জানে—শিশিরে কাপড়-চোপড় ভিজে গিয়েছে। ফরসা হবার আর দেরি নেই।

॥ ১২ ॥

দেখতে দেখতে এখানে ছ-সাত মাস হয়ে গেল। এখানে সময় কাটে কোথা দিয়ে বুঝতে পারি নে। সকালে আখড়ার কাজ করি, বিকেলে গোটাকতক ছেলে নিয়ে একটা পাঠশালা করি, তাতে যা পাই উদ্ধব বাবাজীর হাতে তুলে দিই। একদিন মালতী আমায় বললে—ছেলে পড়িয়ে যা পান, তা আপনি উদ্ধব-জ্যাঠার হাতে দেন কেন? থাকা-খাওয়ার দরুন টাকা নেওয়া তো এখানে নিয়ম নেই, ও-টাকা আপনি নিজে রেখে দেবেন, আপনারও তো নিজের টাকার দরকার আছে। আমি বললাম—তা কি ক'রে হয় মালতী, আমি এমনি খেতে পারি নে। আর আমি তো খাওয়া থাকা ব'লে টাকা দিই নে, বিগ্রহের সেবার জন্যে দিই। এতে দোষ কি?

সেদিন মালতী আর কিছু বললে না। দিন-চারেক পরে আবার এক দিন ওই কথাই তুললে। টাকা আমি কেন দিই? আখড়া তো হোটেলখানা নয় যে এখানে টাকা দিয়ে খেতে হবে? ওতে তার মনে বাধে। তা ছাড়া আমার তো টাকার দরকার আছে। আমি তাকে

বুঝিয়ে বলি, টাকা না দিতে দিলে আমার এখানে থাকা হবে না। চলে যেতে হবে।

সেদিন থেকে মালতী এ নিয়ে আর কিছু বলে নি।

পাড়াগাঁয়ের দিনগুলো অদ্ভুত কাটে।—দীঘির পাড়ে রাঙামাটির উঁচু বাঁধে এ-সময়ে এক-রকম ফুল ফোটে, ছায়া প'ড়ে এলে মাঝে মাঝে একা গিয়ে বসি। বাগ্‌দীদের মেয়েরা হাঁটু পর্য্যন্ত কাপড় তুলে মাছ ধরে, আখড়ার গোয়াল থেকে সাঁজালের ধোঁয়া ঘুরে ঘুরে ওঠে—তালের দীর্ঘসারির ফাঁক দিয়ে এই সন্ধ্যায় কতদূর দেখতে পাই—দাদার দোকান, দাদার বাতাসার কারখানা, সীতার শ্বশুরবাড়ি, তুষারাবৃত কাঞ্চনজঙ্ঘা, নিমচাঁদের বৌ, শৈলদি।...

মালতীর স্বভাব কি মধুর! কি খাটুনিটা খাটে আখড়ায়—এক দিন উঁচু কথা শুনি নি ওর মুখে—কারও ওপর রাগ দেখি নি—বাপের মেয়ে বটে!

আখড়ায় ছোট একটা অশ্বত্থ-চারা আছে, উদ্ধব দাস রোজ স্নান ক'রে এসে গাছটা প্রদক্ষিণ করে, গাছটাকে জল দেয়। এ তার রোজ করাই চাই। একদিন মালতীকে ডেকে বলি—তোমার উদ্ধব-জ্যাঠা পাগল নাকি? ও-গাছটার চারিপাশে ঘোরার মানে কি? মালতী বললে—কেন ঘুরবে না; সবাই তো আর আপনার মত নাস্তিক না। অশ্বত্থগাছ নারায়ণ—ওর সেবা করলে নারায়ণের সেবা করা হয়—জানেন কিছু?

আমি বললুম—তা'হলে তুমিও সেবাটা শুরু ক'রে পুণ্যি কিছু ক'রে নাও না সময় থাকতে?

মালতী শাসনের সুরে বললে—আচ্ছা আচ্ছা, থাক্‌। আপনি ও-রকম পরের জিনিস নিয়ে টিটকিরি দেন কেন? ওদের ওই ভাল লাগে, করে। আপনার ভাল লাগে না, করবেন না। তা নয়, সারাদিন কেবল এর খুঁত ওর খুঁত—ছিঃ, আপনার এ স্বভাব সারবে কবে?

বললাম—তোমার মত উপদেশ দেওয়ার মানুষের দেখা পেতাম যদি তা'হলে এত দিন কি আর স্বভাব সারে না? তা সবই অদৃষ্ট!

কথা শেষ ক'রে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতেই মালতী রাগ ক'রে আমার সামনে থেকে উঠে গেল।

বিকেলে কিন্তু ওকে আমার কাছেই আসতে হ'ল আবার। নিকটে নকাশিপাড়া গাঁয়ে একটা যাত্রার দল ছিল, তাদের অধিকারী এসে উদ্ধব দাসকে বলে—বাবাজী, তিন মাস ব'সে আছি, বায়না-পত্তর একদম বন্ধ। দল তো আর চলে না। কাল্‌না থেকে ভাল বাজিয়ে এনেছিলাম—ঢোলকে যখন হাত দেবে, আঃ, যেন মেঘ ডাকচে, বাবাজী! তা আপনাদের আখড়ায় এক দিন শ্যামসুন্দরজীউকে শুনিয়ে দিই। কিছু খরচ দিতে হবে না, তেল তামাক আর কিছু জলখাবার—

—জলখাবার-টাবার হবে না পাল-মশায়। তা ছাড়া আসর-খাটানো ওসব কে করে? এখন থাক্‌।

মালতী আমায় এসে বললে—উদ্ধব-জ্যাঠাকে বলুন, যাতে যাত্রাটা হয়। আমি জলখাবার দেব, জ্যাঠাকে সেজন্যে ভাবতে হবে না। আপনাকে কিন্তু আসরের ভার নিতে হবে।

আমি বললাম—আমার দ্বারা ওসব হবে না। আমি পারব না।

মালতী মিনতির সুরে বললে—লক্ষ্মীটি, নিতেই হবে। যাত্রা যে আমি কতকাল শুনি নি! দেশের দলটা উৎসাহ না পেলে নষ্ট হয়ে যাবে। আপনি আসরের ভার নিলেই আমি ওদের ব'লে পাঠাই।

—না, আমি পারবো না, সোজা কথা। তুমি ওবেলা ও-রকম রাগ ক'রে চলে গেলে কেন?

—তাই রাগ হয়েছে বুঝি? কথায় কথায় রাগ।

—রাগ জিনিসটা তোমার একচেটে যে! আর কারও কি রাগ হ'তে আছে?

—আচ্ছা, আমি আর কখনও ও-রকম করব না। আপনি বলুন ওদের, কেমন তো?

যাত্রা হয়ে গেল—মালতী ওদের ছানা খাওয়ালে পেট ভ'রে। বললে—বাবা রাস্তা থেকে লোক ডেকে এনে খাওয়াতেন আর আমরা মুখ ফুটে যারা খেতে চাইছে, তাদের খাওয়াব না? দলে ছোট ছোট ছেলেরা আছে, রাগ জেগে চেঁচিয়ে শুধু-মুখে ফিরে যাবে, এ কখনও হয়?

মালতী অনেক বৈষ্ণব-গ্রন্থ পড়েছে। সময় পেলেই বিকেলে আমার কাছে বই নিয়ে আসে, দু'জনে পুকুরপাড়ে গাছের ছায়ায় গিয়ে বসি। আমার হয়েছে কি, সব সময় ওকে পেতে ইচ্ছে করে, নানা কথাবার্তায় ছল-ছুতোয় ওকে বেশীক্ষণ কাছে রাখতে ইচ্ছে করে। কিন্তু বিকেলের দিকে ছাড়া সারাদিন ওর দেখা পাওয়া ভার। ওর কাছে বুদ্ধের কথা বলি, সেণ্ট্ ফ্রান্সিসের কথা বলি। ও আমাকে শ্রীচৈতন্যের কথা, শ্রীকৃষ্ণের কথা শোনায়।

এক দিন হঠাৎ আবিষ্কার করা গেল মালতী বই লেখে। কি কাজে পুকুরের ঘাটে গিয়েছি দুপুরের পরে, দেখি বাঁধানো সিঁড়ির ওপর জামগাছের ছায়ায় একখানা খাতা পড়ে আছে—পাশেই দোয়াত কলম—খাতাখানা উল্টে দেখি মালতীর হাতের লেখা। এখানে ব'সে লিখতে লিখতে হঠাৎ উঠে গিয়েছে। অত্যন্ত কৌতূহল হ'ল—না দেখে পারলাম না, প্রথমেই ওর গোটা গোটা মুক্তার ছাঁদে একটা সংস্কৃত শ্লোক লেখা :—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ

*   *   *

সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ

তার পরে রাধাকৃষ্ণের লীলা-বর্ণনা, বৃন্দাবনের প্রকৃতি বর্ণনা মাঝে মাঝে। খাতার ওপরে লেখা আছে—"পাষণ্ডদলন-গ্রন্থের অনুকরণে লিখিত।"

দেখছি এমন সময় মালতী কোথা থেকে ফিরে এসে আমার হাতে খাতা দেখে মহাব্যস্ত হয়ে বললে—ও কি? ও দেখছেন কেন? দিন আমার খাতা—

আমি অপ্রতিভ হয়ে বললাম—এইখানে পড়ে ছিল, তাই দেখছিলাম কার খাতা—

—না, দিন—ও দেখবার জো নেই।

—যখন দেখে ফেলেছি তখন তার চারা নেই। কে জানতো তুমি কবি! এ শ্লোকটা কিসের?

মালতী সলজ্জ স্বরে বললে—চৈতন্যচরিতামৃতের। কেন দেখছেন, দিন—

—শোনো মালতী—লিখেছ এ বেশ ভাল কথাই। কিন্তু তোমার এ লেখা সেকেলে ধরনের। পাষণ্ডদলনের অনুকরণে বই লিখলে একালে কে পড়বে? তুমি আজকালকার কবিতার বই কিছু পড় নি বোধ হয়?

মালতী আগ্রহের সুরে বললে—কোথায় পাওয়া যায়, আমায় দেবেন আনিয়ে! আমি তো জানি নে আজকালকার কবিতার কি বই আছে—আনিয়ে দেবেন। আমি দাম দেবো।

দাম দেওয়ার কথা বলাতে আমার মনে ঘা লাগল। মালতী কাছে থেকেও যেন দূরে। বড় অদ্ভুত ধরনের মেয়ে, ও একালেরও নয়, সেকালেরও নয়। এই পাড়াগাঁয়ে মানুষ হয়েছে, যেখানে কোন আধুনিকতার ঢেউ এসে পৌঁছয় নি, কিন্তু বুদ্ধিমতী এমন যে আধুনিকতাকে বুঝতে ওর দেরি হয় না। এমন সুন্দর চা করে, শ্রীরামপুরের শৈলদিরা অমন চা করতে পারত না। নিজে মাছমাংস খায় না কিন্তু আমার জন্যে এক দিন মাংস রাঁধলে রান্নাঘরের উনুনেই। আমায় প্রায়ই বলে—আপনার যখন যা খেতে ইচ্ছে হবে বলবেন। আপনি তো আর বৈষ্ণব হন নি যে মাছমাংস খাবেন না! আমায় বলবেন, আমি রেঁধে দেব এখন।

মালতী উজ্জ্বল শ্যামাঙ্গী বটে, কিন্তু বেশ সুশ্রী। ওর টান ক'রে বাঁধা চুল ও ছেলেমানুষের মত মুখশ্রীর একটা নবীন, সতেজ সুকুমার লাবণ্য—বিশেষ ক'রে যখন মুখে ওর বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দেয়, কিংবা একটা অদ্ভুত ভঙ্গীতে মুখ উঁচু ক'রে হাসে—তখন সে বিজয়িনী, তখন সে পুরুষের সমস্ত দেহ, আত্মাকে সুন্দরী মৎস্যনারীর মত মুগ্ধ ক'রে কূলের কাছের অগভীর জল থেকে টেনে বহুদূরের অথৈ জলে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু ওর সে-রূপ যখন-তখন দেখা যায় না। কালেভদ্রে দৈবাৎ হয়ত একবার চোখে পড়তে পারে। আমি একবার মাত্র দেখছিলুম।

সেদিন সন্ধ্যার পরে সারাদিন খররৌদ্র ও গুমটের পরে উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে মেঘ উঠে সারা আকাশ জুড়ে ফেললে এবং হঠাৎ ভীষণ ঝড় উঠল। আখড়ার বাইরের মাঠে কাঠ, ধান, ছোলা, তুলো সব রোদে দেওয়া ছিল। কেউ তোলে নি, আখড়ায় আবার ঠিক সেই সন্ধ্যার সময়টাতে লোকজন কেউ নেই। আমিও ছিলাম না। মাঠের মধ্যে বেড়াচ্ছিলাম—ঝড় উঠতেই ছুটে এসে দেখি মালতী একা মহাব্যস্ত অবস্থায় জিনিসপত্র তুলছে। আমায় দেখে বললে—দৌড়ে আলোটা জ্বেলে আনুন, অন্ধকারে কিছু কি ছাই টের পাচ্ছি—সব উড়ে গেল—

সঙ্গে সঙ্গে এল বৃষ্টি ··

ওকে দেখলাম নতুন চোখে। কোমরে কাপড় জড়িয়ে সে একবার এখানে একবার ওখানে বিদ্যুতের বেগে ছুটোছুটি করতে লাগল—অদ্ভুত কাজ করবার শক্তি—দেখতে দেখতে সেই ঘোর অন্ধকার আর ঝড়বৃষ্টির মধ্যে ক্ষিপ্র নিপুণতার সঙ্গে অর্দ্ধেক জিনিস তুলে দাওয়ায় নিয়ে এসে ফেললে। এদিকে আমি অন্ধকারে দেশলাই খুঁজে পাচ্ছি নে দেখে ছুটে এসে বললে—কোথায় দেশলাই রেখেছিলেন মনে আছে? কোথা থেকে হাতড়ে দেশলাই বার করলে—তার পরে সেই ঝড়ের ঝাপটার মধ্যে আলো জ্বালা—সে এক কাণ্ড! অন্ধকারে দুজনে মিলে অনেক চেষ্টার পরে শেষে ওরই ক্ষিপ্রতা ও কৌশলে আলো জ্বলল।

আলো জ্বেলে আমার হাতে দেশলাই দিয়ে আমার মুখের অসহায় ভঙ্গীর দিকে চেয়ে গলা কেমন এক ধরনের উঁচু ক'রে হেসে উঠল—ছুটোছুটির ফলে কানের পাশের চুল আলুথালু হয়ে মুখের দু-পাশে পড়েছে, ফুল্ল শ্রমোজ্জ্বল গণ্ডদেশে বিন্দু বিন্দু ঘাম। চোখে উজ্জ্বল কৌতুকের হাসি—দুজনে মিলে আলো ধরাচ্ছি, ওর মুখ আমার মুখের অত্যন্ত কাছে—সেই মুহূর্ত্তে আমি ওর দিকে চাইলাম—আমার মনে হ'ল মালতীকে এতদিন ঠিক দেখি নি, আমি ওকে নতুন রূপে দেখলাম, ওর বিজয়িনী নারী রূপে। মনে হ'ল মালতী সত্যিই সুন্দরী, অপূর্ব্ব সুন্দরী। —কিন্তু বেশীক্ষণ দেখার অবকাশ পেলাম না ওর সে রূপ। আলো জ্বেলেই ও আবার ছুটল এবং আমার আনাড়ি-সাহায্যের অপেক্ষা না ক'রেই বাকী জিনিস আধ-ভেজা, আধ-শুকনো অবস্থায় অল্প সময়ের মধ্যে দাওয়ায় এনে জড় করলে।···

এক দিন পুকুরে সকালের দিকে ঘড়া বুকে দিয়ে সাঁতার দিতে দিতে মালতী গিয়ে পড়েছে গভীর জলে। সেই সময় আমিও জলে নেমেছি। আমি জানতাম না যে ও এ-সময়ে নাইতে এসেছে, কারণ সাধারণতঃ ও স্নান করে অনেক বেলায়, আখড়ার কাজকর্ম্ম মিটিয়ে। নাইতে নাইতে একটা অস্পষ্ট শব্দ শুনে চেয়ে দেখি মালতী নেই, তার ঘড়াও নেই। আমি প্রথমে ভাবলাম মাঝপুকুরে ইচ্ছে ক'রে ডুব দিয়েছে বোধ হয়। বিশেষতঃ সে সাঁতার জানে—কিন্তু খানিক পরে যখন ও উঠল না, তখন আমার ভয় হ'ল, আমি তাড়াতাড়ি সেখানটাতে সাঁতার দিয়ে গেলাম, হাতড়ে দেখি মালতী নেই, ডুব দিয়ে এদিক-ওদিক খুঁজতে খুঁজতে ওকে পেলাম —চুলে কাপড় জড়িয়ে গিয়েছে কেমন বেকায়দায়, অতি কষ্টে তাকে ভাসিয়ে নিজে ডুবে জল

খেতে খেতে ডাঙার কাছে নিয়ে এলুম। মালতী তখন অৰ্দ্ধ-অচৈতন্য, আমার ডাক শুনে আখড়া থেকে সবাই ছুটে এল—মিনিট পাঁচ-ছয় পরে ওর শরীর সুস্থ হ'ল। উদ্ধব বাবাজী বকলে, আমি বকলাম, সবাই বকলে।

এই দিনটা থেকে ওর ওপর আমার একটা কি যেন মায়া পড়ে গেল। সেদিন সন্ধ্যাবেলা কেবলই মনে হতে লাগল ও এখানে নিঃসহায়, একেবারে একা। ও সবার জন্যে খেটে মরে। ওর বাপের ধানের জমির উপস্বত্ব আখড়াসুদ্ধ বৈষ্ণব বাবাজীরা ভোগ করছে, কিন্তু ওর মুখের দিকে চাইবার কেউ নেই। ও সকলের ময়লা জামাকাপড় কেচে বেড়াবে, ভাত রেঁধে খাওয়াবে—সর্ব্বরকমে সেবা করবে, ওকে ছেলেমানুষ পেয়ে সবাই ওকে মুখের মিষ্টি তোষামোদে নাচিয়ে নিজেদের স্বার্থ ষোল আনার ওপর সতের আনা বজায় রাখছে, কিন্তু ওর সুখদুঃখ কেউ দেখছে? এই যে আজ পুকুরের ঘাটে ডুবে মরে যাচ্ছিল আর একটু হলে—আমি যদি না থাকতাম!

ভগবান আমাকে এ কিসের মধ্যে এনে ফেললেন, এ কি জালে দিন-দিন জড়িয়ে পড়ছি আমি! এদের আখড়াতে যে বিগ্রহ আছেন, তাঁকে এরা মানুষের মত সেবা করে। সকালবেলা তাঁকে বাল্যভোগ দেওয়া হয়, দুপুরের ভোগ তো আছেই। ভোগের পর দুপুরে বিগ্রহকে খাটে শুইয়ে মশারি টাঙিয়ে দেওয়া হয়। বৈকালে বৈকালিক ভোগ দেওয়া হয়—ফল, মিষ্টান্ন। রাত্রে আবার খাটে শুইয়ে মশারি টাঙিয়ে দেয়—শীতের রাত্রে বিগ্রহের গায়ে লেপ, আশেপাশে বালিশ। উদ্ধবদাস বাবাজী সেদিন লাল শালু কাপড়ের ভাল লেপ করে এনেচে বিগ্রহের ব্যবহারের জন্যে—আগের লেপটা অব্যবহার্য্য হয়ে গিয়েছিল।

এ-সব পুতুল-খেলা দেখলে আমার হাসি পায়। সেদিন সন্ধ্যার সময় একা পেয়ে মালতীকে বললাম—তোমাদের এতদিন হুঁশ ছিল না মালতী? ছেঁড়া লেপটা এই শীতে কি বলে দিতে ঠাকুরকে? যদি অসুখ-বিসুখ হ'ত, এই তেপান্তরের মাঠে না ডাক্তার, না কবিরাজ, দেখত কে তখন? ছিঃ ছিঃ, কি কাণ্ড তোমাদের?

মালতী রাগে মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল। ও এ-সব কথা আর কাউকে ব'লে দেয় না ভাগ্যে, নইলে উদ্ধবদাস আখড়া থেকে আমায় বিদেয় দিতে এক বেলাও দেরি করত না। অনেক কথা আমি বলি ওদের আখড়া সম্বন্ধে, উদ্ধবদাস সম্বন্ধে—যা অপরের কানে উঠলে আমায় অপমানিত হয়ে বিদায় হ'তে হ'ত, কিন্তু মালতী কোন কথা প্রকাশ করে নি কোনদিন। আজকাল মালতী আমার দিকে একটু টেনে চলে বলে সেটা অনেকের চক্ষুশূলের ব্যাপার হয়ে উঠেছে—আমি তা বুঝি।

॥ ১৩ ॥

শ্রাবণ মাসের প্রথমে আমার পাঠশালা গেল উঠে। আর আমার এখানে শুধু-হাতে থাকা অসম্ভব। মালতীকে একদিন বললাম—শোন, আমি চলে যাচ্ছি মালতী—

সে অবাক হয়ে বললে—কেন চলে যাবেন?

—কতদিন এসেছি ভাবো তো এখানে? প্রায় দশ মাস হ'ল—

মালতী চুপ ক'রে থেকে বললে—ঘুরে আবার আসবেন কবে?

—ভগবান জানেন। না-ও আসতে পারি।

মালতীর মুখের স্বাভাবিক হাসি-হাসি ভাবটা যেন হঠাৎ নিবে গেল। বললে—কেন আসবেন না? আখড়ার কত কাজ বাকি আছে মনে নেই?

ওর মুখ দেখে আমার আবার মনে হ'ল,—ওর কেউ নেই, এখানে ও একেবারে একা। ওকে বুঝবার মানুষ এই গ্রাম্য অশিক্ষিত বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীদের মধ্যে কে আছে? আমার কাছেই ওর যা-কিছু অভিমান আবদার খাটে—ওর মধ্যে যে লীলাময়ী কিশোরী আছে, সে তার নারীত্বের দর্প, গর্ব্ব ও অভিমান প্রকাশ ক'রে সুখ পায় একমাত্র আমার কাছে—আমি তা জানি। তা ছাড়া, ও এখনও বালিকা, ওর ওপর আমার মনে কি যে একটা অনুকম্পা জাগে···ওকে সকল দুঃখ, বিপদ থেকে আড়াল ক'রে রাখি ইচ্ছা হয়। শ্রাবণ মাসে নীল মেঘের রাশি দ্বারবাসিনীর চারিধারের দিগন্তবিস্তৃত তালীবন-শোভা মাঠের ওপর দিয়ে উড়ে যায় রোজ···আমি দীঘির ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি, দেখে দেখে মনে কত কি অনির্দ্দিষ্ট অস্পষ্ট আকাঙ্ক্ষা জাগে—মনে হয় ছোট্ট কোন কলস্বনা গ্রাম্য নদীতীরে খড়ের ঘরে মালতীকে নিয়ে ছোট্ট সংসার পাতবো···আমরা দুজনে এমনি সব বর্ষা-মেদুর শ্রাবণ-দিনে ব'সে ব'সে কত কথা বলব, কত আলোচনা করব। ওকে রাঁধতে দেব না, কাজ করতে দেব না, আমার কাছ থেকে উঠতে দেব না—কত বিশ্বাসের কথা, ভক্তির কথা, জ্ঞানের কথা, সাধু-মোহন্তের কথা, আকাশের তারাদের কথা—ও আমায় বোঝাবে, আমি ওকে বোঝাবো।···কিন্তু তা হবার নয়। মালতী ওর বাপের আখড়া ছেড়ে কোথাও যেতে পারবে না—আমি অনেকবার ঘুরিয়ে প্রশ্ন ক'রে ওর মনের এ ইচ্ছা বুঝেছি। আমি ওকে চাই একান্ত আমার নিজস্ব-ভাবে—এখানে থাকলে ও দিনে রাতে কাজে এত ব্যস্ত থাকে যে ওকে সে-ভাবে পাওয়া অসম্ভব। এই আখড়াই হয়েছে ওর আর আমার মধ্যে ব্যবধান। আমি এখান থেকে ওকে নিয়ে যেতে চাই। আমিও এখানে থাকতে পারব না চিরকাল। মালতীকে ভালবাসি, কিন্তু ওকে বিবাহ ক'রে এই রাঢ়-অঞ্চলের এক গ্রাম্য আখড়ায় চিরকাল কি ক'রে কাটাবো বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী সেজে? আমি ওকে নিয়ে যাব এখান থেকে।

এক দিনের ব্যাপারে মালতীকে আরও ভাল ক'রে চিনলুম। দ্বারবাসিনী গ্রামের বৃদ্ধ শম্ভু বাঁড়ুয্যে চার-পাঁচ দিনের জ্বরে মারা গেলেন। তিনি এখানকার সমাজের কাছে একঘরে ছিলেন—এটা আমি আগেই জানতাম। তাঁর একমাত্র বিধবা কন্যাকে নিয়ে কি-সব কথা নাকি উঠেছিল—তাই থেকে গ্রামে শম্ভু বাঁড়ুয্যে একঘরে হন। শম্ভু বাঁড়ুয্যে কোথাও যেতেন না, কারও সঙ্গে মিশতেন না, তাঁর হাতেও দু-পয়সা ছিল—সবাই বলত টাকার গুমর।

বেলা পাঁচটার সময় মালতী এসে বললে—শুনেছেন ব্যাপার? শম্ভু বাঁড়ুয্যেকে এখনও বের করা হয় নি—আমি এতক্ষণ ছিলাম সেখানে। সেই দুপুর থেকে একজন লোকও ওদের বাড়ির উঠোন মাড়ায় নি। মড়া কোলে মেয়েটা দুপুর থেকে ব'সে আছে—ওর মা তো বাতে পঙ্গু, উঠতে পারে না। আপনি আসুন, দু-জনে মড়া তো দোতলা থেকে নামাই—তার পর উদ্ধব-জ্যাঠাকে বলেছি আখড়ার লোকজন নিয়ে আমাদের সঙ্গে যাবে—ব্রাহ্মণের মড়া অপর জাতে ছুঁলে ওদের কষ্ট হবে—তাই চলুন আপনি আর আমি আগে নামাই—তার পর আমাদেরই নিয়ে যেতে হবে অজয়ের ধারে—পারবেন তো?

তিনজনে ধরাধরি ক'রে সেই ঘোরানো ও সঙ্কীর্ণ সিঁড়ি দিয়ে মড়া নামানো—ওঃ, সে এক কাণ্ড আর কি! মালতী আর শম্ভু বাঁড়ুয্যের মেয়ে নীরদা এক দিকে—আমি অন্য দিকে। নীরদা দেখলুম খুব শক্ত মেয়ে—বয়সে মালতীর চেয়ে বড়—বছর বাইশ হবে ওর বয়েস, মালতীর মত মেয়েলী গড়নের মেয়ে নয়, শক্ত, জোরালো হাত-পা, একটু পুরুষ-ধরনের; মালতী খুব

ছুটোছুটি করতে পারে বটে, কিন্তু ওর গায়ে তেমন শক্তি নেই। নীরদার সাহায্য না পেলে সেদিন শুধু মালতীকে দিয়ে মড়া নামানো সম্ভব হ'ত ব'লে মনে হয় না। শেষ পর্য্যন্ত গাঁয়ের লোক এল এবং তারাই মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে গেল। আমিও সঙ্গে গেলুম, মেয়েদের যেতে হ'ল না, মালতী রইল নীরদার কাছে। নীরদা আমায় বললে—দাদা, শ্রাদ্ধের সময় কিন্তু আপনাকে সব ভার নিতে হবে। আর কারও হাতে দিয়ে আমার বিশ্বাস হবে না। রুণি তো আছেই, আপনাকে অন্য কিছু খাটাবো না, ভাঁড়ারের ভার আপনাকে হাতে নিতে হবে, নইলে এ-সব পাড়াগাঁয়ের ব্যাপার আপনি জানেন না।

বেশ ঘটা ক'রেই শ্রাদ্ধ হ'ল। মালতী বুক দিয়ে পড়ে কি খাটুনিটাই খাটলে! মালতী, তুমি আমার চোখ খুলে দিলে। ঘুম নেই, নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, বসা নেই—কিসে কাজ সর্বাঙ্গসুন্দর হবে, কেউ নিন্দে করবে না ওদের, কোন জিনিস অপচয় না হয় ওদের, সে-ই একমাত্র লক্ষ্য। পরের কাজে এমনি ক'রে নিজেকে ঢেলে দিতে তুমি পার তোমার বাবার রক্ত তোমার গায়ে বইছে বলে।

নীরদাকেও চিনলুম সেদিন।

রাত দশটা। রান্নাঘরের দরজার কাছে শূন্য ডালের গামলা, লুচির ধামা, ডাল্‌নার বাল্‌তির মধ্যে নীরদা দাঁড়িয়ে আছে। সারাদিন কি খাটুনিই খেটেছে সে! চর্‌কির পাক ঘুরেছে মালতীর সঙ্গে সমানে সেই সকাল থেকে—এর মধ্যে আবার পীড়িতা মায়ের দেখাশুনা করেছে ওপরে গিয়ে। ঘামে ও শ্রমে মুখ রাঙা, (নীরদার রং বেশ ফর্সা) চুল আলুথালু হয়ে মুখের পাশে কপালে পড়েছে।

আমি বাইরের ক-জন লোককে খাওয়ার ব'লে কি আছে না-আছে দেখতে রান্নাঘরে ঢুকেছি। নীরদা বললে—দাদা, কিছু নেই আর ; ক-জন লোক? আচ্ছা দাঁড়ান, ময়দা মাখছি, দিচ্ছি ভেজে।

আমি বললুম—আর তুমি আগুনের তাতে যেও না নীরদা। তোমার চেহারা যা হয়েছে! আচ্ছা দাঁড়াও—মালতীকে বলি একটু মিছরির শরবৎ তোমায় বরং দিতে—

নীরদা বললে—দাঁড়ান, দাঁড়ান দাদা। রুণি কতবার খাওয়াতে এসেছিল—সে কি চুপ ক'রে থাকবার মেয়ে?

তারপর হেসে বললে—আজ যে একাদশী, দাদা।

আমার চোখে জল এল। আর কিছু বললাম না। মেয়েমানুষের মত সহ্য করতে পারে কোন্ জাত? অনেক শিখলাম এদের কাছে এই ক-মাসে।

মাকে দেখেছি, বৌদিদিকে দেখেছি, সীতাকে দেখেছি, শৈলদিকে দেখেছি, এদেরও দেখলাম। অথচ এই নীরদাকে ভেবেছিলুম অশিক্ষিতা গ্রাম্য মেয়ে, ওর কথাবার্ত্তায় রাঢ় দেশের টান বড় বেশী ব'লে।

মালতী আখড়ায় ফিরে এসে আমায় বললে—অনেকগুলো সন্দেশ এনেছি, খান—নীরদা-দিদি জোর ক'রে দিলে। ভাল সন্দেশ, দ্বারবাসিনীতে এ-রকম করতে পারে না, সিউড়ি থেকে আনানো।

তার পর কেমন এক ধরনের ভঙ্গি ক'রে হাসতে হাসতে বললে—বসুন, ঠাঁই ক'রে দিই আপনাকে। ও-বেলার লুচি আছে, দই আছে,—নীরদাদিদি একরাশ খাবার দিয়েছে বেঁধে—

ওকে এত ছেলেমানুষ মনে হয় এই-সব সময়ে!

ঘরে কেউ নেই, নিঃসঙ্কোচে আমার কাছে ব'সে ও আমায় খাওয়ালে—খেতে খেতে এক-বার ওর মুখের দিকে চাইলাম। কি অপূর্ব্ব স্নেহ-মমতামাখা দৃষ্টি ওর চোখে! মালতীর কাছে এত ঘনিষ্ঠ যত্ন এই কিন্তু প্রথম। বললে—আমি কি আর দেখি নি যে আজ সারাদিন আপনি শুধু খেটেছেন আর পরিবেশন করেছেন, খাওয়া যা হয়েছিল ও-বেলায় আপনার, তার আমি সন্ধান রাখি নি ভেবেছেন? খান,—না—ও লুচি ক-খানা খেতেই হবে।

খাবো কি, লুচি গলায় আটকে যেতে লাগল—সে কি অপূর্ব্ব উল্লাস, আমার সারাদেহে কিসের যেন শিহরণ! আজ সারাদিনের ভূতগত খাটুনির মধ্যেও মালতী দৃষ্টি রেখেছিল আমি কি খেয়েছি না-খেয়েছি তার ওপর!

ঘন বর্ষা নামল। সারা মাঠ আঁধার ক'রে মেঘ ঝুপ্সি হয়ে উপুড় হয়ে আছে। এইসব দিনে মালতীকে সর্ব্বদা কাছে পেতে ইচ্ছে করে—ইচ্ছে করে ঘরের কোণে বসে ওর সঙ্গে সারা দিনমান বাজে বকি। কিন্তু ও আসে না, এমনই সব বর্ষার দিনে আখড়ার যত সব খুচরো কাজে ও ব্যস্ত থাকে।

ছু-একবার যখন দেখা হয় তখন বলি—মালতী, আস না কেন?

মালতী বলে সে আসবে। তার পর এক ঘণ্টা, ছু ঘণ্টা কেটে যায়, ও আসে না। আমার রাগ হয়, অভিমান হয়। ও যদি আমার জন্যে একটুও ভাবত, তাহ'লে কি আর না এসে পারত? ওর কাছে কাজই বড়, আমি কেউ নই। কিন্তু হয়ত অপ্রত্যাশিত ভাবে হঠাৎ মালতী এসে পড়ে। প্রায়ই বিকেলের দিকে, এমন কি সন্ধ্যার সময়। চুলটি টান-টান ক'রে বেঁধে, পান খেয়ে ফুল্ল ওষ্ঠাধর রাঙা ক'রে হাসিমুখে আমার দাওয়ার সামনে এসে বলে—কি করছেন?

—এস মালতী, সারাদিন দেখি নি যে?

—আপনার কেবল—সারাদিন দেখি নি, আর, এই তখন ডাকলুম এলে না কেন, আর, কেন আস না—এই-সব বাজে কথা। আসি কখন? দেখছেন তো। খেয়ে উঠেছি এই ভো ঘণ্টাখানেক আগে। কাজ ছিল।

—কি কাজ ছিল আমি আর জানিনে মালতী? উদ্ধব-বাবাজীর কোণের ঘরে মেঝেতে চাটাই পেতে ব'সে তোমার সেই কবিতার বই লিখছিলে—আমি দেখি নি বুঝি?

—বেশ, দেখেছেন তো দেখেছেন। আসুন বিষ্ণুমন্দিরে সন্দে দেখিয়ে আসি—একা ভয় করে।

বাস্তবিকই আমি ওকে একমনে বই লিখতে দেখেছিলাম। প্রায়ই দেখি। মালতী ঠিক পাগল, আচ্ছা, পাষণ্ডদলনের অনুকরণে লেখা ওর বই কে পড়বে যে রাত নেই দিন নেই বই লিখছে! ওর মুখ দেখলে আমার কষ্ট হয়। ওই এক খেয়াল ওর। মালতীর সঙ্গে বিষ্ণুমন্দিরে গেলাম। মালতীর এই এক গুণ, ও যখন মেশে তখন মেশে নিঃসঙ্কোচে, উদার ভাবে। সে-সম্বন্ধে কোনো বাধা বা সংস্কার ও মানে না। কেন এই সন্ধ্যাতে আমার সঙ্গে একা যাবে পুকুরপাড়ের বিষ্ণুমন্দিরে—এ-সব নিয়ে সঙ্কোচ নেই ওর। মন্দিরের পথে যেতে যেতে মনে হ'ল মালতীকে পেয়ে আমার এই বর্ষাসন্ধ্যাটি সার্থক হ'ল। ওকে ছেড়ে আর কিছু চাই নে। কাঞ্চনফুলতলায় গিয়ে বললাম—সেই গানটা গাও না, সেদিন গাইছিলে গুনগুন করে!

মালতী ছেলেমানুষের মত ভঙ্গিতে বললে—উদ্ধব-জ্যাঠা যে শুনতে পাবেন?

—তা পাবেন, পাবেন।

—তবে আসুন পুকুরের ঘাটে গিয়ে বসি।

মালতীর মুখে গানটা বেশ লাগে—দু-তিনবার শুনলাম।

আমার নয়নে কৃষ্ণ নয়নতারা হৃদয়ে মোর রাধা-প্যারী
আমার বুকের কোমল ছায়ায় লুকিয়ে খেলে বনবিহারী।

গান শেষ হ'লে বললাম—শোন একটা কথা বলি মালতী, তুমি আস না কেন? তোমাকে না দেখলে আমার বড় কষ্ট হয়। আজ সারাদিন বসেছিলুম ঘরের দাওয়াতে, এমন বর্ষা গেল—তুমি চৌষট্টিবার আমার ঘরের সামনে দিয়ে যাও, একবার তো এলে পারতে? তোমার সে-সব নেই। শুধু কাজ আর কাজ। এই যে তোমাকে পেয়েছি, আর আমার যেন সব ভুল হয়ে গিয়েছে—সত্যি বলছি মালতী।

মালতী মুখ নীচু ক'রে হাসি-হাসি মুখে চুপ ক'রে রইল।

আমি বললাম—হাসলে চলবে না মালতী। কথার আমার উত্তর দাও। তুমি কি ভাবো আমি তোমাদের এখানে পড়ে আছি খেতে পাই নে বলে তাই? তা নয়।

—কে বলেছে আপনাকে যে না খেতে পেয়ে এখানে আছেন? আমি আপনাকে বলেছি নাকি?

—যাক ওসব বাজে কথা। আমার কথার উত্তর দাও।

মালতী আবার ছেলেমানুষি আরম্ভ করল। মুখ নীচু ক'রে হাঁটুর কাছে ঠেকিয়ে মৃদু মৃদু হাসিমুখে হাত দিয়ে শানের ওপর কি আঁকজোক কাটতে লাগল, কখনই ওর কাছে আমার কথার সোজা জবাব পেলাম না।

এক দিন বেড়াতে গিয়ে বাঁধের ওপর ব'সে আমার অবস্থাটা ভেবে দেখলুম। আমি এমন জড়িয়ে পড়েছি যে নড়বার সাধ্য নেই এতটুকু। ও আমার সব কিছু ভুলিয়ে দিয়েছে—যে উদ্দেশ্যে এই দু-বছর পথে পথে ঘুরেছি সে উদ্দেশ্য এখন হয়ে পড়েছে গৌণ। এখন মালতীই সব, মালতীই আমার বিশ্বের কেন্দ্র, ও যখন আসে তখন জীবনে আর কিছু চাইবার থাকে না, ও যেদিন আসে, যেদিন হেসে কথা বলে—আমার মত সুখী লোক সেদিন জগতে আর কেউ থাকে না, মাঠের ওপর সূর্য্যাস্ত সেদিন নতুন রঙে রঙীন হয়, বিচালি-বোঝাই গাড়িগুলো দ্বারবাসিনীর হাটের দিকে যায়, তাদের চাকার শব্দও ভাল লাগে, আখড়ার বাবাজীরা নিম-গাছে উঠে নিমপাতা পাড়ে—সে-ই যেন এক নতুন দৃশ্য। মালতী যেদিন আসে না, কি ভাল ক'রে কথা বলে না, সারাদিন আমার মনে শান্তি থাকে না, ওরই কথা ভাবি সারাক্ষণ—কতক্ষণে দেখা হবে, কতক্ষণে কথা বলবো। মালতী আমায় এমন জালেও জড়িয়ে ফেলেছে!

হয়ত আমি এখান থেকে যেতাম না—হয়ত শেষ পর্য্যন্ত থেকেই যেতে হ'ত—কিন্তু যেদিন মালতী আমার কাছে ব'সে পুকুরঘাটে গান গাইলে তার পরদিনই দুপুরের পরে উদ্ধব-বাবাজী আমায় ডেকে বললে—একটা কথা বলি আপনাকে—কিছু মনে করবেন না। আপনার এখানে অনেক দিন হয়ে গেল, আমাদের আখড়ার নিয়ম অনুসারে তিন দিন মাত্র এখানে অতিথ্-বোষ্টমের থাকবার কথা। আপনার প্রায় এগারো মাস হ'ল—

আমি চুপ ক'রে বসে রইলাম. কারণ ওর মুখ দেখেই আমার মনে হ'ল এটা কথার ভূমিকা—আসল কথাটা এখনও বলে নি। ঘটলও তাই। একটু ইতস্ততঃ ক'রে উদ্ধব বললে—তাতেও কিছু না—কি জানেন, আপনার ভগ্নির সঙ্গে এই মেলামেশাটা ভাল দেখাচ্ছে না। আপনার কাছে ব'সে পুকুরঘাটে বিকেলে ও গান গেয়েছিল—একথা নিয়ে সবাই—বুঝলেন না, মেয়ে-মানুষের নামে দুর্নাম রটতে দেরি লাগে না। আমি ওর অভিভাবক—এসব যাতে না হয়

আমার দেখা উচিত ব'লেই আপনাকে জানাচ্ছি এ-কথা। রুণি-মা সেরকম মেয়ে নয়। আমি সেটা খুবই জানি, কিন্তু লোকে তো—রাগ করবেন না, ভেবে দেখুন। লোকে যদি ওর নামে পাঁচটা কথা ওঠায় বা বলে—সেটা আমার উচিত হতে না দেওয়া—নয় কি ?

আমি বললাম—সেটা আমার অন্যায় হয়েছে স্বীকার করি। কিন্তু আমি ওকে বিয়ে করতে চাই ; আপনি তো বলেছিলেন, মালতীর যদি ইচ্ছা হয়—ওর বাবার ওর ওপর আদেশ আছে—

—কিন্তু ওর বাবা কণ্ঠীধারী বৈষ্ণব ছিলেন—আপনি ব্রাহ্মণ বটে, বৈষ্ণব নন, তার ওপর আপনি খৃষ্টানী মতের লোক, আপনার সঙ্গে কি ক'রে ওর বিয়ে হ'তে পারে ? ও বৈষ্ণবের মেয়ে, বৈষ্ণবের সঙ্গেই ওর বিয়ে হবে। তবে মালতীর এতে কি ইচ্ছে জানুন, সে যদি বলে, আমার আপত্তি নেই। ওর বাবা ওরই ওপর সে ভার দিয়েছিলেন।

সেদিনই সন্ধ্যার সময় ওকে নির্জ্জনে পেলাম। ওকে বললাম—একটা কথা বলব মালতী ? তুমি অভয় দেবে ?

মালতী কৌতুকের সুরে বললে—উঃ মাগো—যাত্রার দলের মত কথা শুনে আর বাঁচি নে। কি বলবেন বলুন না ?

—তুমি কি চিরকাল এই ভাবে জীবন কাটাবে ? না, হাসিখুশী না—দরকারী কথা। সবতাতেই হাস কেন—ভেবে দেখ আমি কি বলছি—

—কেন এ জায়গা কি খারাপ ? এমন চমৎকার মাঠ, দীঘি—আপনি সেদিন কি কবিতাটা বলছিলেন—

মালতী কথা শেষ না ক'রেই ছেলেমানুষি হাসি শুরু করলে। আমি বললাম—না মালতী, লক্ষ্মীটি ওভাবে কথা উড়িয়ে দিও না। আমি তোমায় চাই। তোমায় বিয়ে ক'রে এখান থেকে নিয়ে যেতে চাই। কি বল তুমি ?

মালতীর মুখের হাসি হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল—সে কেমন বিস্ময়বিহ্বল-দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইলে—তার পরেই তার মুখেচোখে ঘনিয়ে এল লজ্জা। ওর এ ধরনের লজ্জা আমি কখনও দেখি নি।

বেশ খানিকক্ষণ কেটে গেল। মালতীর মুখে উত্তর নেই। বললাম—ভেবে উত্তর দিও। এখুনি চাইনে তোমার উত্তর। তাড়াতাড়ি কিছু না বলাই ভাল।

মালতী এতক্ষণ মুখ নীচু ক'রে ছিল—এইবার মুখ তুলে কিন্তু অন্যদিকে চেয়ে বললে—কিন্তু এ জায়গা ছেড়ে যেতে হবে কেন ?

—ছেড়ে যেতে হবে এই জন্যে মালতী যে, আমি তো তোমাকে এখানে আখড়ায় থাকতে দিতে পারব না। আমিও এখানে চিরদিন কাটাতে পারি নে।

মালতীর মুখের ভাবে আমার মনে হ'ল আমার মুখে এ-কথা যেন ওর পক্ষে অপ্রত্যাশিত। ও কি ভেবেছে আমিও চিরকাল এই আখড়াতেই থেকে যাব ? ওর মুখ দেখে মনে হ'ল আমার এ কথায় ও মনে বেদনা পেয়েছে। আমি কথাটা যতদূর সম্ভব নরম করতে পারা যায় ক'রে বললাম—তুমি এখনও ছেলেমানুষ। নিজের সম্বন্ধে বিচার ক'রে দেখতে পাবার ক্ষমতা এখনও হয় নি। তুমি একা এখানে কি করবে বল ? উদ্ধব-বাবাজীও চিরকাল থাকবেন না। এই মাঠের মধ্যে আখড়ায় চিরজীবন কাটাবে একা একা ?

মালতী মুখ নীচু ক'রেই আস্তে আস্তে নরম সুরে বললে—বাবা মরণকালে এর ভার সঁপে দিয়েছিলেন উদ্ধব-জ্যাঠার ওপর নয়, আমারই ওপর। বাবার বিষ্ণুমন্দির আমায় শেষ ক'রে

তুলতে হবে। উদ্ধব বাবাজী চিরদিন থাকবেন না বলেই তো আমার এখানে আরও থাকা দরকার। বাবার ধানের জমি পাঁচজনে লুটেপুটে খাবে অথচ আখড়ার দোর থেকে অতিথ্-বোষ্টম গরীব লোকে ফিরে যাবে খেতে না পেয়ে, এ আমি বেঁচে থেকে দেখতে পারব না। তাতে কোথাও গিয়ে আমার শান্তি হবে ?

মালতীর মুখে এ ধরনের গম্ভীর কথা—বিশেষ করে ওর নিজের জীবন নিয়ে—এই প্রথম শুনলাম। সব জিনিস নিয়ে ও হালকা হাসি-ঠাট্টা ক'রে উড়িয়ে দেয়, এই ওর স্বভাব। ও এ ধরনের কথা বলতে পারে তা আমি ভাবি নি। বললাম—মালতী, এটা কি তোমার মনের কথা ? জীবনটা এই ক'রে কাটাবে ? এতেই শান্তি পাবে ? আমি যে প্রস্তাব করেচি, তাতে তুমি তা'হলে রাজী নও ? কারণ আমি এখানে থাকতে পারব না চিরকাল এটা নিশ্চয়।

শেষ কথাটা বলতে আমার বুক বেদনায় টনটন ক'রে উঠল, তবুও বলতে হ'ল।

মালতী অনেকক্ষণ বিমুখী হয়ে ব'সে রইল। কাপড়ের একটা আঁচল পাকিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে ছেলেমানুষের মত সেটা নিয়ে নাড়া-চাড়া করলে অনেকক্ষণ। আমার মনে হ'ল ও হয়ত কাঁদছে, নয়ত কান্না চেপে রাখবার চেষ্টা করছে।

তার পরে আমার দিকে একবার চেয়েই আবার মুখ ফিরিয়ে বললে—কি করব বলুন, আমার অদৃষ্টে ভগবান এই লিখেছেন, এই আমায় করতে হবে।

আমার কেমন একটা অভিমান হ'ল, বললাম—এই তাহ'লে তোমার শেষ কথা ? বেশ মালতী।

মালতী সে কথার উত্তর না দিয়ে চুপ ক'রে রইল মাথা নীচু ক'রে। আবার আমার মনে হ'ল ও কাঁদছে, কিম্বা কান্না চেপে রাখবার চেষ্টা করছে—একবার মনে হ'ল ওর ডাগর চোখ দুটি জলে ভ'রে এসেছে—কিন্তু অভিমানের আবেগে আমি সেদিকে ফিরেও চাইলাম না।

রাত্রে বাইরে ব'সে ভাবলুম। সারারাত্রিই ভাবলুম।

মালতীকে ছেড়েই যেতে হ'ল শেষ পর্য্যন্ত ?

ও না এক দিন আমায় বলেছিল···আখড়ায় কত কাজ বাকী আছে মনে নেই ?

আমার ওপর কিসের দাবিতে এ কথা বলেছিল ও ?

সে দাবি অগ্রাহ্য করে নিষ্ঠুর ভাবে যাব চলে ?

যদি না যাই—তবে এখানে আখড়ার মোহন্ত সেজে চিরকাল থাকতে হবে। এই গ্রাম্য বৈষ্ণবদের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ও আচার-সংস্কারের মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে হবে।

নিস্তব্ধ তারাভরা রাত্রি। দীঘির পার থেকে হু-হু হাওয়া বইছে।

নীল আকাশের দেবতা, যাঁর ছবি এই বিশাল মাঠের মধ্যে সন্ধ্যার মেঘে, কালবৈশাখীর ঝোড়ো হাওয়ায়, এই রকম তারাভরা অন্ধকার আকাশের তলে কতবার আমার মনে এসেছে, তাঁকে পাওয়া আমার হঠাৎ ফুরিয়ে না যায়···যে দেবতা সকল ধর্ম্মের অতীত, দেশকালের অতীত ···যার বেদী যেমন এই পৃথিবীতে মানুষের বুকে, তেমনি ওই শাশ্বত নীলাকাশে অনন্ত নক্ষত্র-দলের মধ্যে···মর্ত্তে ও অমর্ত্তে তাঁর বীণার দুই তার···আমার মনে হোমের আগুন তিনি প্রজ্বলিত রাখুন সুদীর্ঘ যুগসমূহের মধ্যে···শাশ্বত সময় ব্যেপে। আমার যা-কিছু মনের শক্তি, যা-কিছু বড়, তাই দিয়ে তাঁকে বুঝতে চাই। গণ্ডীর মধ্যে তিনি থাকেন না।

পরদিন খুব ভোরে—আখড়ার কেউ তখনও বিছানা থেকে ওঠে নি—কাউকে কিছু না জানিয়ে আমি দ্বারবাসিনীর আখড়া থেকে বেরিয়ে পড়লুম। কিসের সন্ধানে বেরিয়েছি তা আমি জানি নে—আমার সে সন্ধানের আশা আলেয়ার মত হয়ত আমাকে পথভ্রান্ত ক'রে পথ

থেকে বিপথে নিয়ে গিয়ে ফেলবে—শুধু আমি এইটুকু বুঝি যে, যে কোন গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকলে আমার চোখের অস্বচ্ছ দৃষ্টির সামনে তার প্রবুদ্ধমান রূপ ক্ষীণ হয়ে আসবে—আমার কাছে সেই সন্ধানই সত্য—আর সব মিথ্যে, সব ছায়া।

লোচনদাসের আখড়া ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। কোন্ দিকে যাব তার কিছুই ঠিক নেই। বর্ষাকাল কেটে গিয়েছে, আকাশ নির্ম্মল, শরতের সাদা লঘু মেঘখণ্ড নীল আকাশ বেয়ে উড়ে চলেছে, মণিহারী ঘাটের কাছে গঙ্গা পার হবার সময় দেখলুম গঙ্গার চরের কাশ-বনে কি অজস্র কাশফুলের মেলা! খানিকটা রেলে খানিকটা পায়ে হেঁটে এলাম কহলগাঁয়ে। গঙ্গার ধারে নির্জ্জন স্থানটি বড় ভাল লাগল। স্টেশনের কাছেই পাহাড়, সামনে যে পাহাড়টা, তার ওপরে ডাক-বাংলো—এখানে একটা রাত কাটালাম। ডাক-বাংলোর কাছে কি চমৎকার এক প্রকার বন্যফুল ফুটেছে, জ্যোৎস্নারাত্রে তার সুগন্ধে ডাক-বাংলোর বারান্দা আমোদ ক'রে রেখেছে।

এক দিন কহলগাঁয়ের খেয়াঘাটে শুনলাম ক্রোশখানেক দূরে গঙ্গার ধারে বটেশ্বরনাথ পাহাড়ে একজন সাধু থাকেন। একখানা নৌকা ভাড়া ক'রে বেরিয়ে পড়লাম। বটেশ্বরনাথ পাহাড় দূর থেকে দেখেই আমার মনে হ'ল এমন সুন্দর জায়গা আমি কমই দেখেছি, এখানে শান্তি ও আনন্দ পাব। গঙ্গার ধারে অনুচ্চ ছোট পাহাড়, পাহাড়ের মাথায় জঙ্গল, নানা ধরনের বুনো গাছ, এক ধরনের হলদে-পাপড়ি বড় বড় ফুল ফুটেছে পেয়ারাগাছের মত গাছে, নাম জানিনে। একটা বড় গুহা আছে পাহাড়ের দক্ষিণ দিকের ঢালুতে জঙ্গলের মধ্যে। গুহার মুখের কাছে প্রাচীন একটা বটগাছ, বড় বড় ঝুরি নেমেছে, ঘন ছায়া, পাকা বটফল তলায় প'ড়ে আছে রাশি রাশি। সাধুটির সঙ্গে আলাপ হ'ল, বাড়ি ছিল তাঁর মাদ্রাজে, কিন্তু কথাবার্ত্তায় চেহারায় হিন্দুস্থানী। সাধুটি খুব ভাল লোক, লম্বাচওড়া কথা নেই মুখে, বাঙালী বাবু দেখে খুব খাতির করলেন। নিজে কাঠ কুড়িয়ে এনে চা ক'রে খাওয়ালেন, আমার সম্বন্ধে দু-একটা কথা জিজ্ঞেস করলেন। বললেন—আপনি এখানে যতদিন ইচ্ছে থাকুন, এখানে খরচ খুব কম। আমি এর আগে মুঙ্গেরে কষ্টহারিণীর ঘাটে ছিলাম, শহর বাজার জায়গা, এত খরচ পড়ত যে টিকতে পারলাম না। তাও বটে, আর দেখুন বাবুজী, সাধুরা চিড়িয়ার জাত, আজ এখানে, কাল ওখানে—এক জায়গায় কি ভাল লাগে বেশী দিন?

লোকজন বিশেষ নেই, স্থানটি অতিশয় নির্জ্জন, কথা বলবার লোক নেই, তার প্রয়োজনও বোধ করি নেই বর্ত্তমানে—সারাদিনের মধ্যে সন্ধ্যার সময় সাধুজীর সঙ্গে ব'সে একটু আলাপ করি। এতদিন কোথাও যে-শান্তি পাই নি, এখানে তার দেখা মিলেছে, একদিন পাহাড়ের ওপরে বেড়াতে বেড়াতে জঙ্গলের মধ্যে একটা সুঁড়ি-পথ পেলাম। পাহাড়ের গা কেটে পথটা করা হয়েছে, ডাইনে উঁচু পাহাড়ের দেওয়ালটা, বাঁয়ে অনেক নীচে গঙ্গা, ঢালুটাতে চামেলীর বন, একটা প্রাচীন পুষ্পিত বকাইন গাছ পথের ধারে। কিছুদূর গিয়ে দেখি, পাহাড়ের গায়ে খোদাই-করা কতকগুলো বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্ত্তি—গবর্ণমেন্টের নোটিশ টাঙানো আছে এই মূর্ত্তিগুলো কেউ নষ্ট করতে পারবে না ইত্যাদি। আমি জানতাম না এদের অস্তিত্ব। জায়গাটা অতি চমৎকার, সূর্য্যাস্তের সময় সেদিন পীরপৈঁতির অনুচ্চ শৈলমালার ওপরের আকাশটা লাল হয়ে উঠল, গঙ্গার বুকে আকাশজোড়া রঙীন মেঘমালার ছায়া, খোদাই-করা দেবদেবীর মূর্ত্তি গোধূলির চাপা আলোয় কেমন একটা অনির্দ্দেশ্য শ্রী ধারণ করেছে—সে শ্রী বড় অদ্ভুত, কোন মূর্ত্তির নাক ভাঙা, কোনটার নাক নেই, বেশীর ভাগ মূর্ত্তিরই মুখ খসে গিয়েছে—কিন্তু গোধূলির রক্ত-পিঙ্গল আকাশের ছায়ায় যক্ষিণী যেন জীবন্ত

হয়ে উঠল ; পাথরে কাটা পীন স্তনযুগল যেন রক্তমাংসের ব'লে মনে হ'ল, লুম্বিনী উদ্যানের ছায়াতরুমূলে শায়িতা আসন্নপ্রসবা মায়াদেবীর চোখের পলক যেন পড়ে পড়ে, তারপর চামেলীর বন কালো হয়ে গেল, গঙ্গার বুকে নোঙর করা বড় বড় কিস্তির মাঝিরা হনুমানজীর ভজন গাইতে শুরু ক'রে দিলে, পাহাড়ের পূর্ব্বদিকে ছোট্ট কেওলিন খনিটাতে মজুরদের ছুটির ঘণ্টা পড়ল—আমি তখনও অবাক হয়ে দাঁড়িয়েই আছি।···রাঢ় দেশের মাঠে সেই খালের ধারের তালবনে সেদিন যে অদ্ভুত ধরনের শান্তি ও আনন্দ পেয়েছিলুম, সেটা আবার পাবার আশায় কতক্ষণ অপেক্ষা করলুম—কিন্তু পেলাম কই ? তার বদলে একটা ছবি মনে এল।

আমি জানি এ-সব কথা বলে কি কিছু বোঝানো যায় ? যার না হয়েছে, সে কি পরের লেখা পড়ে কিছু বুঝতে পারবে, না আমিই বোঝাতে পারবো ? মনে হ'ল কোথায় যেন একজন পথিক আছেন, ঐ নীল আকাশ, ঐ রঙীন মেঘমালা, এই কলরবপূর্ণ জীবনধারার পেছনে তিনি চলেছেন···চলেছেন · কোথায় চলেছেন নিজেই হয়ত জানেন না। তাঁর কোন সঙ্গী নেই, তাঁকে কেউ বোঝে না, তাঁকে ভালবাসে না। অনাদি অনন্তকাল ধরে তিনি একা একা পথ চলেছেন। এই দৃশ্যমান বিশ্ব, এদের সমস্ত সৌন্দর্য্য—তিনি আছেন বলেই আছে।

আমি তাঁকে ছোট ক'রে দেখতে চাইনে। তাঁকে নিয়ে পুতুলখেলার বিরুদ্ধে ছোটবেলা থেকে আমি বিদ্রোহ ক'রে আসছি। তিনি বিরাট, মানুষে দশ হাজার বছরে তাঁকে যত বুঝে এসেছে আগামী দশ হাজার বছরে তাঁকে আরও ভাল ক'রে বুঝবে। এক-আধ জন মানুষে কি করবে ? সমগ্র মানব জাতি যুগে যুগে তাঁকে উপলব্ধির পথে চলেছে। আমি তাঁকে হঠাৎ বুঝে শেষ করতে চাই নে—কোটী যোজন দূরের তারার আলো যেমন লক্ষ বৎসর পৃথিবীতে আসছে···আসছে···তেমনি তাঁর আলোও আমার প্রাণে আসছে···হয়ত সিকি পথও এখনও এসে পৌঁছয় নি—কত যুগ, কত শতাব্দী, এখনও দেরি আছে পৌঁছবার। এই তো আমার মনে আসল য়্যাড্‌ভেঞ্চার (adventure), এ যেন আমার হঠাৎ ফুরিয়ে না যায়। আমি খুঁজে বেড়াবো···এই খোঁজাই আমার প্রাণ, বুদ্ধি, হৃদয়কে সঞ্জীবিত রাখবে, আমার দৃষ্টিকে চিরনবীন রাখবে।

আমি হয়ত এজন্মে তাঁকে বুঝবো না, হয়ত বহু জন্মেও বুঝবো না—এতেই আনন্দ পাব আমি, যদি তিনি আমার মনের বেদীতে হোমের আগুন কখনও নিভে যেতে না দেন, শাশ্বত যুগসমূহের মধ্যে, সুদীর্ঘ অনাগত কাল ব্যেপে। আমি চাই ওই নীল আকাশ, ওই সবুজ চর, কলনাদিনী গঙ্গা, দূরের নীহারিকাপুঞ্জ, মানুষের মনোরাজ্য, ওই হলদে-ডানা প্রজাপতি, এই শোভা, এই আনন্দের মধ্যে দিয়ে তাঁকে পেতে।

লোচনদাসের আখড়াতেই সবাই বললে, আমি নাস্তিক, কারণ আমি বলতাম নাম-জপ করা কেন ? ঈশ্বরের নাম দিতে পেরেছে কে ? শেষ পর্য্যন্ত উদ্ধব-বাবাজী আমাকে আখড়া ছাড়িয়ে দিল এই জন্যে বোধ হয়।

একদিন বৈকালে গঙ্গায় নাইতে নেমেছি—কাটারিয়ার ওপারের বহুদূর দিকচক্রবালের প্রান্ত থেকে কালো মেঘ ক'রে ঝড় এল, গঙ্গার বুকে বড় বড় ঢেউ উঠল, আমার মুখে কপালে মাথায় বুকে ঢেউ ভেঙে পড়ছে, ওপারে চরের উপর বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, জলের সুঘ্রাণ পাচ্ছি—এরকম কত ঝটিকাময় অপরাহ্ণ ও কত নীরন্ধ্র অন্ধকারময়ী রাত্রির কথা মনে এল—আমারই জীবনের কত সুখদুঃখময় মুহূর্ত্তের কথা মনে এল—

মনে কেমন একটা অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হ'ল, তাকে আনন্দও বলতে পারি, প্রেমও বলতে পারি, ভক্তিও বলতে পারি। তার মধ্যে ও তিনটেই আছে। বটেশ্বরনাথের পাহাড়টার ঠিক

ধূসর স্তূপের দিকে চেয়ে, দূর, বহুদূর দিগন্তের দিকে চেয়ে যেখানে বাংলা দেশ, যেখানে মালতী আছে, যেখানে এমন কত সুন্দর বর্ষার সন্ধ্যা মধুর আনন্দে কাটিয়েছি, কত জ্যোৎস্নারাত্রে শুকনো মকাইঝোলানো চালাঘরের দাওয়ার তলায় ব'সে দুজনে কত গল্প করেছি, তার মুখে জ্যোৎস্নার আলো এসে পড়েছে···কতবার অপ্রত্যাশিত মুহূর্ত্তে সে এসেছে—আবার কতবার ডাকলেও আসে নি, কতবার চোখাচোখি হ'লেই হেসে ফেলেছে—এ কথা মনে হয়ে আমার মনে কেমন একটা উন্মাদনা, আনন্দ, প্রেম, ভক্তি আরও কত কি ভাবের উদয় হ'ল একটা বড় ভাবের মধ্যে দিয়ে। ওই একটার মধ্যেই সবটা ছিল। তাদের আলাদা আলাদা করা যায় না—কিন্তু তারই প্রেরণায় আমার আঙুল আপনা-আপনি বেঁকে গেল, গঙ্গার জলে মা, বাবা, হীরু-জ্যাঠার নামে তর্পণ করলুম, ভগবানের নামে সমস্ত দেহ-মন নুয়ে এল, জলের ওপরই মাথা নত ক'রে তাঁর উদ্দেশে প্রণাম করলুম। সীতার জন্যে করুণ সহানুভূতিতে চোখে জল এল। হঠাৎ ঘোর বৈষয়িকতার জন্যে জ্যাঠামশায়ের প্রতি অনুকম্পা হ'ল—আবার সেই সৃষ্টিছাড়া অপরূপ মুহূর্ত্তেই দেখলুম মালতীকে কি ভালই বাসি, মালতীর সহায়হীন, সম্পদহীন ছন্নছাড়া মূর্ত্তি মনে ক'রে একটা মধুর স্নেহে তাকে সংসারের দুঃখকষ্ট থেকে বাঁচাবার আগ্রহে, তাকে রক্ষা করবার, আশ্রয় দেবার, ভালবাসার, ভাল করবার, তার মনে আনন্দ দেবার, তার সঙ্গে কথা বলবার আকুল আগ্রহে সমস্ত মন ভরে উঠল—কি জানি সে মুহূর্ত্ত কি ক'রে এল, সেই মেঘান্ধকার বর্ষণমুখর সন্ধ্যাটিতে সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি যেন সেই মহামুহূর্ত্তে আমার মধ্যে দিয়ে তার সমস্ত পুলকের, গৌরবের, অনুভূতির সঞ্চয়হীন বিপুল আত্মপ্রকাশ করলে। সেদিন দেখলুম ঈশ্বরের প্রতি সত্যিকার ভক্তির প্রকৃতি মালতীর প্রতি আমার ভালবাসার চেয়ে পৃথক নয়। ও একই ধরনের, একই জাতীয়। যেখানে হৃদয়ের সহানুভূতি নেই, ভালবাসা নেই, সেখানে ঈশ্বরও নেই। ভগবানের প্রতি সেদিন যে-ভক্তি আমার এল—তা এল একটা অপূর্ব্ব আনন্দের রূপে—সত্যিকার ভক্তি একটা joy of life···আত্মা, দেহ, মন সেখানে আনন্দে মাধুর্য্যে আপ্লুত হয়ে যায়।

ঠিক মালতী আমাকে ভালবেসেছে বা আমি মালতীকে ভালবেসেছি এই ভেবে যেমন হয় তেমনি। কোন পার্থক্য নেই। একই অনুভূতি—দুটো আলাদা আলাদা নাম মাত্র। এতেও মন অবশ হয়ে যায় আনন্দে—ওতেও।

উপলব্ধি ক'রে বুঝলুম যদি কেউ আমাকে আগে এ-সব কথা বলত, আমার কখনই বিশ্বাস হ'ত না। হওয়া সম্ভবও নয়।

সাধুজী সন্ধ্যাবেলা রোজ ধর্ম্মকথা পড়েন। আমি মনে মনে বলি—সাধুজী, আপনি জীবন দেখেন নি। ভালবেসেছেন কখনও জীবনে? প্রাণ ঢেলে ভালবেসেছেন? যে কখনও নরুণ হাতে নিতে সাহস করে নি, সে যাবে তলোয়ার খেলতে। শুকনো বেদান্তের কথার মধ্যে ঈশ্বর নেই—যেখানে ভাব নেই, ভালবাসা নেই, হৃদয়ের দেওয়া-নেওয়া নেই, আপনাকে হারিয়ে ফেলা, বিলিয়ে দেওয়া নেই—সেখানে ভগবান নেই, নেই, নেই। হৃদয়ের খেলা যে আস্বাদ করেছে, ও-রস কি জিনিস যে বোঝে—ভগবানকে ভালবাসার প্রথম সোপানে সে উঠেছে।

আমি মালতীর কথা এত ভাবি কেন? সে আমাকে এত অভিভূত ক'রে রেখেছে কেন দিন, রাত, সকাল, সন্ধ্যা?···এই বিক্রমশিলা বিহারের পাহাড়মালা, বন-শ্রেণী পাদমূলে প্রবাহিতা পুণ্যস্রোতা নদী, সন্ধ্যার পটে রাঙা সূর্য্যাস্ত, বনচামেলীর উগ্র উদাস গন্ধ—এ-সবের মধ্যে সে আছে, তার হাসি নিয়ে, তার মুখভঙ্গি নিয়ে, তার গলার সুর নিয়ে, তার শতসহস্র টুকরো কথা নিয়ে, তার ছেলেমানুষি ভঙ্গি নিয়ে। কেন তাকে ভুলি নি, কেন তার জন্য আমার মন সর্ব্বদাই উদাস, উন্মুখ, ব্যাকুল, বেদনায় ভরা, স্মৃতির মাধুর্য্যে আপ্লুত, নিরাশায়

যন্ত্রণাময়—হঠাৎ তাকে এত ভালবাসলুম কেন ? তার কথা মনে যখন আসে, তখন কেওলিন খনির উপরকার পাহাড়চূড়াটায় একটা বকাইন গাছের গুঁড়িতে ঠেস্ দিয়ে সারাদিন তার কথা ভাবি—খাওয়া-দাওয়ার কথা মনে থাকে না, ভালও লাগে না—তার মুখের হাসির স্মৃতিতেই যেন আমার শান্তিময় নিভৃত গৃহকোণ, তার কথার সুর দূরের ব্যবধান ঘুচিয়ে, মাঠ নদী বন পাহাড় পার হয়ে ভেসে এসে আমার প্রদীপ-জ্বালানো শান্ত আঙিনায় ছোট্ট খড়ের রান্নাঘরের একপাশে উপবিষ্ট নিরীহ গৃহস্থ সাজায়—জীবনে তাই যেন চেয়ে এসেছি, সব দুরাশা, সব-কিছু ভুলিয়ে দেয়, অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ একাকার হয়ে যায়···এদিকে রোদ চড়ে ওঠে কিংবা সূর্য্য চলে পড়ে, বটেশ্বরনাথের পাহাড় রঙে রঙে রাঙা হয়, পাখীর গান হঠাৎ যায় থেমে—সাধুজীর চেলা বর্মানারায়ণ আমাকে খুঁজতে আসে চা খাবার জন্যে···তখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠতে হয়···গাঁজার ধোঁয়ায় অন্ধকার সাধু-বাবাজীর গুহার সামনে ব'সে দুধবিহীন কড়া চা খেতে খেতে হনুমান-চরিত শুনতে হয়।

সাধুজী আমাকে ভালবাসেন। এই জন্যে ওঁর এখানে আছি। এখানে পয়সার খরচ নেই বললেই হয়। বারোটা টাকা এনেছিলুম, সাধুজীর হাতে তুলে দিয়েছি—নিতে চান নি—আমি পীড়াপীড়ি ক'রে দিয়েছি। একবেলা খাই মকাইয়ের ছাতু, একবেলা রুটি আর ঢেঁড়সের তরকারি। অন্য কিছু এখানে মেলে না। কেওলিন খনির ম্যানেজার মাঝে মাঝে কহলগাঁও থেকে মাছ আনায়, সেদিন ওর বাংলোতে আমায় খেতে বলে—কারণ সাধুর এখানে ওসব করবার হবার জো নেই।

মালতীর সঙ্গে আবার দেখা হবে না ? কিন্তু কি ক'রে হবে তা তো বুঝি নে। আমি আবার সেখানে কোন্ ছুতোয় যাবো ? উদ্ধবদাস-বাবাজী আমায় ভাল চোখে দেখতো না। দু-একবার অসন্তোষ প্রকাশও করেছিল, মালতীর সঙ্গে যখন বড় মিশছি—তখন দু-একবার আমার এমন আভাসও দিয়েছিল যে এখানে বেশী দিন থাকলে ভাল হবে না। ও-সবে আমি ভয় করি নে। সপ্তসিন্ধুপারের দেশ থেকে মালতীকে আমি ছিনিয়ে আনতে পারি, যদি আমি জানতাম যে মালতীও আমায় চায়। কিন্তু তাতে আমার সন্দেহ আছে। সেই সন্দেহের জন্যেই যত বেদনা, যা-কিছু যন্ত্রণা! কি জানি, বুঝতে পারি নে সবখানি। রহস্যময়ী মালতীর মনের খবর পুরো এক বছরেও পাই নি।

এক-একবার কিন্তু আমার মনের গভীর গোপন তল থেকে কে বলে, অত সন্দেহ কেন তোমার মনে ? তোমার চোখ ছিল কোথায় ? মালতীকে বোঝ নি এক বছরেও ?

মালতী—কি মাধুর্য্যের রূপ ধরেই সে মনে আসে! তার কথা যখনই ভাবি, অস্ত-আকাশের অপরূপ শোভায় পাহাড়ের ধূসর ছায়ায় গঙ্গার কলতানের মধ্যে ওপারের খাসমহলের চরে কলাইওয়ালী মাথায় কলায়ের বোঝা নিয়ে ঘরে যখন ফেরে, যখন সাদা পাল তুলে বড় বড় কিস্তি কহলগাঁয়ের ঘাট থেকে বাংলা দেশের দিকে যায়···কিংবা যখন গঙ্গার জলে রঙীন মেঘের ছায়া পড়ে, খেয়ার মাঝিরা নিজেদের নৌকোতে বসে বিকট চীৎকার ক'রে ঠেট্ হিন্দীতে ভজন গায়—সমস্ত পৃথিবী, আকাশ, পাহাড় একটা নতুন রঙে রঙীন হয়ে ওঠে আমার মনে—ওই দূর বাংলা দেশের এক নিভৃত গ্রামের কোণে মালতী আছে, যখন আবার বর্ষা নামে, খুব ঝড় ওঠে, কিংবা পুকুরের ঘাটে একা গা ধুতে যায়, কি বিষ্ণুমন্দিরে প্রদীপ দেখায় সন্ধ্যায়—আমার কথা তার মনে পড়ে না ? আমার তো পড়ে—সব সময়ই পড়ে, তার কি মনে পড়ে না ?

মালতীকে নিয়ে মনে কত ভাঙা-গড়া করি, কত অবস্থায় দুজনকে ফেলি মনে মনে, কত বিপদ থেকে তাকে উদ্ধার করি, আমার অসুখ হয়, সে আমার পাশে ব'সে না ঘুমিয়ে সারারাত

কাটায়—কত অর্থকষ্টের মধ্যে দিয়ে দু-জনে সংসার করি—সে বলে—ভেবো না লক্ষ্মীটি, মদনমোহন আবার সব ঠিক ক'রে দেবেন। তার ছোটখাটো সুখদুঃখ, আখড়ার বিগ্রহের ওপর গভীর ভক্তি ও বিশ্বাস, তার সেবা—আমার ভাল লাগে। মনে হয় কত মেয়ে দেখেছি, সবারই খুঁত আছে, মালতীর খুঁত নেই। আবার মেয়েরা যেখানে বেশী রূপসী, সেখানে মনে হয়েছে এত রূপ কি ভাল? মালতীর স্নিগ্ধ শ্যামল সুকুমার মুখের তুলনায় এদের এত নিখুঁত রূপ কি উগ্র ঠেকে! মোটের ওপর যেদিক দিয়েই যাই—সেই মালতী।

এক-একবার মনকে বোঝাই মালতীর জন্যে অত ব্যস্ত হওয়া দুঃখ বাড়ানো ছাড়া আর কি? তাকে আর দেখতেই পাব না। তাদের আখড়াতে আর যাওয়া ঘটবে না। স্বপ্নকে আঁকড়ে থাকি কেন? কিন্তু মন যদি অত সহজে বুঝতো!

মালতী একটা মধুর স্বপ্নের মত, বেদনার মত, কত দিন কানে-শোনা গানের সুরের মত উদয় হয়। তখন সবই সুন্দর হয়ে যায়, সবাইকে ভালবাসতে ইচ্ছে করে, সাধুর বকুনি, পাণ্ডা-ঠাকুরের জ্ঞাতি-বিরোধের কাহিনী—অর্থাৎ কি করে ওর জ্যাঠতুতো ভাই ওকে ঠকিয়ে এতদিন বটেশ্বর শিবের পাণ্ডাগিরি থেকে ওকে বঞ্চিত রেখেছিল তার সুদীর্ঘ ইতিহাস—সব ভাল লাগে। কিন্তু কোন কথা বলতে ইচ্ছে করে না তখন, ইচ্ছে হয় শুধু বসে ভাবি, ভাবি—সারা দীর্ঘ দিনমান ওরই কথা ভাবি।

বটেশ্বরনাথ পাহাড়ের দিনগুলো মনে আমার অক্ষয় হয়ে থাকবে। রূপে, বেদনায়, স্মৃতিতে, অনুভূতিতে কানায় কানায় ভরা কি সে-সব অপূর্ব্ব দিন! অনেক দিন হয়ে গিয়েছে। কিন্তু প্রেমের অমর মধু-মুহূর্ত্তগুলির ছায়াপাতে তাদের স্মৃতি আমার কাছে চিরশ্যামল। শরতের দুপুরে নিভৃত বননিবিড় অধিত্যকায় চুপ ক'রে ঝরা পাহাড়ী-কুরচি-ফুলের শয্যায় ব'সে চারিদিকে রৌদ্রদীপ্ত পাহাড়শ্রেণীর রূপ ও শরতের আকাশের সাদা সাদা মেঘখণ্ডের দিকে চেয়ে চেয়ে মালতীর ভাবনাতে সারাদিন কাটিয়ে দিতাম। তিনটাঙার মাঠে বটগাছের সবুজ মগডালে সাদা সাদা বকের সারি ব'সে আছে, যেন সাদা সাদা অজস্র ফুল ফুটে আছে—কত কি রং, প্রথমে মাটির ধূসর রং, তার পর কালো সবুজ গাছপালা, তার ওপরের পর্দ্দায় নীলকৃষ্ণ পাহাড়, তার ওপরে সুনীল ও সাদা মেঘস্তূপ, সকলের নীচে কূলে কূলে ভরা গৈরিক জলরাশি। কিসে যেন পড়েছিলুম ছেলেবেলায় মনে পড়ে—

অলসে বহে তটিনী নীর,
বুঝি দূরে—অতি দূরে সাগর,
তাই গতি মন্থর,
শ্রান্ত, শান্ত পদসঞ্চার ধীর!

আগে প্রেম কা'কে বলে তা জানতাম না, জীবনে তা কি দিতে পারে, তা ভাবিও নি কোন দিন। এখন মনে হয় প্রেমই জীবনের সবটুকু। স্বর্গ কবির কল্পনা নয়—স্বর্গ এই পিয়ালতলায়, স্বর্গ তার স্মৃতিতে। নয়তো কি এত রূপ হয় এই শিলাস্তৃত অধিত্যকায়, ওই উচ্চ মেঘপদবীর, ওই পুণ্যসলিলা নদীর, ওই বননীল দিগন্তরেখার!

দিনে রাতে মালতী আমায় ছাড়ে কখন? সব সময় সে আমার মনে আছে। এই দুপুর, এখন সে আখড়ার দাওয়ায় পরিবেশন করছে। এই বিকেল, এখন সে কাপড় সেলাই করছে, নয় তো মুগকলাই ঝাড়ছে। এই সন্ধ্যা, এখন সে টান-টান ক'রে তার অভ্যস্ত ধরনে চুলটি বেঁধে, ফুল্লাধরে মৃদু হেসে বিষ্ণুমন্দিরে প্রদীপ দেখাতে চলেছে। আজ মঙ্গলবার, সারাদিন সে

উপবাস ক'রে আছে, আরতির পরে দুধ ও ফল খাবে। সেই নিঃসঙ্কোচে পুকুরের ঘাটে বসে বসে আমাকে গান-শোনানো, আমার সঙ্গে শিবের মন্দিরে যাওয়া—খাতা পড়ে শোনানো—সকলের ওপরে তার হাসি, তরে মুখের সে অপূর্ব্ব হাসি! কত কথাই মনে এসে নির্জ্জনে যাপিত প্রতি প্রহরটি আনন্দবেদনায় অলস ক'রে দিত।

দূরের গিরি-সানুর গায়ে ক্রীড়ারত শুভ্র মেঘরাজির মধ্যে এমন কি কোন দয়ালু মেঘ নেই যে এই কুটজ-কুসুমাস্তীর্ণ নিভৃত অধিত্যকার ওপর দিয়ে যেতে যেতে পিয়ালতলার এই নির্ব্বাসিত যক্ষের বিরহবার্ত্তাটি শুনে জেনে নিয়ে বাংলা দেশের প্রান্তরমধ্যবর্ত্তী অলকাপুরীতে পৌঁছে দেয় তার কানে?

কতবার মনে অনুশোচনা হয়েছে এই ভেবে যে কেন চলে আসতে গিয়েছিলুম অমন চুপি চুপি? তখন কি বুঝেছিলুম মালতী আমায় এত ভাবাবে! কি বুঝে আখড়া ছেড়ে এলাম পাগলের মত! এমনধারা খামখেয়ালী স্বভাব আমার কেন যে চিরকাল, তাই ভাবি। আমার মাথার ঠিক নেই সবাই বলে, সত্যিই বলে। এখন বুঝেছি কি ভুলই করেছি মালতীকে ছেড়ে এসে! ওকে বাদ দিয়ে জীবন কল্পনা করতে পারছি নে—এও যেমন ঠিক, আবার এও তেমনি ঠিক যে আর সেখানে আমার ফেরা হবে না।

না—মালতী, আর ফিরে যাব না। কাছে পেয়ে তুমি যদি অনাদর কর সইতে পারব না। তোমার খামখেয়ালী স্বভাবকে আমার ভয় হয়। তার চেয়ে এই-ই ভাল। আমার জীবনে তুমি পুকুরের ঘাটের কত জ্যোৎস্নারাত্রি অক্ষয় ক'রে দিয়েছ, সেই সব জ্যোৎস্নারাত্রির স্মৃতি, তোমার বাবার বিষ্ণুমন্দিরে কত সন্ধ্যায় প্রদীপ দেওয়ার স্মৃতি—তোমার সে সব আদরের স্মৃতি মৃত্যুঞ্জয়ী হয়ে থাকে।

॥ ১৪ ॥

এক বছর কেটে গেল, আবার শ্রাবণ মাস।

হঠাৎ দাদার শালার একখানা চিঠি পেলাম কলকাতা থেকে। দাদার বড় অসুখ, চিকিৎসার জন্যে তাকে আনা হয়েছে ক্যাম্বেল হাসপাতালে।

পত্র পেয়ে প্রাণ উড়ে গেল। সাধুজীর কাছে বিদায় নিয়ে কলকাতায় এলাম। হাসপাতালে দাদার সঙ্গে দেখা করলাম। সামান্য ব্রণ থেকে দাদার মুখে হয়েছে ইরিসিপ্লাস, আজ সকালে অস্ত্রও করা হয়ে গিয়েছে। দাদা আমায় দেখে শরীরে যেন নতুন বল পেল। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত হাসপাতালে বসে রইলাম দাদার কাছে। দাদা বললে—এখানে বেশ খেতে দেয় জিতু। রোজ প্রতিবেলায় একখানা বড় পাঁউরুটি আর আধ সের করে দুধ দিয়ে যায়। দেখিস এখন, এখুনি আনবে। খাবি রুটি একখানা?

পরদিন সকালে আবার গেলাম হাসপাতালে। আঙুর কিনে নিয়ে গিয়েছিলাম বৌবাজারের মোড় থেকে, দাদাকে ব'সে ব'সে খাওয়ালাম। দুপুরের আগে চলে আসছি, দোর পর্য্যন্ত এসেছি, দাদা পেছু ডাকলে—জিতু, শোন্।

দাদা বিছানার ওপর উঠে বসেছে—তার চোখ দুটিতে যেন গভীর হতাশা ও বিষাদ মাখানো। বললে—জিতু, তোর বৌদিদি একেবারে নিপাট ভালমানুষ, সংসারের কিছু বোঝে না। ওকে দেখিস—

আমি বিস্ময়ের সঙ্গে বললাম—ও কি কথা দাদা! তুমি সেরে ওঠ, তোমায় বাড়ি নিয়ে যাব, তোমার সংসার তুমি দেখবে।

দাদা চুপ ক'রে রইল।

বিকেলে দাদার ওয়ার্ডে ঢুকবার আগে মনে হ'ল দাদা তো বিছানাতে বসে নেই! গিয়ে দেখি দাদা আগাগোড়া কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। মাথার কাছে চার্টে দেখি জ্বর উঠেছে ১০৪ ডিগ্রীর ঘরে। পাশের বিছানার রোগী বললে—আপনি চলে যাবার পরে খুব জ্বর এসেছে। কোন কথা বলতে পারেন নি, আপনি আসবার আগে ডেকেছিলাম, সাড়া পাই নি।

সেদিন সারাদিন তেমনি ভাবে কেটে গেল। পরদিনও তাই, দাদার জ্ঞান আর ফিরে এল না—জ্বরও কমল না, পরদিন রাত্রে আমি রোগীর কাছে রইলাম।

ওঃ, কি বর্ষা সে রাত্রে! ঘনকৃষ্ণ শ্রাবণের মেঘপুঞ্জে আকাশ ছেয়ে গিয়েছে, নির্নিরীক্ষ্য অন্ধকারে কোথাও একটা তারা চোখে পড়ে না। একখানা বই পড়ছিলাম দাদার বিছানার ধারে ব'সে। রাত বারোটায় একবার নার্স এল। আমি তাকে বললাম—রোগীর অবস্থা খারাপ—একবার রেসিডেণ্ট মেডিকেল অফিসারকে ডাকাও। ডাক্তার এল, চলেও গেল। রাত তখন দেড়টা। বাইরে কি ভীষণ মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছে। আকাশ ভেঙে পড়বে বুঝি পৃথিবীর ওপরে—সৃষ্টি বুঝি ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

একজন ছাত্র এসে রোগী দেখে বললে—ইন্‌জেক্‌শন্ দিতে হবে।

আমি বললাম—বেশ দিন—

তারপর আমি বাইরে এসে দাঁড়ালুম। ঘন মেঘে মেঘে আকাশ অন্ধকার। হাসপাতালের বারান্দাতে কুলিরা ঘুমুচ্ছে। টিটেনাস্ ওয়ার্ড থেকে অনেকক্ষণ ধরে আর্ত্ত পশুর মত চীৎকার শোনা যাচ্ছে—একবার সেটা থামছে, আবার জোরে জোরে হচ্ছে। সামনের ওয়ার্ডে মেম নার্সটা ঘুরে বেড়াচ্ছে বারান্দাতে।

বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে হেড্ লাইট জ্বালিয়ে একখানা মোটর এসে ওয়ার্ডের সামনে দাঁড়াল। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তদারক করতে এসেছেন। দাদাকে তিনি দেখলেন। নার্সকে কি বললেন। ছাত্রটিকে ডেকে কি জিজ্ঞেস করলেন। ছাত্রটি আর একটা ইন্‌জেক্‌শন্ দিলে।

রাত আড়াইটে। বৃষ্টি আবার শুরু হয়েছে। হাসপাতালের বারান্দার ওদিকের আলোগুলো নিবিয়ে দিয়েছে—অনেকটা অন্ধকার।

দাদার সঙ্গে অনেক কথা বলবার ইচ্ছে হচ্ছিল। ছেলেবেলাকার কথা, দার্জ্জিলিঙের কথা। সেই আমরা কার্ট রোড ধ'রে উম্‌প্রাঙের মিশন-হাউস্ পর্য্যন্ত বেড়াতে যেতুম, মনে আছে দাদা? একদিন থাপা তোমাকে কাদার পুতুল গড়িয়ে দিয়েছিল! মুরগীর ঘরে লুকিয়ে তুমি আর আমি মিছরি চুরি ক'রে শরবৎ খেতুম? তুমি দোকান করলে আটঘরাতে বাবা মারা যাওয়ার পরে পাঁচ সের নুন, আড়াই সের আটা, পাঁচ পোয়া চিনি নিয়ে—সবাই ধার নিয়ে দোকান উঠিয়ে দিলে। বৌদিদিকে কি বলব দাদা?

এবার এসে দাদার খাটের পাশে বসে রইলাম। একটানা বৃষ্টি-পতনের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। মাঝে মাঝে কেবল টিটেনাস্ ওয়ার্ড থেকে বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়েও সেই আর্ত্ত চীৎকারটা শোনা যাচ্ছে। একটা ছোট ছেলের টন্‌সিল কাটা হয়েছিল—সে একবার ঘুম ভেঙে উঠে খাবার চাইলে। কুলিটা উঠে তাকে জল দিলে।

এই কুলিগুলো ওই বুড়ো মেথরটা, নার্সেরা—এরা ঘুমোয় কখন? সারারাত জেগে জেগে

রোগীদের ফাইফরমাশ খাটছে। দাদার অবস্থা খারাপ ব'লে সবাই এসে একবার ক'রে দেখে যাচ্ছে। নার্স যে কতবার এল! সবাই তটস্থ···দাদাকে বাঁচাবার জন্যে সবারই যেন প্রাণপণ চেষ্টা। বাঁচলে সবাই খুশী হয়। নার্স একবার আমায় বললে—তুমি একটু ঘুমিয়ে নাও বাবু। সারারাত জেগে ব'সে থাকলে অসুখ করবে তোমার।

হাসপাতালটিকে আমার মনে হ'ল যেন স্বর্গ। আর্ত্তের সেবা যেখানকার মানুষে মনপ্রাণ দিয়ে করে, সে স্বর্গই। ওই বুড়ো মেথরটা এখানকার দেবদূত। যেদিন কয়েক শতাব্দী আগে শ্রীচৈতন্য গৃহত্যাগ করেছিলেন, কিংবা শঙ্করাচার্য্য সংসারের অসারত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করেছিলেন—তাঁদের স্বপ্নে এই স্বর্গের কল্পনা ছিল। চৈতন্যদেবের সংকীর্ত্তনের দলে নবদ্বীপের গঙ্গার তীরে এই বুড়ো মেথরটা যোগদান করতে পারত, তিনি ওকে কোল দিতেন, ঝাড়খণ্ডের পথে শ্রীক্ষেত্র রওনা হবার সময়ে ওকে পার্শ্বচর ক'রে নিতেন। ···রাত সাড়ে তিনটে। রাত আজ কি পোয়াবে না? বৃষ্টি একটু থেমেছে। আকাশ কিন্তু মেঘে মেঘে কালো।

এই সময়ে দাদার নাভিশ্বাস উপস্থিত হ'ল। কলের ঘোলা জল দাদার মুখে দিলাম। কানের কাছে গঙ্গানারায়ণব্রহ্ম নাম উচ্চারণ করলাম। এই বিপদের সময় কি জানি কেন মালতীর কথা মনে পড়ল। মালতী যদি এখানে থাকত! আটঘরার অশ্বত্থতলার সেই বিষ্ণুমূর্ত্তির কথা মনে পড়ল—হে দেব, দাদার যাওয়ার পথ আপনি সুগম ক'রে দিন। আপনার আশীর্ব্বাদে তার জীবনের সকল ত্রুটি, সকল গ্লানি ধুয়ে মুছে পবিত্র হোক্, যে সমুদ্র আপনার অনন্ত শয্যা, যে লোকালোক পর্ব্বত আপনার মেখলা—সে-সব পার হয়েও বহুদূরের যে পথে দাদার আজ যাত্রা, আপনার কৃপায় সে পথ তার বাধাশূন্য হোক্, নির্ভয় হোক্, মঙ্গলময় হোক্।

পাশের বিছানার রোগী বললে—একবার মেডিকেল অফিসারকে ডাকান না!

আমি বললাম—আর মিথ্যে কেন?

তার পর আরও ঘণ্টাখানেক কেটে গেল। আমার ঘুম এসেছে, ভয়ানক ঘুম। কিছুতেই আর চোখ খুলে রাখতে পারি নে। মধ্যে নার্স দুবার এল, আমি তা ঘুমের ঘোরেই জানি—আমায় জাগালে না। পা টিপে টিপে এল, পা টিপেই চলে গেল।

হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল। ভোর হবার দেরি নেই, হাসপাতালের আলো নিষ্প্রভ হয়ে এসেছে—কিন্তু ঘন কালো মেঘে আকাশ ঢাকা, দিনের আলো যদিও একটু থাকে, বোঝা যাচ্ছে না। দাদার খাটের দিকে চেয়ে আমি বিস্ময়ে কেমন হয়ে গেলাম। এখনও ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছি নাকি? দাদার খাটের চারি পাশে অনেক লোক দাঁড়িয়ে। অর্দ্ধচন্দ্রাকারে ওরা দাদার খাটটাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। শিয়রের কাছে মা, ডানদিকে বাবা, বাবার পাশেই আটঘরার সেই হীরু রায়—স্যালাইনের টিনটা যেখানে ঝোলানো, সেখানে দাঁড়িয়ে আমাদের চা-বাগানের নেপালী চাকর থাপা, ছেলেবেলায় দাদাকে যে কোলেপিঠে ক'রে মানুষ করেছিল। তার পরই আমার চোখ পড়ল খাটের বাঁ দিকে, সেখানে দাঁড়িয়ে আছে ছোট কাকীমার মেয়ে পানী। এদের মূর্ত্তি এত সুস্পষ্ট ও বাস্তব যে একবার আমার মনে হ'ল ওদের সকলেই দেখছে বোধ হয়। পাশের খাটের রোগীর দিকে চেয়ে দেখলুম, সে যদিও জেগে আছে এবং মাঝে মাঝে দাদার খাটের দিকে চাইছে—কিন্তু তার মুখ-চোখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল মুমূর্ষু দাদাকে ছাড়া সে আর কিছু দেখছে না। অথচ কেন দেখতে পাচ্ছে না, এত স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ, সজীব মানুষগুলোকে কেন যে ওরা দেখে না—এ ভেবে ছেলেবেলা থেকে আমার বিস্ময়ের অন্ত নেই।

আমি জানি এসব কথা লোককে বিশ্বাস করানো শক্ত। মানুষ চোখে যা দেখে না,

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় যা পারে না—তা বিশ্বাস করতে সহজে রাজী হয় না। এই জন্যে হাসপাতালের এই রাত্রিটির কথা আমি একটি প্রাণীকেও বলি নি কোনদিন।

দু-তিন মিনিট কেটে গেল। ওরা এখনও রয়েছে। আমি চোখ মুছলাম, এদিক-ওদিক চাইলাম—চোখে জল দিলাম উঠে। এখনও ওরা রয়েছে। ওদের সবারই চোখ দাদার খাটের দিকে। আমি ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে পানীর কাছে দাঁড়ালাম। ওরা সবাই হাসিমুখে আমার দিকে চাইলে। কত কথা বলব ভাবলাম মাকে, বাবাকে, পানীকে—থাপা কবে মারা গিয়েছে জানি নে—সে এখনও তাহ'লে আমাদের ভোলে নি? তাকে কি বলব ভাবলাম—কিন্তু মুখ দিয়ে আমার কথা বেরুল না। এই সময়ে নার্স এল। আমি আশ্চর্য্য হয়ে ভাবছি নার্স কি এদের দেখতে পাবে না? এই তো সবাই এরা এখানে দাঁড়িয়ে। নার্স কিন্তু এমন ভাবে এল যেন আমি ছাড়া সেখানে আর কেউ নেই। দাদার মুখের দিকে চেয়ে বললে—এ তো হয়ে গিয়েচে—এ কুলি, কুলি—

কুলি খাটটাকে ঘেরাটোপ দিয়ে ঢেকে দিতে এল।

তখনও ওরা রয়েছে।...

তার পর আমার একটা অবসন্ন ভাব হ'ল—আমার সেই সুপরিচিত অবসন্ন ভাবটা। যখনই এ-রকম আগে দেখতাম, তখনই এ-রকম হ'ত। মনে পড়ল কত দিন পরে আবার দেখলাম আজ—বহুকাল পরে এই জিনিসটা পেয়েছি—হারিয়ে গিয়েছিল, সন্ধান পাই নি অনেক দিন, ভেবেছিলুম আর বোধ হয় পাব না—আজ দাদার শেষশয্যার পাশে দাঁড়িয়ে তা ফিরে পেয়েছি। আমার গা যেন ঘুরে উঠল—পাশের চেয়ারে ধপ্ ক'রে ব'সে পড়লাম।

নার্স আমার দিকে চেয়ে বললে—পুওর বয়!

জীবনে নিষ্ঠুর ও হৃদয়হীন কাজ একেবারে করি নি তা নয়, কিন্তু বৌদিদিকে দাদার মৃত্যু-সংবাদটা দেওয়ার মত নিষ্ঠুর কাজ আর যে কখনও করি নি, একথা শপথ ক'রে বলতে পারি। বেলা দুটোর সময় দাদার বাড়ি গিয়ে পৌঁছলাম। পথে দাদার শ্বশুরবাড়ির এক সরিকের সঙ্গে দেখা। আমার মুখে খবর শুনেই সে গিয়ে নিজের বাড়িতে অবিলম্বে খবরটি জানালে। বোধ হয় যেন বৌদিদির ওপর আড়ি করেই ওদের বাড়ির মেয়েরা—যারা দাদার অসুখের সময় কখনও চোখের দেখাও দেখতে আসে নি—চীৎকার করে কান্না জুড়ে দিলে। বৌদিদি তখন অত বেলায় দুটো রেঁধে ছেলেমেয়েকে খাইয়ে আঁচিয়ে দিচ্ছে। নিজে তখনও খায় নি। পাশের বাড়িতে কান্নার রোল শুনে বৌদিদি বিস্ময়ের সুরে জিজ্ঞেস করছে—হ্যাঁ রে বিনু, ওরা কাঁদছে কেন রে? কি খবর এল ওদের? কারও কি অসুখ-বিসুখ?

এমন সময়ে আমি বাড়ি ঢুকলাম। আমায় দেখে বৌদিদির মুখ শুকিয়ে গেল। বললে—ঠাকুরপো! তোমার দাদা কোথায়?

আমি বললাম—দাদা নেই, কাল মারা গিয়েছে।

বৌদিদি কাঁদলে না। কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল আমার মুখের দিকে চেয়ে।

পাশের বাড়িতে তখন ইনিয়ে-বিনিয়ে নানা ছন্দে ও সুরে শোক-প্রকাশের ঘটা কি! পাড়ার অনেক মেয়ে এলেন সান্ত্বনা দিতে বৌদিদিকে। কিন্তু একটু পরে যখন বৌদিদি পুকুরের ঘাটে নাইতে গেল, সঙ্গে একজন যাওয়া দরকার নিয়মমত—তখন—এক একটা অজুহাতে যে যার বাড়িতে চলে গেল। আমি বিস্মিত হলাম এই ভেবে যে এরা তো বৌদিদির বাপের বাড়িরই লোক! তার একটু পরে বৌদিদি খানিকটা কাঁদলে। হঠাৎ কান্না থামিয়ে

বললে শেষকালে জ্ঞান ছিল ঠাকুরপো ? সেই তো মরেই গেল—হাসপাতালে না নিয়ে গেলেই হ'ত ! তবু আপনার জন কাছে থাকত !

আমি বললাম—বৌদিদি, তুমি ভেবো না, এখানে যে রকম গতিক দেখছি তাতে এখানে থাকলে দাদার চিকিৎসাই হ'ত না। এখানে কেউ তোমায় তো দেখে না দেখছি। হাসপাতালের লোকে যথেষ্ট করেছে। বাড়িতে সে রকম হয় না। আমাদের অবস্থার লোকের পক্ষে হাসপাতালই ভাল।

বৌদিদির বাবা মা কেউ নেই—মা আগেই মারা গিয়েছিলেন—বাবা মারা গিয়েছেন আর বছর। এ কথা কলকাতাতেই বৌদিদির ভায়ের মুখে শুনেছিলাম। বৌদিদির সে ভাইটিকে দেখে আমার মনে হয়েছিল এ নিতান্ত অপদার্থ—তার ওপর নিতান্ত গরীব, বর্ত্তমানে কপর্দ্দকহীন বেকার—তার কিছু করবার ক্ষমতা নেই। বয়সও অল্প, সে কলকাতা ছেড়ে আসে নি, সেখানে চাকুরির চেষ্টা করছে।

ভেবে দেখলাম এদের সংসারের ভার এখন আমিই না নিলে এতগুলি প্রাণী না খেয়ে মরবে। দাদা এদের একেবারে পথে বসিয়ে রেখে গেছে। কাল কি করে চলবে সে সংস্থানও নেই এদের। তার উপর দাদার অসুখের সময় কিছু দেনাও হয়েছে।

এদের ছেড়ে কোথাও নড়তে পারলুম না শেষ পর্য্যন্ত। কালীগঞ্জেই থাকতে হ'ল। এখান থেকে দাদার সংসার অন্য স্থানে নিয়ে গেলাম না, কারণ আটঘরাতে এদের নিয়ে যাবার যো নেই, অন্য জায়গায় আমার নিজের রোজগারের সুবিধা না হওয়া পর্য্যন্ত বাড়ি-ভাড়া দিই কি ক'রে ?

এ সময়ে সাহায্য সত্যি সত্যিই পেলুম দাদার সেই মাসীমার কাছ থেকে—সেই যে বাতাসার কারখানার মালিক কুণ্ডু মশায়ের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী—সেবার যিনি আমাদের নিমন্ত্রণ ক'রে খাইয়েছিলেন। এই বিপদের সময় আমাদের কোন ব্রাহ্মণ প্রতিবেশীর কাছ থেকে সে-রকম সাহায্য আসে নি।

ক্রমে মাসের পর মাস যেতে লাগল।

সংসার কখনো করি নি, করবো না ভেবেছিলাম। কিন্তু যখন এ-ভাবে দাদার ভার আমার ওপর পড়ল, তখন দেখলাম এ এক শিক্ষা—মানুষের দৈনন্দিন অভাব-অনটনের মধ্যে দিয়ে, ছোটখাটো ত্যাগ স্বীকারের মধ্যে দিয়ে, পরের জন্যে খাটুনি ও ভাবনার মধ্যে দিয়ে, তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর পারিপার্শ্বিকের মধ্যে দিয়ে এই যে এতগুলি প্রাণীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও জীবন-যাত্রার গুরুভার নিজের ওপর নিয়ে সংসার-পথে চলার দুঃখ—এই দুঃখের একটা সার্থকতা আছে। আমার জীবন এর আগে চলেছিল শুধু নিজেকে কেন্দ্র ক'রে, পরকে সুখী ক'রে নিজেকে পরিপূর্ণ করার শিক্ষা আমায় দিয়েছে মালতী। পথে বেরিয়ে অনেক শিক্ষার মধ্যে এটিই আমার জীবনে সবচেয়ে বড় শিক্ষা।

কত জায়গায় চাকুরি খুঁজলাম। আমি যে লেখাপড়া জানি বাজারে তার দাম কানাকড়িও না। হাতের কোন কাজও জানি নে, সবতাতেই আনাড়ি। কুণ্ডু মহাশয়ের স্ত্রীর সুপারিশ ধরে বাতাসার কারখানাতেই খাতা লেখার কাজ যোগাড় করলাম—এ কাজটা জানতাম, কলকাতায় চাকুরির সময় মেজবাবুদের জমিদারী সেরেস্তায় শিখেছিলাম তাই রক্ষে। কিন্তু তাতে ক'টাকা আসে ? বৌদিদির মত গৃহিণী, তাই ওই সামান্য টাকার মধ্যে সংসার চালানো সম্ভব হয়েছে।

ফাল্গুন মাস পড়ে গেল। গাংনাপুরের হাটে আমি কাজে বেরিয়েছি গরুর গাড়ি ক'রে। মাইল-বারো দূর হবে, বেগুন পটলের বাজরার ওপরে চটের থলে পেতে নিয়ে আমি আর তন্থ চৌধুরী ব'সে। তন্থ চৌধুরীর বাড়ি নদীয়া মেহেরপুরে, এখানকার বাজারের সাহেবের পাটের গদির গোমস্তা গাংনাপুরে খরিদ্দারের কাছে মাল দেখাতে যাচ্ছে।

গল্প করতে করতে তন্থ চৌধুরী ঘুমিয়ে পড়ল বাজরার উপরেই। আমি চুপ ক'রে ব'সে আছি। পথের ধারে গাছে গাছে কচি পাতা গজিয়েছে, ঘেঁটুফুলের ঝাড় পথের পাশে মাঠের মধ্যে সর্ব্বত্র।

শেষরাত্রে বেরিয়েছিলুম, ভোর হবার দেরি নেই, কি সুন্দর ঝিরঝিরে ভোরের হাওয়া, পূব আকাশে জ্বলজ্বলে বৃশ্চিক রাশির নক্ষত্রগুলো বাঁশবনের মাথায় ঝুঁকে পড়েছে—যেন ওই দ্যুতিমান তারার মণ্ডলী পৃথিবীর সকল সুখদুঃখের বাস্তবতার বন্ধনের সঙ্গে উর্দ্ধ আকাশের সীমাহীন উদার মুক্তির একটা যোগ-সেতু নির্ম্মাণ করেছে—যেন আমাদের জীবনের ভারক্লিষ্ট যাত্রাপথের সংকীর্ণ পরিসরের প্রতি নক্ষত্র-জগৎ দয়াপরবশ হয়ে জ্যোতির দূত পাঠিয়েছে আমাদের আশার বাণী শোনাতে—যে কেউ উঁচু দিকে চেয়ে দেখবে চলতে চলতে, সে-ই দেখতে পাবে তার শাশ্বত মৃত্যুহীন রূপ। যে চিনবে, যে বলবে আমার সঙ্গে তোমার আধ্যাত্মিক যোগ আছে—আমি জানি আমি বিশ্বের সকল সম্পদের, সকল সৌন্দর্য্যের, সকল কল্যাণের উত্তরাধিকারী—তার কাছেই ওর বাণী সার্থকতা লাভ করবে।

এই প্রস্ফুট বন-কুসুম-গন্ধ আমার মনে মাঝে মাঝে কেমন একটা বেদনা জাগায়, যেন কি পেয়েছিলুম, হারিয়ে ফেলেছি। এই উদীয়মান সূর্য্যের অরুণ রাগ অতীত দিনের কত কথা মনে এনে দেয়। সব সময় আমি সে-সব কথা মনে স্থান দিতে রাজী হই নে, অতীতকে আঁকড়ে ধরে বসে থাকা আমার রীতি নয়। তাতে দুঃখ বাড়ে বই কমে না। হঠাৎ দেখি অন্যমনস্ক হয়ে কখন ভাবছি, দ্বারবাসিনীর আখড়া থেকে সেই ভোরে যে আমি চুপি চুপি পালিয়ে এসেছিলাম—কাউকে না জানিয়ে, মালতীকে তো একবার জানালে পারতাম—মালতীর ওপর এতটা নিষ্ঠুর আমি হয়েছিলুম কেমন ক'রে!

ওকথা চেপে যাই—মন থেকে ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করি। আগে যতটা কষ্ট হ'ত এসব চিন্তায়—এখন আর ততটা হয় না, এটা বেশ বুঝতে পারি। মালতীকে ভুলে যেতে থাকি—কিছুদিন পরে আরও যাব। এক সময়ে যে এত কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল সে আজ সপ্তসিন্ধু-পারের দেশের রাজকন্যার মত অবাস্তব হয়ে আসছে। হয়ত একদিন একেবারেই ভুলে যাব। জীবন চলে নিজের পথে নিজের মর্জ্জিমত—কারও জন্যে সে অপেক্ষা করে না। মাঝে মাঝে মনে আনন্দ আসে—যখন ভাবি বহুদিন আগে রাঢ়ের বননীল-দিগ্বলয়ে-ঘেরা মাঠের মধ্যে যে দেবতার স্বপ্ন দেখেছিলুম তিনি আমায় ভুলে যান নি। তাঁরই সন্ধানে বেরিয়েছিলাম, তিনি পথও দেখিয়েছিলেন। এই অনুদার রুদ্ধগতি জীবনেও তিনি আমার মনে আনন্দের বাণী পাঠিয়েছেন।

এতেও ঠিক বলা হ'ল না। সে আনন্দ যখন আসে তখন আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলি, তখন কি করি, কি বলি কিছু জ্ঞান থাকে না—সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। আজও ঠিক তাই হ'ল। আমি হঠাৎ পথের ধারে একটা ঝোপের ছায়ায় নেমে পড়লুম গাড়ি থেকে। তন্থ চৌধুরী বললে—ও কি, উঠে এস। তন্থ চৌধুরী জানে না আমার কি হয় মনের মধ্যে এসব সময়ে, কারও সাহচর্য্য এসব সময়ে আমার অসহ্য হয়, কারও কথায় কান দিতে পারি নে—আমার সকল ইন্দ্রিয় একটা অনুভূতির কেন্দ্রে আবদ্ধ হয়ে পড়ে—একবার চাই শালিখের ছানা-

গুলো খাদ্যকণা খুঁটে খাচ্ছে যেদিকে, তাদের অসহায় পক্ষ-ভঙ্গিতে কি যেন লেখা আছে—একবার চাই তিসির ফুলের রঙের আকাশের পানে—ঝলমল প্রভাতের সূর্য্যকিরণের পানে, শস্যশ্যামল পৃথিবীর পানে—কি রূপ! এই আনন্দের মধ্যে দিয়ে আমার দ্বিজত্ব, এক গৌরব-সমৃদ্ধ পবিত্র নবজন্ম।

মনে মনে বলি, আপনি আমায় এ-রকম করে দেবেন না, আমায় সংসার করতে দিন ঠাকুর। দাদার ছেলেমেয়েরা, বৌদিদি আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকে ওদের অন্নের জন্যে, ওদের আমি তো ফেলে দিতে পারব না! এখন আমায় এ-রকম নাচাবেন না।

বৈকালের দিকে পায়ে হেঁটে গাংনাপুরের হাটে পৌছলাম। তনু চৌধুরী আগে থেকে ঠিক করেছে আমার মাথা খারাপ। রাস্তার মধ্যে নেমে পড়লাম কেন ও-রকম?

ফিরবার পথে সন্ধ্যার রাঙা মেঘের দিকে চেয়ে কেবলই মনে হ'ল ভগবানের পথ ঐ পিঙ্গল ও পাটল বর্ণের মেঘপর্ব্বতের ওপারে কোনো অজানা নক্ষত্রপুরীর দিকে নয়, তাঁর পথ আমি যেখান দিয়ে হাঁটছি, ওই কালু-গাড়োয়ান যে পথ দিয়ে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে—এ পথেও! আমার এই পথে আমার সঙ্গে পা ফেলে তিনি চলেছেন এই মুহূর্ত্তে—আমি আছি তাই তিনি আছেন। যেখানে আমার অসাফল্য সেখানে তাঁরও অসাফল্য, আমার যেখানে জয়, সেখানে তাঁরও জয়। আমি যখন সুন্দরের স্বপ্ন দেখি, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের আদর করি, পরের জন্য খাটি—তখন বুঝি ভগবানের বিরাট শক্তির সপক্ষে আমি দাঁড়িয়েছি—বিপক্ষে নয়। এই নীল আকাশ, অগ্নিকেতন উল্কাপুঞ্জ, বিদ্যুৎ আমায় সাহায্য করবে। বিশ্ব যেন সব সময় প্রাণপণে চেষ্টা করছে শিব ও সুন্দরের মধ্যে নিজের সার্থকতাকে খুঁজতে, কিন্তু পদে পদে সে বাধা পাচ্ছে কি ভীষণ! বিশ্বের দেবতা তবুও হাল ছাড়েন নি—তিনি অনন্ত ধৈর্যে পথ চেয়ে আছেন। নীরব সেবাব্রত সূর্য্য ও চন্দ্র আশায় আশায় আছে, সমগ্র অদৃশ্যলোক চেয়ে আছে—আমিও ওদের পক্ষে থাকব। বিশ্বের দেবতার মনে দুঃখ দিতে পারব না। জীবনে মানুষ ততক্ষণ ঠিক শেখে না অনেক জিনিসই, যতক্ষণ সে দুঃখের সম্মুখীন না হয়। আগে স্রোতের শেওলার মত ভেসে ভেসে কত বেড়িয়েছি জীবন-নদীর ঘাটে ঘাটে—তটপ্রান্তবর্ত্তী যে মহীরুহটি শত স্মৃতিতে তিলে তিলে বৰ্দ্ধিত হয়ে স্নানার্থিনীদের ছায়াশীতল আশ্রয় দান করেছে—সে হয়ত বৈচিত্র্য চায় নি তার জীবনে—কিন্তু একটি পরিপূর্ণ শতাব্দীর সূর্য্য তার মাথায় কিরণ বর্ষণ করেছে, তার শাখা-প্রশাখায় ঋতুতে ঋতুতে বনবিহঙ্গদের কৌতুক বিলাস কলকাকলী নিজের আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে—তার মৃদু ও ধীর, পরার্থমুখী গম্ভীর জীবন-ধারা নীল আকাশের অদৃশ্য আশীর্ব্বাদতলে এই একটি শতাব্দী ধরে বয়ে এসেছে—বৈচিত্র্য যেখানে হয়ত আসে নি—গভীরতায় সেখানে করেছে বৈচিত্র্যের ক্ষতিপূরণ। প্রতিদিনের সূর্য্য শুকতারার আলোকোজ্জ্বল রাজপথে রাঙা ধূলি উড়িয়ে রজনীর অন্ধকারে অদৃশ্য হন—প্রতিদিনই সেই সন্ধ্যায় আমার মনে কেমন এক প্রকার আনন্দ আসে—দেখি যে পুকুরের ধারে বর্ষার ব্যাঙের ছাতা সূর্য্যের অমৃত কিরণে বড় হয়ে পুষ্ট হয়ে উঠেছে—দেখি উইয়ের ঢিবিতে নতুন পাখা ওঠা উইয়ের দল অজানা বায়ুলোক ভেদ ক'রে হয়েছে মরণের যাত্রী, শরতের কাশবন জীবন-সৃষ্টির বীজ দূরে দূরে, দিকে দিগন্তে ছড়িয়ে দিয়ে রিক্ততার মধ্যেই পরম কাম্য সার্থকতাকে লাভ করেছে—দারিদ্র্য বা কষ্ট তুচ্ছ, পৃথিবীর সমস্ত বিলাস-লালসাও তুচ্ছ, আমি কিছুই গ্রাহ্য করি নে যদি এই জাগ্রত চেতনাকে কখনও না হারাই—যদি হে বিশ্বদেবতা, বাল্যে তুষারাবৃত কাঞ্চনজঙ্ঘাকে যেমন সকালবেলাকার সূর্য্যের আলোয় সোনার রঙে রঞ্জিত হ'তে দেখতুম—তেমনি যদি আপনি আপনার ভালবাসার রঙে আমার প্রাণ রাঙিয়ে তোলেন—আমিও আপনাকে ভালবাসি যদি—তবে সকল সংকীর্ণতাকে, দুঃখকে

জয় ক'রে আমি আমার বিরাট চেতনার রথচক্র চালিয়ে দিই শতাব্দীর পথে, জন্মকে অতিক্রম ক'রে মৃত্যুর পানে, মৃত্যুকে অতিক্রম ক'রে আবার আনন্দ-ভরা নবজন্মের কোন অজানা রহস্যের আশায়।

॥ ১৫ ॥

দাদার মৃত্যুর মাস তিনেক পরে বাতাসার কারখানার কুণ্ডুমশায় হঠাৎ মারা গেলেন। এতে আমাকে বিপদে পড়তে হ'ল। কুণ্ডুমশায়ের প্রথম পক্ষের ছেলেরা এসে কারখানা ও বাড়িঘর দখল করলে। কুণ্ডুমশায়ের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীকে নিতান্ত ভালমানুষ পেয়ে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে তার হাতের হাজার দুই নগদ টাকা বার ক'রে নিলে। টাকাগুলো হাতে না আসা পর্য্যন্ত ছেলেরা বৌয়েরা সৎশাশুড়ীকে খুব সেবাযত্ন করেছিল, টাকা হস্তগত হওয়ার পরে ক্রমে ক্রমে তাদের মূর্ত্তি গেল বদলে। যা দুর্দ্দশা তার শুরু করলে ওরা! বাড়ির চাকরাণীর মত খাটাতে লাগল, গালমন্দ দেয়, তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে। আমি একদিন গোপনে বললাম—মাসীমা, পঞ্চুকে ডাকঘরের পাস-বই দিও না বা কোন সই চাইলেও দিও না। তুমি অত বোকা কেন তাই ভাবি! আগের টাকাগুলো ওদের হাতে দিয়ে বসলেই বা কি বুঝে?

ডাকঘরের পাস-বইয়ের জন্যে পঞ্চু অনেক পীড়াপীড়ি করেছিল। শেষ পর্য্যন্ত হয়ত মাসীমা দিয়েই দিত—আমি সেখানা নিজের কাছে এনে রাখলাম গোপনে। কত টাকা ডাকঘরে আছে না জানতে পেরে পঞ্চু আরও ক্ষেপে উঠল। বেচারীর দুর্দ্দশার একশেষ ক'রে তুললে। কুণ্ডুমশায়ের স্ত্রীর বড় সাধ ছিল সৎছেলেরা তাকে মা ব'লে ডাকে, সে সাধ তারা ভাল করেই মেটালে! একদিন আমার চোখের সামনে সৎমাকে ঝগড়া ক'রে খিড়কীদোর দিয়ে বাড়ির বার ক'রে দিলে। আমি মাসীমাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এলাম, চিঠি লিখে তার এক দূর-সম্পর্কের ভাইকে আনালাম—সে এসে মাসীমাকে নিয়ে গেল। আমার অসাক্ষাতে মাসীমা আবার বৌদিদির হাতে একখানা একশো টাকার নোট গুঁজে দিয়ে ব'লে গেল যাবার সময়—জিতু মাসীমা বলেছিল, আমি তিলির মেয়ে, কিন্তু বেঁচে থাক সে, ছেলের কাজ করেছে। আমার জন্যেই তার কারখানার চাকরিটা গেল, যত দিন অন্য কিছু না হয়, এতে চালিয়ে নিও, বৌমা। আমি দিচ্ছি এতে কিছু মনে ক'রো না, আমার তিন কুলে কেউ নেই, নিতুর বৌয়ের হাতে দিয়ে সুখ যদি পাই, তা থেকে আমায় নিরাশ ক'রো না।

পঞ্চু কারখানা থেকে আমায় ছাড়িয়ে দিলেও আমি আর একটা দোকানে চাকরি পেলাম সেই মাসেই। সৎমায়ের সঙ্গে ওরকম ব্যবহার করার দরুন কালীগঞ্জে কেউই ওদের ওপর সন্তুষ্ট ছিল না, মাসীমার অমায়িক ব্যবহারে সবাই তাকে ভালবাসত। তবে পঞ্চুদের টাকার জোর ছিল, সব মানিয়ে গেল।

ইতিমধ্যে একদিন সীতার শ্বশুরবাড়ি গেলাম সীতাকে দেখতে। দাদা মারা যাওয়ার পরে ওর সঙ্গে আমার দেখা হয় নি, কারণ এক বেলার জন্যেও ওরা সীতাকে পাঠাতে রাজী হয় নি। সীতা দাদার নাম ক'রে অনেক চোখের জল ফেললে। দাদার সঙ্গে ওর শেষ দেখা মায়ের মৃত্যুর সময়ে। তার পর আমার নিজের কথা অনেক জিজ্ঞেস করলে। সন্ধ্যাবেলায় ও রান্নাঘরে বসে রাঁধছিল, আমি কাছে বসে গল্প করছিলাম। ওর শ্বশুরবাড়ির অবস্থা ভাল না, বসতবাটিটা বেশ বড়ই বটে, কিন্তু বাস করবার উপযুক্ত কুঠুরী মাত্র চারটি, তাদেরও নিতান্ত জীর্ণ অবস্থা,

চুনবালি-খসা দেওয়াল, কার্নিসের ফাটলে বট অশ্বত্থের গাছ। রান্নাঘরের এক দিকের ভাঙা দেওয়াল বাঁশের চাঁচ দিয়ে বন্ধ, কার্ত্তিক মাসের হিম তাতে আটকাচ্ছে না। সীতার বড়-জা ওদিকে আর একটা উনুনে মাটির খুলিতে টাট্‌কা খেজুররস জ্বাল দিচ্ছিলেন, তিনি বললেন—যা হবার হয়ে গেল ভাই, এইবার তুমি একটা বিয়ে কর দিকি? এই গাঁয়েই বাঁড়ুয্যেবাড়িতে ভাল মেয়ে আছে, যদি মত দাও কালই মেয়ে দেখিয়ে দিই।

সীতা চুপ ক'রে রইল। আমি বললাম—একটা সংসার ঘাড়ে পড়েছে, তাই অতি কষ্টে চালাই, আবার একটা সংসার চালাব কোথা থেকে দিদি?

সীতা বললে—বিয়ে আর কাউকে করতে বলি নে মেজদা, এ অবস্থার বড়দারও বিয়ে করা উচিত হয় নি। তোমারও হবে না। তার চেয়ে তুমি সন্নিসি হয়ে বেড়াচ্ছিলে, ঢের ভাল করেছিলে। আচ্ছা মেজদা, তুমি নাকি খুব ধার্ম্মিক হয়ে উঠেছ সবাই বলে?

আমি হেসে বললাম—অপরের কথা বিশ্বাস করিস্ নাকি তুই? পাগল! ধার্ম্মিক হলেই হ'ল অমনি—না? আমি কি ছিলাম, না-ছিলাম তুই তো সব জানিস সীতা। আমার ধাতে ধার্ম্মিক হওয়া সয় না, তবে আমার জীবনের আর একটা কথা তুই জানিস নে, তোকে বলি শোন্।

ওদের মালতীর কথা বললুম, দু-জনেই একমনে শুনলে। ওর বড়-জা বললে—এই তো ভাই মনের মত মানুষ তো পেয়েছিলে—ওরকম ছেড়ে এলে কেন?

আমি বললাম—এক তরফা। তাতে দুঃখই বাড়ে, আনন্দ পাওয়া যায় না। সীতা তো সব শুনলি, তোর কি মনে হয়।

সীতা মুখ টিপে হেসে বললে—এক তরফা ব'লে মনে হয় না। তোমার সঙ্গে অত মিশত না তা হ'লে—বা তোমার সঙ্গে কোথাও যেত না।

একটু চুপ ক'রে থেকে বললে—তুমি আর একবার সেখানে যাও, মেজদা। আমি ঠিক বলছি তুমি চলে আসবার পরেই সে বুঝতে পেরেছে তার আখড়া নিয়ে থাকা ফাঁকা কাজ। ছেলেমানুষ, নিজের মন বুঝতে দেরি হয়। এইবার একবার যাও, গিয়ে তাকে নিয়ে এস তো?

সীতা নিজের কথা বিশেষ কিছু বলে না, কিন্তু ওর ওই শান্ত মৌনতার মধ্যে ওর জীবনের ট্র্যাজেডি লেখা রয়েছে। ওর স্বামী সত্যিই অপদার্থ, সংসারে যথেষ্ট দারিদ্র্য, কখনও বাড়ি থেকে বেরিয়ে দু-পয়সা আনবার চেষ্টা করবে না। এক ধরনের নিষ্কর্ম্মা লোকেরা মনের আলস্য ও দুর্ব্বলতা প্রসূত ভয় থেকে পূজা-আচ্চার প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ে, সীতার স্বামীও তাই। সকালে উঠে ফুল তুলে পূজো করবে, স্নানের সময় ভুল সংস্কৃতে স্তবপাঠ করবে, সব বিষয়ে বিধান দেবে, উপদেশ দেবে। একটু আদা-চা খেতে চাইলাম—সীতাকে বারণ ক'রে ব'লে দিলে—রবিবারে আদা খেতে নেই! দুপুরে খেয়ে উঠেই বিছানায় গিয়ে শোবে, বিকেল চারটে পর্য্যন্ত ঘুমুবে—এত ঘুমুতেও পারে! এদিকে আবার ন'টা বাজতে না বাজতে রাত্রে বিছানা নেবে। সীতা বই পড়ে ব'লে তাকে যথেষ্ট অপমান সহ্য করতে হয়। বই পড়লে মেয়েরা কুলটা হয়, শাস্ত্রে নাকি লেখা আছে!

দেখলাম লোকটা অত্যন্ত দুর্ম্মুখও বটে। কথায় কথায় আমার মুখে একবার যীশুখৃষ্টের নাম শুনে নিতান্ত অসহিষ্ণু ও অভদ্র ভাবে বলে উঠল—ওসব ম্লেচ্ছ ঠাকুর দেবতার নাম ক'রো না এখানে, এটা হিন্দুর বাড়ি, ওসব নাম এখানে চলবে না।

সীতার মুখের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে রইলাম, নইলে এ কথার পর আমি এ বাড়িতে আর জলস্পর্শ করতাম না। সীতা ওবেলা পায়েস পিঠে খাওয়াবার আয়োজন করছে আমি জানি,

তার আদরকে প্রত্যাখ্যান করতে কিছুতেই মন সরল না। আমি রাগ ক'রে চলে গেলে ওর বুকে বড় বিঁধবে। ওকে একেবারেই আমরা জলে ভাসিয়ে দিয়েছি সবাই মিলে। সীতা একটাও অনুযোগের কথা উচ্চারণ করলে না। কারুর বিরুদ্ধেই না। বৌদিদিকে ব'সে ব'সে একখানা লম্বা চিঠি লিখলে, আসবার সময় আমার হাতে দিয়ে বললে—আমায় পাঠাবে না কালীগঞ্জে, তুমি মিছে ব'লে কেন মুখ নষ্ট করবে মেজদা! দরকার নেই। তার পর জল-ভরা হাসি-হাসি চোখে বললে—আবার কবে আসবে? ভুলে থেকো না মেজদা, শীগগির আবার এসো।

পথে আসতে আসতে দুপুরের রোদে একটা গাছের ছায়ায় বসে ওর কথাই ভাবতে লাগলুম। উম্‌প্রাঙের মিশন-বাড়ির কথা মনে পড়ল, মেমেরা সীতাকে কত কি ছুঁচের কাজ, উল-বোনার কাজ শিখিয়েছিল যত্ন ক'রে! কার্ট রোডের ধারে নদীখাতের মধ্যে বসে আমি আর সীতা কত ভবিষ্যতের উজ্জ্বল ছবি এঁকেছি ছেলেমানুষী মনে—কোথায় কি হয়ে গেল সব! মেয়েরাই ধরা পড়ে বেশী, জগতের দুঃখের বোঝা ওদেরই বইতে হয় বেশী ক'রে। সীতার দশা যখনই ভাবি, তখনই তাই আমার মনে হয়।

মনটাতে আমার খুব কষ্ট হয়েছে সীতার স্বামীর একটা কথায়। 'সে আমায় লক্ষ্য ক'রে একটা শ্লোক বললে কাল রাত্রে। তার ভাবার্থ এই—গাছে অনেক লাউ ফলে, কোন লাউয়ের খোলে কৃষ্ণনাম গাইবার একতারা হয়, কোন লাউ আবার বাবুর্চ্চি র'াধে গোমাংসের সঙ্গে।

তার বলবার উদ্দেশ্য, আমি হচ্ছি শেষোক্ত শ্রেণীর লাউ। কেন না, আমি ব্রাহ্মণ হয়ে ব্রাহ্মণের আচার মানি নে, দেবদেবীর পূজো-আচ্চা করি নে ওর মত। ওই সব কারণে ও আমাকে অত্যন্ত কৃপার চক্ষে দেখে বুঝলাম এবং বোধ হয় নিজেকে মনে মনে হরিনামের একতারা বলেই ভাবে।

ভাবুক, তাতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু তার মতের সঙ্গে মিল না হ'লেই সে যদি আমায় ঘৃণা করে তবে আমি নিতান্ত নাচার। কোন্ অপরাধে আমি বাবুর্চ্চির হাতে-র'াধা লাউ? ছেলেবেলায় হিমালয়ের ওক্ পাইন বনে তপস্যাস্তব্ধ কাঞ্চনজঙ্ঘার মূর্ত্তিতে ভগবানের অন্য রূপ দেখেছিলাম, তাই? রাঢ়দেশের নির্জ্জন মাঠের মধ্যে সন্ধ্যায় সেবার সেই এক অপরূপ দেবতার ছবি মনে এঁকে গিয়েছে, তাই? সেই অজানা নামহীন দেবতাকে উদ্দেশ ক'রে বলি—যে যা বলে বলুক, আমি আচার মানি নে, অনুষ্ঠান মানি নে, সম্প্রদায় মানি নে, কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মমত মানি নে, গোঁড়ামি মানি নে,—আমি আপনাকে মানি। আপনাকে ভালবাসি। আপনার এই বননীল দিগন্তের রূপকে ভালবাসি, বিশ্বের এই পথিক রূপকে ভালবাসি। আমার এই চোখ, এই মন জন্মজন্মান্তরেও এই রকম রেখে দেবেন। কখনও যেন ছোট ক'রে আপনাকে দেখতে শিখি নে। আর আমার উপাসনার মন্দির এই মুক্ত আকাশের তলায় যেন চিরযুগ অটুট থাকে। এই ধর্ম্মই আমার ভাল।

বাড়ি ফিরে দেখি বৌদিদি অত্যন্ত অসুখে পড়েছে।

মহাবিপদে পড়ে গেলাম। কারও সাহায্য পাই নে, ছেলেমেয়েরা ছোট ছোট—দাদার বড় মেয়েটি আট বছরের হ'ল, সে সমস্ত কাজ করে, আমি র'াধি আবার বৌদিদির সেবা-শুশ্রূষা করি। রোগিণীর ঠিকমত সেবা পুরুষের দ্বারা সম্ভব নয়, তবুও আমি আর খুকীতে মিলে যতটা পারি করি।

বৌদিদির অসুখ দিন-দিন বেড়ে উঠতে লাগল। সংসারে বিশৃঙ্খলার একশেষ—বৌদিদি

অচৈতন্ত হয়ে বিছানায় শুয়ে, ছেলেমেয়েরা যা খুশী তাই করচে, ঘরের জিনিসপত্র ভাঙছে, ফেলছে, ছড়াচ্ছে—এখানে নোংরা, ওখানে অপরিষ্কার—কোন্ জিনিস কোথায় থাকে কেউ বলতে পারে না, হঠাৎ অসময়ে আবিষ্কার করি, ঘড়ায় খাবার জল নেই, কি লণ্ঠন জ্বালাবার তেল নেই। বাজার নিকটে নয়, অন্ততঃ দেড় মাইল দূরে এবং বাজারে যেতে হবে আমাকেই। সুতরাং বেশ বোঝা যাবে অসময়ে এসব আবিষ্কারের অর্থ কি।

প্রায় এক মাস এই ভাবে কাটল। এই এক মাসের কথা ভাবলে আমার ভয় হয়। আমি জানতুম না কখনও যে জগতে এত দুঃখ আছে বা সংসারের দায়িত্ব এত বেশী। রাত দিন কখন কাটে ভুলে গেলাম, দিন, বার, তারিখের হিসেব হারিয়ে ফেলেছিলুম—কলের পুতুলের মত ডাক্তারের কাছে যাই, রোগীর সেবা করি, চাকরি করি, ছেলেমেয়েদের দেখা-শুনো করি। এই দুঃসময়ে দাদার আট বছরের মেয়েটা আমাকে অদ্ভুত সাহায্য করলে। সে নিজে রাঁধে, মায়ের পথ্য তৈয়ারী করে, মায়ের কাছে বসে থাকে—আমি যখন কাজে বেরিয়ে যাই ওকে ব'লে যাই ঠিক সময় ওষুধ খাওয়াতে, কি পথ্য দিতে।

মেজাজ আমার কেমন খারাপ হয়ে গিয়েছিল বোধ হয়, একদিন কোথা থেকে এসে দেখি রোগিণীর সামনের ওষুধের গ্লাসে ওষুধ রয়েছে। খুকীকে ব'লে গিয়েছি খাওয়াতে কিন্তু সে ওষুধ গ্লাসে ঢেলে মায়ের পাশে রেখে দিয়ে কোথায় চলে গিয়েছে। দেখে হঠাৎ রাগে আমার আপাদমস্তক জ্বলে উঠল আর ঠিক সেই সময় খুকী আঁচলে কি বেঁধে নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকল। আমি রুক্ষ স্বরে বললাম—খুকী, এদিকে এস—

আমার গলার স্বর শুনে খুকীর মুখ শুকিয়ে গেল ভয়ে। সে ভয়ে ভয়ে দু-এক পা এগিয়ে আসতে লাগল, বরাবর আমার চোখের দিকে চোখ রেখে। আমি বললাম—তোর মাকে ওষুধ খাওয়াস নি কেন? কোথায় বেরিয়েছিলি বাড়ি থেকে?

সে কোন জবাব দিতে পারল না—ভয়ে নীলবর্ণ হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ কি যে রাগ হ'ল চণ্ডালের মত! তাকে পাখার বাঁট দিয়ে আথালি-পাথালি মারতে লাগলাম—প্রথম ভয়ে মার খেয়েও সে কিছু বললে না, তার পরে আমার মারের বহর দেখে সে ভয়ে কেঁদে উঠে বললে—ও কাকাবাবু, আপনার পায়ে পড়ি, আমায় আর মারবেন না, আর কখনও এমন করবো না—

তার হাতের মুঠো আল্‌গা হয়ে আঁচলের প্রান্ত থেকে দুটো মুড়ি পড়ে গেল মেঝেতে। সে মুড়ি কিনতে গিয়েছিল এক পয়সার, খিদে পেয়েছিল ব'লে। ভয়ে তাও যেন তার মনে হচ্ছে কি অপরাধই সে ক'রে ফেলেছে!

আমার জ্ঞান হঠাৎ ফিরে এল। মুড়ি ক'টা মেঝেতে পড়ে যাওয়ার ঐ দৃশ্যে বোধ হয়। নিজেকে সামলে নিয়ে ঘর থেকে বার হয়ে গেলাম। সমস্ত দিন ভাবলাম—ছি, এ কি ক'রে বসলাম! আট বছরের কচি মেয়েটা সারাদিন ধরে খাটছে, এক পয়সার মুড়ি কিনতে গিয়েছে আর তাকে এমনি ক'রে নির্মমভাবে প্রহার করলাম কোন্ প্রাণে?

জীবনে কত লোকের কত বিচার করেছি তাদের দোষগুণের জন্যে—দেখলাম কাউকে বিচার করা চলে না—কোন্ অবস্থার মধ্যে প'ড়ে কে কি করে সে কথা কি কেউ বুঝে দেখে?

বৌদিদির অসুখ ক্রমে অত্যন্ত বেড়ে উঠল। দিন-দিন বিছানার সঙ্গে মিশে যেতে লাগল দেখে ভয়ে আমার প্রাণ উড়ে যাচ্ছে। এদিকে এক মহা দুশ্চিন্তা এসে জুটল, যদি বৌদিদি না-ই বাঁচে—এই ছোট ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে আমি কি করব? বিশেষ ক'রে কোলের মেয়েটাকে নিয়ে কি করি? ছোট্ট খুকী মোটে এই দশ মাসের—কি সুন্দর গড়ন,

মুখ, কি চমৎকার মিষ্টি হাসি! এই দেড় মাস তার অযত্নের একশেষ হচ্ছে—উঠোনের নারকোলতলায় চটের থলে পেতে তাকে রোদ্দুরে শুইয়ে রাখা হয়—বড় খুকী সব সময় তাকে দেখতে পারে না—কাঁদলে দেখবার লোক নেই, মাতৃস্তন্য বন্ধ এই দেড় মাস—হর্লিক্‌স্ খাইয়ে অতি কষ্টে চলছে। রাত্রে আমার পাশে তাকে শুইয়ে রাখি, মাঝরাত্রে উঠে এমন কান্না শুরু করে মাঝে মাঝে—ঘুমের ঘোরে উঠে তাকে চাপড়ে চাপড়ে ঘুম পাড়াই—বড় খুকীকে আর ওঠাই নে। রাত্রে তো প্রায়ই ঘুম হয় না, রোগীকে দেখা-শুনো করতেই রাত কাটে—মাঝে মাঝে একটু ঘুমিয়ে পড়ি। পাড়ায় এত বৌ-ঝি আছে—দেখে বিস্মিত হয়ে গেলাম কেউ কোনদিন বলে না খুকীকে নিয়ে গিয়ে একবার মাইয়ের দুধ দিই। আমি একা কত দিকে যাব—তা ছাড়া আমার হাতের পয়সাও ফুরিয়েছে। এই দেড় মাসের মধ্যে সংসারের রূপ একেবারে বদলে গিয়েছে আমার চোখে—আমি ক্রমেই আবিষ্কার করলাম মানুষ মানুষকে বিনাস্বার্থে কখনও সাহায্য করে না—আমি দরিদ্র, আমার কাছে কারুর কোন স্বার্থের প্রত্যাশা নেই, কাজেই আমার বিপদে কেউ উঁকি মেরেও দেখতে এল না। না আসুক, কিন্তু কোলের খুকীটাকে নিয়ে যে বড় মুশকিলে পড়ে গেলাম! ও দিন-দিন আমার চোখের সামনে রোগা হয়ে যাচ্ছে, ওর অমন কাঁচা সোনার রঙের ননীর পুতুলের মত ক্ষুদে দেহটিকে যেন কালি মেড়ে দিচ্ছে দিন-দিন—কি করবো ভেবে পাই নে, আমি একেবারেই নিরুপায়! স্তন্যদুগ্ধ আমি ওকে দিতে তো পারি নে!

কিন্তু এর মধ্যে আবার মুশকিল এই হ'ল যে স্তন্যদুগ্ধ তো দূরের কথা, গরুর দুধও গ্রামে পাওয়া দুষ্কর হয়ে উঠল। গোয়ালারা ছানা তৈরি ক'রে কলকাতায় চালান দেয়, দুধ কেউ বিক্রী করে না। একজন গোয়ালার বাড়িতে দুধের বন্দোবস্ত করলাম—সে বেলা বারোটা-একটার এদিকে দুধ দিত না। খুকী ক্ষিদেতে ছট্‌ফট্ করত, কিন্তু চুপ ক'রে থাকত—একটুও কাঁদত না। আমার বুড়ো-আঙুলটা ধরে তার মুখের কাছে সে সময় ধরলেই সে কচি অসহায় হাত দুটি দিয়ে আমার আঙুলটা ধরে তার মুখের মধ্যে পুরে দিয়ে ব্যগ্র, ক্ষুধার্ত ভাবে চুষত—তা থেকেই বুঝতাম মাতৃস্তন্য-বঞ্চিত এই হতভাগ্য শিশুর স্তন্যক্ষুধার পরিমাণ।

ওকে কেউ দেখতে পারে না—দু-একটি পাড়ার মেয়ে যারা বেড়াতে আসত, তারা ওকে দেখে নানা রকম মন্তব্য করত। ওর অপরাধ এই যে ও জন্মাতেই ওর বাবা মারা গেল, ওর মা শক্ত অসুখে পড়ল। খুকীর একটা অভ্যাস যখন-তখন হাসা—কেউ দেখুক আর না-ই দেখুক, সে আপন মনে ঘরের আড়ার দিকে চেয়ে ফিক্ ক'রে একগাল হাসবে। তার সে ক্ষুধাশীর্ণ মুখের পবিত্র, সুন্দর হাসি কতবার দেখেছি—কিন্তু সবাই বলত, আহা কি হাসে, আর হাসতে হবে না, কে তোমার হাসি দেখছে? উঠোনের নারকোলতলায় চট পেতে রৌদ্রে তাকে শুইয়ে রাখা হয়েছে, কত দিন দেখেছি নীল আকাশের দিকে চোখ দুটি তুলে সে আপন মনে অবোধ হাসি হাসছে। সে অকারণ, অপার্থিব হাসি কি অপূর্ব্ব অর্থহীন খুশিতে ভরা! ছোট্ট দেহটি দিন-দিন হাড়সার হয়ে যাচ্ছে, অমন সোনার রং কালো হয়ে গেল, তবুও ওর মুখে সেই হাসি দেখছি মাঝে মাঝে—কেন হাসে, কি দেখে হাসে কে বলবে?

এক এক দিন রাত্রে ঘুম ভেঙে দেখি ও খুব চেঁচিয়ে কাঁদছে। মাথা চাপড়াতে চাপড়াতে আবার ঘুমিয়ে পড়ত। বড় খুকীকে বলতাম—একটু দুধ দে তো গরম ক'রে, হয়ত খিদেয় কাঁদছে। সব দিন আবার রাত্রে দুধ থাকত না। সেদিন আঙুল চুষিয়ে অনেক কষ্টে ঘুম পাড়াতে হ'ত। একদিন সকালে ওর কান্না দেখে আর থাকতে পারলাম না—রোগীর সেবা ফেলে দু-ক্রোশ তফাতের একটা গ্রাম থেকে নগদ পয়সা দিয়ে আধসের দুধ যোগাড় ক'রে নিয়ে

এসে ওকে খাওয়ালুম। গোয়ালাকে কত খোশামোদ করেও বেলা বারোটার আগে কিছুতেই দুধ দেওয়ানো গেল না।

মানুষ যদি বিবেচনাহীন হয়, নির্ব্বোধ হয়, তবে বাইরে থেকে তাকে পশুর চেয়েও নিষ্ঠুর মনে করা দোষের নয়। যখন খুকীর দুধের জন্যে আমি সারা গ্রামখানার প্রত্যেক গোয়ালা-বাড়ি খুঁজে বেড়িয়েছি, যদি সকালের দিকে কেউ একটু দুধ দিতে পারে—যে বলেছে হয়ত ওখানে গেলে পাওয়া যাবে সেখানেই ছুটে গিয়েছি, আগাম টাকা দিতে চেয়েছি কিন্তু প্রতি-বারই বিফল হয়ে ফিরে এসেছি—সে সময় ঠিক আমার বাড়ির পাশেই সুরপতি মুখুয্যের বাড়িতে দেড় সের ক'রে দুধ হ'ত। সুরপতি সস্ত্রীক বিদেশে থাকেন, বাড়িতে থাকেন তাঁর বিধবা ভাজ নিজের একমাত্র বিধবা মেয়ে নিয়ে। এঁদের অবস্থা ভাল, দোতলা কোঠা বাড়ি, ছ-সাতটা গরু, জমিজমা, ধানভরা গোলা। সকালে মায়ে-ঝিয়ের চা খাবার জন্যে দুধ দোয়া হ'ত, মেয়েটা নিজেই গাই দুইতে জানে, সকালে আধ সের দুধ হয়, দুপুরে বাকী এক সের। ওঁরা জানেন যে দুধের জন্যে খুকীর কি কষ্ট যাচ্ছে, তাঁদের সঙ্গে আমার এ সম্বন্ধে কথাও হয়েছে অনেকবার। আমায় অনেকবার প্রৌঢ়া মহিলাটি জিজ্ঞেসও করেছেন আমি দুধের কোন সুবিধে করতে পারলাম কি না—দু-চার দিন সকালে ডেকে আমায় চা-ও খাইয়েছেন, কিন্তু কখনও বলেন নি, এই দুধটুকু নিয়ে গিয়ে খুকীকে খাওয়াও ততক্ষণ। আমিও কখনও তাঁদের বলি নি এ নিয়ে, প্রথমতঃ আমার বাধ-বাধ ঠেকেছে, দ্বিতীয়তঃ আমার মনে হয়েছে, এঁরা সব জেনেও যখন নিজে থেকে দুধের কথা বলেন নি, তখন আমি বললেও এঁরা ছলছুতো তুলে দুধ দেবেন না। তবুও আমি এঁদের নিষ্ঠুর বা স্বার্থপর ভাবতে পারি নে—বিবেচনাহীনতা ও কল্পনাশক্তির অভাব এঁদের এরকম ক'রে তুলেছে।

কতবার ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছি—"ওর কষ্ট আমি আর দেখতে পারি নে, আপনি ওকে একটু দুধ দিন।"

ওর মুখের সে অবোধ উল্লাসের হাসি প্রতিবার ছুরির মত আমার বুকে বিঁধেছে। কতবার মনে মনে ভেবেছি আমি যদি দেশের ডিক্‌টেটর হতাম, তবে আইন ক'রে দিতাম শিশুদের দুধ না দিয়ে কেউ আর কোন কাজে দুধকে লাগাতে পারবে না।

কতবার ভেবেছি বৌদিদি যদি না বাঁচে, এই কচি শিশুকে আমি কি ক'রে মানুষ করব? স্তন্যদুগ্ধ একে কেউ দেবে না এই পাড়াগাঁয়ে, বিলিয়ে দিলেও মেয়েসন্তান কেউ নিতে চাইবে না—নিতান্ত নীচু জাত ছাড়া। আটঘরাতে থাকতে ছেলেবেলায় এরকম একটা ব্যাপার শুনেছিলুম—গ্রামের শশীপদ ভট্‌চাজের কেউ ছিল না—এদিকে শিশু দুটিই মেয়ে, অবশেষে যদু মুচির বৌ এসে মেয়ে দুটিকে নিয়ে গিয়েছিল!

এই সোনার খুকীকে সেই রকম বিলিয়ে দিতে হবে পরের হাতে? কত বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছি ঘুমন্ত শিশুর মুখের দিকে চেয়ে এই ভাবনায়। এই বিপদে আমার প্রায়ই মনে হয়েছে মালতীর কথা। মালতী আমায় এ বিপদ থেকে উদ্ধার করবে, সে কোন উপায় বার করবেই, যদি খুকীকে বুকে নিয়ে তার কাছে গিয়ে দাঁড়াই। সে চুপ ক'রে থাকতে পারবে না। তার ওপর অভিমান ক'রে চলে এসেছিলাম, দেখা পর্য্যন্ত ক'রে আসি নি আসার সময়—আর তার পর এতদিন কোন খোঁজখবর নিই নি—একখানা চিঠি পর্য্যন্ত দিই নি, আমার বিপদের সময় সে আমার সব দোষ ক্ষমা ক'রে নেবে!

কিন্তু খুকী আমায় সব চিন্তা থেকে মুক্ত করে দিলে। তার যে হাসি কেউ দেখতে চাইত না, একদিন শেষরাত্রি থেকে সে হাসি চিরকালের জন্য মিলিয়ে গেল। অল্পদিনের জন্যে এসেছিল

কিন্তু বড় কষ্ট পেয়ে গেল। কিছুই সে চায় নি, শুধু একটু মাতৃস্তন্য, কি লোলুপ হয়ে উঠেছিল তার জন্যে, তার ক্ষুদে ক্ষুদে হাত দুটি দিয়ে ব্যগ্রভাবে আমার আঙুলটা আঁকড়ে ধরে কি অধীর আগ্রহে সেটা চুষত মাতৃস্তন ভেবে! আমারও কি কম কষ্ট গিয়েছে অবোধ শিশুকে এই প্রতারণা করতে? জগতে কত লোক কত সঙ্গত অসঙ্গত খেয়াল পরিতৃপ্ত করবার সুযোগ ও সুবিধা পাচ্ছে, আর একটি ক্ষুদ্র অস্ফুটবাক্ শিশুর নিতান্ত ন্যায্য একটা সাধ অপূর্ণ রয়ে গেল কেন তাই ভাবি।

॥ ১৬ ॥

বৌদিদি ক্রমে সেরে উঠলেন। কিছুদিন পরে আমার হঠাৎ একদিন জ্বর হ'ল। ক্রমে জ্বর বেঁকে দাঁড়াল, আমি অজ্ঞান-অচৈতন্য হয়ে পড়লাম। দিনের পর দিন যায়, জ্বর ছাড়ে না। একুশ দিন কেটে গেল। দিনের রাতের জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছি যেন, কখন রাত কখন দিন বুঝতে পারি নে সব সময়। মাঝে মাঝে চোখ মেলে দেখি বাইরের রোদ একটু একটু ঘরে এসেছে, তখন বুঝি এটা দিন। বিছানার ওপাশটা ক্রমশঃ হয়ে গেল বহুদূরের দেশ, আফ্রিকা কি জাপান, ওখানে পৌঁছনো আমার শরীর ও মনের শক্তির বাইরে। অধিকাংশ সময়ই ঘোর-ঘোর ভাবে কাটে—সে অবস্থায় যেন কত দেশ বেড়াই, কত জায়গায় যাই। যখন যাই তখন যেন আর আমার অসুখ থাকে না, সম্পূর্ণ সুস্থ, আনন্দে মন ভরে ওঠে, রোগশয্যা স্বপ্ন ব'লে মনে হয়। ছেলেবেলাকার সব জায়গাগুলোতে গেলাম যেন, আটঘরার বাড়িও বাদ গেলো না। হঠাৎ ঘোর কেটে যায়, দেখি কুলদা ডাক্তার বুকে নল বসিয়ে পরীক্ষা করছে।

একবার মনে হ'ল দুপুর ঝাঁ-ঝাঁ করছে, আমি দ্বারবাসিনীতে যাচ্ছি খুকীকে কোলে নিয়ে। দুর্গাপুরের ডাঙা পার হয়ে গেলাম, আবার সেই কাঁদোড় নদী, সেই তালবন, রাঙামাটির পথ। মালতী বড় ঘরের দাওয়ায় বসে কি কাজ করছে। উদ্ধবদাস আমায় দেখে চিনলে, কাছে এসে বললে—বাবু যে—কি মনে ক'রে এতদিন পরে? আপনার কোলে ও কে? মালতী কাজ ফেলে মুখ তুলে দেখতে গেল উদ্ধবদাস কার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইছে। তারপর আমায় চিনতে পেরে অবাক ও আড়ষ্ট হয়ে সেইখানেই বসে রইল। আমি এগিয়ে দাওয়ার ধারে গিয়ে বললাম—তুমি কি ভাববে জানিনে মালতী, কিন্তু আমি বড় বিপদে পড়েই এসেছি। এই ছোট খুকী আমার দাদার মেয়ে, এর মা সম্প্রতি মারা গিয়েছে। একে বাঁচিয়ে রাখবার কোন ব্যবস্থা আমার মাথায় আসে নি। আর আমার কেউ নেই—একমাত্র তোমার কথাই মনে হ'ল, তাই একে নিয়ে তোমায় কাছে এসেছি। একে নাও, এর সব ভার আজ থেকে তোমার ওপর। তুমি ছাড়া আর কারও হাতে একে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারব না।

মালতী তাড়াতাড়ি খুকীকে আমার কোল থেকে তুলে নিলে। তারপর আমার রুক্ষ চুল ও উদ্‌ভ্রান্ত চেহারার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। পরক্ষণেই সে দাওয়া থেকে নেমে এসে বললে—আপনি আসুন, উঠে এসে বসুন।

আখড়ায় আর যেন কেউ নেই। উদ্ধবদাসকে আর দেখলাম না। শুধু মালতী আর আমি। ও ঠিক সেই রকমই আছে—সেই হাসি, সেই মুখ, সেই ঘাড় বাঁকিয়ে কথা বলার ভঙ্গি। হেসে বললে—তারপর?

আমি বললাম—তারপর আর কি? এই এলাম।

—এতদিন কোথায় ছিলেন ?

—নানা দেশে। তারপর দাদা মারা গেলেন, আমার ওপরে ওদের সংসারের ভার।

—উঃ, কি নিষ্ঠুর আপনি !

তার পর সে বললে—আপনি বসুন, খুকীর সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা তো করতে হবে। একবার নীরদা-দিদিকে ডাকি।

আমি বললাম—আমি কিন্তু এখনই যাব মালতী। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ফেলে রেখে এসেছি পরের বাড়িতে। আমাকে যেতেই হবে।

মালতী আশ্চর্য্য হয়ে বললে—আজই ?

আমি বললাম—আমার কাজ আমি শেষ করেছি, এখন তুমি যা করবে কর খুকীকে নিয়ে। আমি থেকে কি করব ? আমি যাই।

মালতী স্থিরদৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বলল—আমায় নিয়ে যান তবে।

আমি অবাক হয়ে বললাম—সে কি মালতী ? তুমি যাবে আমার সঙ্গে ? তোমার এই আখড়া ?

মালতীর সঙ্গে যেদিন ছাড়াছাড়ি হয়েছিল, সেদিনটি যেমন ও চোখ নামিয়ে কথা বলেছিল—ঠিক তেমনই ভঙ্গিতে চোখ মাটির দিকে রেখে স্পষ্ট ও দৃঢ় স্বরে বললে—আপনি আমায় নিয়ে চলুন সঙ্গে যেখানে আপনি যাবেন। এবার আপনাকে একলা যেতে দেব না।

একচল্লিশ দিনে জ্বর ছেড়ে গেল। সেরে উঠলে বৌদিদি একদিন বললেন—জ্বরের ঘোরে 'মালতী' 'মালতী' ব'লে ডাকতে কাকে, মালতী কে ঠাকুরপো ?

আমি বললাম—ও একটি মেয়ে। বাদ দাও ও-কথা। রোজ বলতাম ? কত দিন বলেছি ?

এই অসুখ-বিসুখে মাসীমার দেওয়া সেই একশো টাকা তো গেলই, বৌদির গায়ের সামান্য যা দু-একখানা গহনা ছিল তা-ও গেল। নতুন চাকুরিটাও সঙ্গে সঙ্গে গেল।

এখান থেকে তিন ক্রোশ দূরে কামালপুর ব'লে একটা গ্রাম আছে। নিতান্ত পাড়াগাঁ এবং জঙ্গলে ভরা। সেখানকার দু-একজন জানাশোনা ভদ্রলোকের পরামর্শে সেখানে একটা পাঠশালা খুললাম। বৌদিদিদের আপাততঃ কালীগঞ্জে রেখে আমি চলে গেলাম কামালপুরে। একটা বাড়ির বাইরের ঘরে বাসা নিলাম—বাড়ির মালিক চাকুরির স্থানে থাকেন, বাড়িটাতে অনেকদিন কেউ ছিল না। বাড়ির পিছনে একটা আম-কাঁঠালের বাগান।

পাঠশালায় অনেক ছেলে জুটল—কতকগুলি ছোট মেয়েও এল। যা আয় হয়, সংসার একরকমে চলে যায়।

সময় বড় মনের দাগ মুছে দেবার মন্ত্র জানে। আবার নতুন মন, নতুন উৎসাহ পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে জীবনের একটা নতুন অধ্যায় কি রকমে শুরু হ'ল তাই এখানে বলব।

পাঠশালা খুলবার পরে প্রায় দু-বছর কেটে গিয়েছে। ভাদ্র মাস। বেশ শরতের রোদ ফুটেছে। বর্ষার মেঘ আকাশে আর দেখা যায় না। একদিন আমি পাঠশালায় গিয়েছি, একটা ছোট মেয়ে বলছে—মাস্টার মশায়, পেনো হিরণদিদির হাত আঁচড়ে কামড়ে দিয়েছে, ওই দেখুন ওর হাতে রক্ত পড়ছে।

যে মেয়েটির হাত আঁচড়ে দিয়েছে তার নাম হিরণ্ময়ী, বয়স হবে বছর চৌদ্দ, পাঠশালার কাছেই ওদের বাড়ি—কিন্তু মেয়েটি আমার পাঠশালায় ভর্ত্তি হয়েছে বেশী দিন নয়। ওর বাবার নাম কালীনাথ গাঙ্গুলী, তিনি কোথাকার আবাদের নায়েব, সেইখানেই থাকেন, বাড়িতে

খুব কমই আসেন।

আমি লক্ষ্য করেছি এই মেয়েটি সকলের চেয়ে সজীব, বুদ্ধিমন্তী, অত্যন্ত চঞ্চলা। সকলের চেয়ে সে বয়সে বড়, সকলের চেয়ে সভ্য ও শৌখীন। কিন্তু তার একটা দোষ, কেমন একটু উদ্ধত স্বভাবের মেয়ে।

একদিন কি একটা অঙ্ক ওকে দিলাম, সবাইকে দিলাম। ওর অঙ্কটা ভুল গেল। বললাম—তুমি অঙ্কটা ভুল করলে হিরণ?

অঙ্কটা ভুল গিয়েছে শুনে বোধ হয় ওর রাগ হ'ল—আর দেখেছি সব সময়, অপর কারোর সামনে বকুনি খেলে ক্ষেপে ওঠে। খুব সম্ভব সেই জন্তই ও রাগের স্বরে বললে—কোথায় ভুল? কিসের ভুল ব'লে দিন না?

আমি বললাম—কাছে এস, অত দূর থেকে কি দেখিয়ে দেওয়া যায়?

আমি দেখে আসছি যে কদিন ও এসেছে, আমার কাছ থেকে দূরে বসে।

ও উদ্ধতভাবে বললে—কেন ওখান থেকেই বলুন না? আপনার কাছে কেন যাব?

আমার মনে হ'ল ও বড মেয়ে ব'লে আমার কাছে আসতে বোধ হয় সঙ্কোচ অনুভব করে। কিন্তু তার জন্যে ওরকম উদ্ধত স্বর কেন? বললাম—কাছে এসে আঁক দেখে নিতে দোষ আছে কিছু?

ও বললে—সে-সব কথার কি দরকার আছে? আপনি দিন অঙ্ক ওখান থেকেই বুঝিয়ে।

রাগে ও বিরক্তিতে আমার মন ভ'রে উঠল। আচ্ছা মেয়ে তো? মাস্টারদের সঙ্গে কথাবার্ত্তার এই কি ধরন? আর আমায় যখন এত অবিশ্বাস তখন আমার স্কুলে না এলেই তো হয়? সেদিন আমি ওর সঙ্গে আর কোন কথাই বললাম না। পরদিনও তাই, স্কুলে এল, নিজে ব'সে ব'সে কি লিখলে বই দেখে, একটা কথাও কইলাম না। ছুটির কিছু আগে আমায় বললে—আমার ইংরিজিটা একবার ধরুন না?

আমি ওর পড়াটা নিয়ে তারপর শান্তভাবে বললাম—হিরণ, তোমার বাড়িতে ব'লো, আমি তোমাকে পড়াতে পারব না। অন্য অবস্থা করতে ব'লো কাল থেকে।

হিরণ্ময়ীর মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল, বললে—কেন?

আমি বললাম—না—তুমি বড় মেয়ে, এখানে তোমার সুবিধে হবে না।

ও বললে—রাগ করছেন নাকি? কি করেছি আমি?

আমি বললাম—কাল তোমার ও-কথাটা কি আমায় বলা উচিত হয়েছে, হিরণ? কি ব'লে তুমি বললে, আপনার কাছে কেন যাব?···ওখান থেকেই বলুন না? তুমি আমার কাছে তবে পড়তে এসেছ কেন?

হিরণ্ময়ী হেসে বললে—এই! তা কি এমন বলেছি আমি? তা যখন আপনি বলছেন দোষ হয়েছে বলাতে, তখন দোষ নিশ্চয়ই হয়েছে।

—কেন তুমি বললে ও রকম? তোমার দুঃখিত হওয়া উচিত ও কথা বলার জন্যে, তা জান?

হিরণ্ময়ী বললে—হাঁ, হয়েছি। হ'ল তো? এখন নিন।

তারপর যখন ওর অঙ্ক দেখছি, তখন হঠাৎ আমার মুখের দিকে কেমন একটা বুঝতে না পারার দৃষ্টিতে চেয়ে বললে—উঃ, আপনার এত রাগ?···আগে তো কখনও রাগ দেখি নি এরকম?···তখনও সে আমার মুখের দিকে সেইরকম দৃষ্টিতে চেয়ে কি যেন বুঝবার চেষ্টা করছে। ওর রকম-সকম দেখে আমি হাসি চাপতে পারলাম না—সঙ্গে সঙ্গে সেই মুহূর্ত্তে হিরণ্ময়ীকে নতুন চোখে দেখলাম। দেখলাম হিরণ্ময়ী অত্যন্ত লাবণ্যময়ী, ওর চোখ দুটি অত্যন্ত

ডাগর, টানা-টানা জোড়া ভুরু ছুটি কালো সরু রেখার মত, কপালের গড়ন ভারী সুন্দর, চাঁচা, ছোট, অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি। মাথায় একরাশ ঘন কালো চুল।

ও তখনও আমার দিকে সেই ভাবেই চেয়ে আছে। এক মিনিটের ব্যাপারও নয় সবটা মিলে।

পরদিন থেকে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করলাম, হিরণ্ময়ী আমার কাছ থেকে তত দূরে আর বসে না—আর না ডাকলেও কাছে এসে দাঁড়ায়।

একদিন আমায় বললে—জানেন মাস্টার মশায়, আমার সব দল এরা—আমায় এরা ভয় করে।

অবাক্ হয়ে বললুম—কারা?

হাত দিয়ে পাঠশালার সব ছাত্রছাত্রীদের দেখিয়ে দিয়ে বললে—এরা। আমার কথা না শুনে কেউ চলতে পারে না।

—ভয় করে কেন?

—এমনি করে। আমি যা বলব ওদের শুনতেই হবে।

পাঠশালার সকলেরই ওপর সে হুকুম ও প্রভুত্ব চালায়, এটা এতদিন আমার চোখে পড়ে নি—সেদিন থেকে সেটা লক্ষ্য করলাম। তবে পেনো যে সেদিন ওর হাত আঁচড়ে দিয়েছিল সে আলাদা কথা। দেশের রাজার বিরুদ্ধেও তো তাঁর প্রজারা বিদ্রোহী হয়!

রোজ রাত্রে বাসায় এসে সন্ধ্যাবেলা পরোটা গড়ি। দু-একদিন পরে সন্ধ্যাবেলা ময়দা মাখছি একা রান্নাঘরে বসে, সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার বেশী নয়, একটা হ্যারিকেন-লণ্ঠন জ্বলছে ঘরে। কার পায়ের শব্দে মুখ তুলে দেখি ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে হিরণ্ময়ী। শশব্যস্তে উঠে বিস্মিত মুখে বললাম—হিরণ! এস, এস, কি মনে ক'রে?

হিরণ্ময়ীর একটা স্বভাব গোড়া থেকে লক্ষ্য করেছি, কখনই প্রশ্নের ঠিক জবাবটি দেবে না। আমার কথার কোন উত্তর না দিয়ে বললে—ময়দা মাখেন বুঝি নিজে রোজ? ওই বুঝি ময়দা মাখা হচ্ছে?

আমি বিপন্ন হয়ে পড়লুম—চোদ্দ বছরের মেয়েকে পাড়াগাঁয়ে বড়ই বলে। আমার কাছে এ রকম অবস্থায় আসাটা কি ঠিক হ'ল ওর? এসব জায়গার গতিক আমি জানি তো।

বললাম—তুমি যাও হিরণ, পড় গে।

হিরণ্ময়ী হেসে বললে—তাড়িয়ে দিচ্ছেন কেন? আমি যাব না—এই বসলাম।

বেজায় একগুঁয়ে মেয়ে, আমি তো জানি ওকে। বললে—একটা অঙ্ক কষে দেবেন? না—থাক, একটা গল্প বলুন না!···ও, আপনি বুঝি ময়দা মাখবেন এখন! সরুন, সরুন দিকি। আমি মেখে বেলে দিচ্ছি। কি হবে, রুটি না লুচি?···আপনি এই পিঁড়িটাতে বসে শুধু গল্প করুন।

সেই থেকে হিরণ্ময়ীর রোজ সন্ধ্যাবেলা আমাকে সাহায্য করতে আসা চাই-ই। মৃদু প্রদীপের আলোতে হাসি-হাসি মুখে সে তার খাতাখানা খুলে নামে অঙ্ক কষে—কাজে কিন্তু সে আমার রুটি-পরোটা তৈরী ক'রে দেয়। কিছুতেই আমার বারণ শোনে না—ওর সঙ্গে পারব না ব'লে আমিও কিছু আর বলি নে। ওর মায়ের বারণও শোনে না, একদিন কথাটা আমার কানে গেল।

শুনলাম একদিন মাকে বলছে ওদের বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে—কেন, যাই তাই কি? আমি অঙ্ক কষতে যাই। বেশ করি—যাও।

হিরণ্ময়ীকে বললাম—শোন হিরণ, আমার এখানে সন্ধ্যাবেলা আর এস না, যখন তোমার মা বকেন। মার কথাটা অন্ততঃ তোমার মানা উচিত। বুঝলে ?

পরদিন হিরণ্ময়ী সত্যিই আর এল না। আমার সন্ধ্যাটা কেমন যেন ফাঁকা হয়ে গিয়েছে ওর না আসাতে, সেদিন প্রথম লক্ষ্য করলাম। সাত-আট দিন কেটে গেল—হিরণ্ময়ী পাঠশালাতে রোজই আসে। তাকে জিজ্ঞাসা করি না অবিশ্যি কেন সে সন্ধ্যাবেলা আসে না।

একদিন সে পাঠশালাতেও এল না। দু-তিন দিন পরে জিজ্ঞেস ক'রে জানলাম সে মামার বাড়ি গিয়েছে তার মায়ের সঙ্গে।

দেখে আশ্চর্য্য হলাম যে আমার পাঠশালা আর সে পাঠশালা নেই—আমার সন্ধ্যাও আর কাটে না। হিরণের বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে ওর মামার বাড়ি থেকে, মেয়ে দেখাতে নিয়ে গিয়েছে—বরপক্ষ ওখানে মেয়েকে আশীর্ব্বাদ করবে।

মানুষের মন কি অদ্ভুত ধরনের বিচিত্র! হঠাৎ কথাটা শুনেই মনে হ'ল ও গাঁয়ের পাঠশালা উঠিয়ে দেব, অন্যত্র চেষ্টা দেখতে হবে। কেন, যখন প্রথম পাঠশালা খুলেছিলাম এ গাঁয়ে, তখন তো হিরণের অপেক্ষায় এখানে আসি নি, তবে সে থাকলো বা গেল—আমার তাতে কি আসে যায় ?

মাসখানেক কেটে গিয়েছে। আমি কলের মত কাজ করে যাই, একদিন সামান্য একটু বাদলা মত হয়েছে—পাঠশালার ছুটি দিয়ে সকাল-সকাল রান্না সেরে নেব ব'লে রান্নাঘরে ঢুকেছি, বেলা তখনও আছে। এমন সময় দোরের কাছে দেখি হিরণ্ময়ী এসে হাসি-হাসি মুখে দাঁড়িয়েছে। আমি বিস্ময়মিশ্রিত খুশীর সুরে ব'লে উঠলাম—এস, এস হিরণ,—কখন এলে তুমি ? ব'সো।

হিরণ্ময়ী বললে—কেমন আছেন আপনি ? তার পর সে এগিয়ে এসে সলজ্জ আড়ষ্টতার সঙ্গে ঝপ্‌ ক'রে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম ক'রে আবার সোজা হয়ে দোরের কাছে দাঁড়ালো।

আমি এত খুশী হয়েছি তখন, ওকে কি বলবো ভেবে পাইনে যেন। বললাম—ব'সো হিরণ, দাঁড়িয়ে কেন ?

হিরণ্ময়ী বোধ হয় একটু সঙ্কোচের সঙ্গেই এসেছিল, আমি ওর আসাটা কি চোখে দেখি—এ নিয়ে। আমার কথা শুনে—হাজার হোক নিতান্ত ছেলেমানুষ তো—ও যেন ভরসা পেল। ঘরের মধ্যে ঢুকে একটা পিঁড়ি পেতে বসল। আমার মুখের দিয়ে চেয়ে বললে—কি সেই শিখিয়ে দিলেন, 'নয় পরিত্যাগ-প্রণালী' না কি ? সব ভুলে গিয়েছি—হি-হি—

দেখলাম ওর বিয়ে হয় নি।—ওকে আর কোন কথা বলি নি অবিশ্যি তা নিয়ে। দেনা-পাওনার ব্যাপার নিয়ে সে-সম্বন্ধ ভেঙে গিয়েছে—দু-চার দিনে অপরের মুখে শুনলাম। আবার হিরণ্ময়ী আমার পাঠশালাতে নিত্য আসে যায়—সন্ধ্যাবেলাতেও রোজ আসে—ঝড় হোক, বৃষ্টি হোক, তার সন্ধ্যায় আসা কামাই যাবে না। কেন তার মা এবার তাকে বকেন না—সে কথা আমি জানি নে—তবে বকেন না যে, এটা আমি জানি।

বরং একদিন হিরণ্ময়ী বললে—আজ আলো জ্বেলে একটা বই পড়ছি, মা বললে আজ যে তুই তোর মাস্টারের কাছে গেলিনে বড় ? তাই এলুম মাস্টার মশায়।

আমি বললাম—তা বেশ তো, গল্পের বই পড়লেই পারতে। মা না ব'লে দিলে তো আজ আসতে না ?

কথাটা বলতে গিয়ে নিজের অলক্ষিতে একটা অভিমানের সুর বার হয়ে গেল—হিরণ্ময়ী

সেটা বুঝতে পেরেছে অমনি। এমন বুদ্ধিমতী মেয়ে এইটুকু বয়সে! বললে—নিন্, আর রাগ করে না। ভেবে দেখুন, আপনি না আমায় এখানে এলে তাড়িয়ে দিতেন আগে আগে?

দুঃখিত ভাবে বললাম—ছিঃ, ও-কথা ব'লো না হিরণ, তাড়িয়ে আবার তোমায় দিয়েছি কবে? ও-কথাতে আমার মনে কষ্ট দেওয়া হয়।

হিরণ্ময়ী মুখে কাপড় দিয়ে খিল্ খিল্ ক'রে উচ্ছ্বসিত ছেলেমানুষি হাসির বন্যা এনে দিলে। ঘাড় দুলিয়ে দুলিয়ে বলতে লাগল—না—মা দেন নি? বটে? একদিন—সেই—তাড়ালেন না! আজ আবার বলা হচ্ছে—। পরে আমার সুরের নকল করতে চেষ্টা করে—'ওতে আমার মনে কষ্ট দেওয়া হয়'—কি মানুষ আপনি! হি-হি-হি-হি—

আমি মুগ্ধদৃষ্টিতে ওর হাসিতে উদ্ভাসিত সুকুমার লাবণ্যভরা মুখের দিকে চেয়ে রইলাম—চোখ ফেরাতে পারি নে—কি অপূর্ব্ব হাসি! কি অপূর্ব্ব চোখমুখের শ্রী!

যখন চোখ নামিয়ে নিলাম তখন সে আমার বেলুনটা তুলে নিয়ে রুটি বেলতে ব'সে গিয়েছে। সেদিন ও যখন চলে যায়, ঝোঁকের মাথায় অগ্রপশ্চাৎ না ভেবেই ওকে আবার বললাম—এ রকম আর এস না, হিরণ। না, সত্যি বলছি তুমি আর এস না।

মনকে খুব দৃঢ় ক'রে নিয়ে কথাটা ব'লে ফেলেই ওর মুখের দিকে চেয়ে আমার বুকের মধ্যে যেন একটা তীক্ষ্ণ তীর খচ্ করে বিঁধলো। দেখলাম ও বুঝতে পারে নি আমি কেন একথা বলছি—কি বোধ হয় দোষ করে ফেলেছে ভেবে ওর মুখ বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে উদ্বেগ ও ভয়ে।

আমার মুখের দিকে একটুখানি চেয়ে রইল—যদি মুখের ভাবে কারণ কিছু বুঝতে পারে। না বুঝতে পেরে যাবার সময় দেখলাম শুষ্ক বিবর্ণ মুখে বললে—আমায় তাড়িয়ে দিলেন তো? এই দেখুন—তাড়ালেন কি না।

দুঃখে আমার বুক কেটে যেতে লাগল। নিমগাছটার তলা দিয়ে ও ওই যাচ্ছে, এখনও বেশী দূর যায় নি, ডেকে দুটো মিষ্টি কথা বলব? ছেলেমানুষকে একটু সান্ত্বনা দেব?

ডাকলুম শেষটা না পেরে।—শোনো ও হিরণ—শোনো—

ও দাঁড়াল না—শুনেও শুনলে না। হন্ হন্ ক'রে হেঁটে বাড়ি চলে গেল। পরদিন খুব সকালে উঠে বারান্দাতে ব'সে ব্রাউনিঙের A Soul's Tragedy পড়ছি—হিরণ এসে দাঁড়িয়ে বললে—কি কচ্ছেন?

—এস এস হিরণ। কাল তোমাকে ডাকলাম রাত্রে, এলে না কেন? তুমি বড় একগুঁয়ে মেয়ে—একবার শোনা উচিত ছিল না কি বলছি?

মুখরা বালিকা তখন নিজমূর্ত্তি ধরলে। বললে—আমি কি কুকুর নাকি, দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দেবেন, আবার তু ক'রে ডাকলেই ছুটে আসব? আপনি বুঝি মনে ভাবেন আমার শরীরে ঘেন্না নেই, অপমান নেই—না? আমি বলতে এলাম সকালবেলা যে আপনার পাঠশালায় আমি পড়তে আসব না।—মা অনেক দিন আগেই বারণ করেছিল—তবুও আসতাম, তাদের কথা না শুনে। কিন্তু যখন আপনি কুকুর-শেয়ালের মত দূর ক'রে তাড়িয়ে—

ওর চোখে জল ছাপিয়ে এসেছে—অথচ কি তেজ ও দর্পের সঙ্গে কথাগুলো সে বললে! আমি বাধা দিয়ে বললাম—আমায় ভুল বুঝো না, ছিঃ হিরণ—আচ্ছা, চেঁচিও না বেশী, কেউ শুনলে কি ভাববে। আমার কথা শোন—রাগ করে না, ছিঃ।

হিরণ দাঁড়াল না এক মুহূর্ত্তও। অতটুকু মেয়ের রাগ দেখে যেমন কৌতুক হ'ল, মনে তেমনই অত্যন্ত কষ্টও হ'ল। কেন মিথ্যে ওর মনে কষ্ট দিয়েছি কাল? আহা, বেচারী বড় দুঃখ ও আঘাত পেয়েছে। আমার জ্ঞান আর হবে কবে? ছেলেমানুষকে ও-কথাটা ও-ভাবে

বলা আমার আদৌ উচিত হয় নি।

মন অত্যন্ত খারাপ হয়ে গেল—ভাবলাম, এ গ্রামের পাঠশালা তুলে দিয়ে অন্যত্র যাবই। এদিকে হিরণ্ময়ীও আর আমার পাঠশালাতে আসে না। মাসের বাকি আটটা দিন পড়িয়ে নিয়ে পাঠশালা তুলে দেব ঠিক ক'রে ফেললাম। সবাইকে বলেও রাখলাম কথাটা। আগে থেকে যাতে সবাই অন্য ব্যবস্থা ক'রে নিতে পারে।

যাবার দু-দিন আগে জিনিসপত্র গোছাচ্ছি—হঠাৎ হিরণ্ময়ী নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে এসে কখন দাঁড়িয়েছে। মুখ তুলে ওর দিকে চাইতেই হেসে ফেললে। বললে—আপনি নাকি চলে যাবেন এখান থেকে?

আমি বললাম—যাবই তো। তার পর, এত দিন পরে কি মনে করে?

হিরণ্ময়ী তার অভ্যাসমত আমার প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে বললে—কবে যাবেন?

—বুধবার বিকেলে গাড়ি ঠিক করা আছে, চাকদাতে গিয়ে উঠবো।

হিরণ্ময়ী একবার ঘরের চারিধারে চেয়ে দেখলে। বললে—আপনার সে বড় বাক্সটা কই?

সেটা কানুর বাবার কাছে বিক্রী ক'রে ফেলে দিয়েছি। অত বড় বাক্স কি হবে, তা ছাড়া সঙ্গে টেনে টেনে নিয়ে বেড়ানোও মুশকিল।

হঠাৎ হিরণ্ময়ী ঝপ্ ক'রে মেজেতে বসে পড়ল—কর্তৃত্ব ও আত্মপ্রত্যয়ের সুরে বললে—না, আপনি যেতে পারবেন না। দেখি দিকি কেমন যান?

আমার হাসি পেল ওর রকম দেখে। খুব আনন্দও হ'ল—একটা অদ্ভুত ধরনের আনন্দ হ'ল। বললাম—তোমার তাতে কি, আমি যাই আর না-যাই? তুমি তো আর এতদিন উঁকি মেরেও দেখতে আস নি হিরণ, তুমি আমার পাঠশালা পর্যন্ত যাওয়া ছেড়েছ।

—ইস্! তাই বই কি?

—তুমি ভেবে দেখ তাই কি না। উড়িয়ে দিলে চলবে না হিরণ, আমি যাবই ঠিক করেছি, তুমি আমায় আটকাতে পারবে না। কারুর জন্যে কারুর আটকায় না—এ তুমি নিজেই আমায় একদিন বলেছিলে।

হিরণ্ময়ী বালিকাসুলভ হাসিতে ঘর ভরিয়ে ফেলে বললে—ওই! কথা যদি একবার শুরু ক'রে দিলেন তো কি আর আপনার মুখের বিরাম আছে? কারুর জন্যে কারুর আটকায় না, হেন না তেন না—মাগো—কথার ঝুড়ি একেবারে!

—সে যাই হোক, আমি যাবই।

—কক্‌খনো না। ইঃ, বললেই হ'ল যাব!

আমি চুপ করে রইলাম—ছেলেমানুষের সঙ্গে তর্ক করে লাভ কি?

দেখি যে বিকেলে পাঠশালায় হিরণ্ময়ী বইখাতা নিয়ে হাজির হয়েছে। সে এসে সব ছেলেমেয়েকে বলে দিলে আমার পাঠশালা উঠবে না, আমি কোথাও যাব না, সবাই যেন ঠিকমত আসে। এমন সুরে বললে যে সে যেন আমার দণ্ডমুণ্ডের মালিক। বললে—এই হাঁদু, মাস্টার মশায় তোমায় বলেছিলেন না ধারাপাত আনতে—কেন আন নি ধারাপাত? এই সোমবারের হাট থেকে আনতে ব'লে দেবে। বুঝলে?

হাঁদু বোকার মত দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে বললে—মাস্টার মশাই যে সোমবারে চলে যাবেন এখান থেকে।

হিরণ্ময়ী তাকে এক তাড়া দিয়ে বললে—কে বলেছে চলে যাবেন? মেরে হাড় ভেঙে দেব ছোঁড়ার! যা যা বলছি তা শোন্। বাঁদর কোথাকার—

আমি বললাম—কেন ওকে মিথ্যে বকছ হিরণ, ছেলেমানুষকে—ওর দোষ কি, আমি যাবই, কেউ আমাকে আটকাতে পারবে না।

হিরণ্ময়ী ঝঙ্কার দিয়ে বললে—আচ্ছা আচ্ছা হবে। যাবেন তো যাবেন।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা অনেকদিন পরে ও রান্নাঘরে এসে ঢুকল। বললে—গুড়ের ভাঁড়টা কই!

—সেটা তিনকড়িদের দিয়ে দিইছি। দু-দিনের মত খানিকটা গুড় ওই বাটিতে রেখেছি—দুটো দিন ওতেই চলে যাবে।

হিরণ্ময়ী অন্য দিনের মত বসল না, দাঁড়িয়ে রইল। একবার বাইরে যাবার সময় ও সরে দরজার কপাটের আর দেওয়ালের মধ্যের যে জায়গাটুকু, সেখানটাতে দেখি জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বলতে গেলাম—ওখানে না, ওখানে না,—কাপড়ে কালিটালি লেগে যাবে কি না—বার হয়ে এস—

ওর মুখের দিকে চেয়ে দেখি ওর ডাগর চোখ দুটি জলে ভ'রে টল্ টল্ করছে। হিরণ্ময়ীর চোখে জল! অবাক্, এ দৃশ্য তো কখনও দেখি নি! ও জল-ভরা ধরা-গলায় বললে—আপনি বলুন, যাবেন না মাস্টার মশায়। আমি তখন পাঠশালায় বলতে পারলাম না ওদের সামনে। ওরা হাসবে তাহ'লে। আর কেউ নয়—আর সবাই আমায় ভয় করে, কেবল ওই মণ্টুটা বড় দুষ্টু!

তারপর আমার দিকে চোখের জল আর হাসি-মিশানো এক অপূর্ব্ব দৃষ্টিতে চেয়ে বললে—যাবেন না, কেমন?

হিরণ্ময়ী এই প্রথম দুর্ব্বলতা প্রকাশ করলে—এর আগে কখনও দেখি নি। ছেলেমানুষ, ও কথা তো তেমন জানে না, কিন্তু ওর ডাগর সজল চোখের মিনতিপূর্ণ দৃষ্টি ওর ভাষার দৈন্য ঘুচিয়ে দিয়ে এমন কিছু প্রকাশ করলে—এক জাহাজ কথাতে তা প্রকাশ করা যেত না।

আমার মনে অনুতাপ হ'ল—কেন ওকে মিথ্যে কাঁদালাম সন্ধ্যাবেলাটিতে?

জীবনের এই-সব মুহূর্ত্তেই না মানুষে ভগবানকে প্রত্যক্ষ করে? ব্রাউনিঙের 'পলিন্' কবিতার সেই সর্ব্বহারা লোকটির মত আমার মনও ব'লে উঠল :—I believe in God and Truth and Love!…

ওর হাতটি ধ'রে দরজার কপাটের ফাঁক থেকে বার ক'রে এনে আস্তে আস্তে পিঁড়ির ওপর বসিয়ে দিয়ে বললাম—ওখানে সন্ধ্যাবেলা দাঁড়াতে নেই। বিছেটিছে বেরুতে পারে—এখানে বোস। রুটিগুলো বেলে দাও দিকি, লক্ষ্মী মেয়ে। আমি যাব না—বলছ তুমি যখন, তখন আর যাব না। চোখের জল ফেলতে আছে অবেলায়? ছিঃ—

তার পরই রুটি তৈরী করতে ব'সে যে হিরণ্ময়ী সেই হিরণ্ময়ী—সেই মুখরা বালিকা, যে সকল কথা এমন কর্ত্তৃত্বের সুরে বলে যেন ওর কথা না মেনে চললে ও ভয়ঙ্কর একটা কিছু শাস্তির ব্যবস্থা করবে, সেটা আবার খুব কৌতুকপ্রদ এবং ভেবে দেখলে করুণ বলেই মনে হয়, যখন বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে যে মুখের বুলিটুকু ছাড়া ওর হুকুমের পেছনে ওর কোন জোর খাটাবার নেই—নিতান্ত অসহায় ও নিরুপায়।

প্রেম আসে এই সব সামান্য তুচ্ছ খুঁটিনাটি সূত্র ধ'রে। বড় বড় ঘটনাকে এড়ানো সহজ, কিন্তু এই সব ছোট জিনিস প্রাণে গেঁথে থাকে—ফলুই মাছের সরু চুল-চুল কাঁটার মত। গায়ের জোরে সে কাঁটা তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিতে গেলে, বিপদের সম্ভাবনা বাড়ে বই কমে না।

পুরুষমানুষ প্রেমের ব্যাপারে আত্মরক্ষা ক'রে চলতে পারে না যেটা অনেক সময় মেয়েরা পারে। যেখানে যা হবার নয়, পাবার নয়, সেখানেও তারা বোকার মত ধরা দিয়ে বসে থাকে—

এবং নাকাল তার জন্যে যথেষ্ট হয়। কিন্তু পুরুষমানুষই আবার বেগতিক বুঝলে যত সত্বর হাবুডুবু খেতে খেতেও সাঁতরে তীরের কাছে আসতে পারে—মেয়েরা গভীর জলে একবার গিয়ে পড়লে অত সহজে নিজেদের সামলে নিতে পারে না।

তবুও আমি হিরণ্ময়ীকে দূরে রাখবার চেষ্টাই করলাম।

একদিন দুপুরের পরে হিরণ্ময়ীদের বাড়িতে পুলিস এসেছে শুনলাম। পুলিস কিসের? একে ওকে জিজ্ঞেস করি কেউ সঠিক উত্তর দেয় না অথচ মনে হ'ল ব্যাপারটা সবাই জানে। এগিয়ে গেলুম—ওদের বাড়ির সামনের তেঁতুলতলায় বড় দারোগা চেয়ার পেতে ব'সে—পাড়ার লোকদের সাক্ষ্য নেওয়া চলেছে। দেখলাম গ্রামে ওদের মিত্র বড় কেউ নেই। আমি আগেও যে একথা না জানতাম এমন নয়—তবে পাড়াগাঁয়ের কানাঘুষোতে কান দিই নি।

বিকেলের দিকে হিরণ্ময়ীর মা আর বিধবা দিদিকে থানায় ধ'রে নিয়ে গেল। কাছারির মুহুরী সাতকড়ি মুখুয্যে আমার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। সে বললে—ও মেয়েটার তত দোষ দিই নে—মা-ই যত নষ্টের গুরুমশাই। ওই তো ওকে শিখিয়েছে। নইলে মেয়েটার সাধ্যি কি,—কিন্তু মাগী কি ডাকাত! মেয়েটার প্রাণের আশঙ্কা করলি নে একবারও?

ব্যাপারটা বুঝতে আমার দেরি হ'ল না। সাতকড়ি আরও বলল—কালীনাথ গাঙ্গুলী কি গ্রাম ত্যাগ করেছে সাধে? এইজন্যেই সে বাড়িমুখো হয় না, ওদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখে না।

এত কথা আমি কিন্তু জানতাম না—এই নতুন শুনলাম। আমি মুশকিলে পড়ে গেলাম—আমি এখন কি করি? হিরণ্ময়ীর মা আর দিদি দোষী কি দোষী নয়—সে বিচারের ভার আছে অন্য বিচারকের ওপর—সাতকড়ি মুখুয্যের ওপর নয়। কিন্তু এদের মোকদ্দমা উঠলে উকীল নিযুক্ত কে করে, এদের স্বার্থ বা কে দেখে, এদের জন্যে পয়সা খরচই বা কে করে?

এদিকে আর এক মুশকিল। ওর মা আর দিদিকে যখন ধ'রে নিয়ে গেল, হিরণ্ময়ী তখন ওদের বাড়ির সামনে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে। সামনে অন্ধকার রাত, সেরাত্রে সে একাই বা বাড়িতে থাকে কেমন ক'রে, বাড়িতে আর যখন কেউই নেই—অথচ সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কেউ তাকে নিজের বাড়িতে ডাকলে না। সন্ধ্যার সময় ও-পাড়ার কৈলাস মজুমদারের স্ত্রী এসে ওকে ও-অবস্থায় দেখে বললেন—ওমা, এ মেয়েটা এখানে একা দাঁড়িয়ে আছে যে! ছেলেমানুষ, বাড়িতে একা থাকবেই বা কি ক'রে? ওর মা দিদি কি করেছে জানি নে—কিন্তু ওকে আমি চিনি। ও পাগলী, আনন্দময়ী। এস তো মা হিরণ, তোমাদের হারিকেনটা বাড়ির ভিতর থেকে নিয়ে ঘরে চাবি দিয়ে এস। ওকে জায়গা দিলে যদি জাত না থাকে—তবে না থাকল তেমন জাত!

মজুমদার-গিন্নী যদি কোন কথা না ব'লে নিঃশব্দে হিরণ্ময়ীকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যেতেন তবে হয়ত কোনই গোলযোগ বাধতো না—কিন্তু শেষের কথাটি ব'লে ফেলে তিনি নিতান্ত নির্ব্বোধের মত কাজ ক'রে বসলেন। কাছেই গ্রামের সমাজপতি আচার্য্যি-মশায়ের বাড়ি। তাদের সঙ্গে বাধল তুমুল ঝগড়া। শশধর আচার্য্যের স্ত্রী অনেকক্ষণ নিজের মনে একতরফা গেয়ে যাবার পর উপসংহারে বললেন—ও বড় ভাল মেয়ে—না? মুখ খুললেই অনেক কথা বেরিয়ে পড়বে। সব জানি, সব বুঝি। চুপ করে থাকি মুখ বুজে—বলি মাথার ওপর একজন আছেন, তিনিই দেখবেন সব—আমি কেন বলতে যাই?

মজুমদার-গিন্নী বললেন—যা কর ন-বৌ, আবার এ মেয়েটার নামে কেন যা তা বলছ? সেটাই কি ভগবান সইবেন?

আচার্য্যি-মশায়ের স্ত্রী বারুদের মত জ্বলে উঠলেন—আরও দ্বিগুণ চেঁচিয়ে বললেন—ধর্ম্ম

দেখিও না বলে দিচ্ছি, ভাল হবে না। ওই রয়েছে মুখুয্যেরা, ভট্‌চায্যিরা, জিজ্ঞেস কর গিয়ে। ওই মেয়ে ওই পাঠশালার মাস্টার-ছোকরার কাছে রাত বারোটা অব্‌ধি কাটিয়ে আসে—রোজ তিনশ তিরিশ দিন। সারা রাত্তিরও থাকে এক এক দিন। বলুক ও মেয়েই বলুক, সত্যি না মিথ্যে। ভেবেছিলুম কিছু বলব না—মরুক গে, যার আঁস্তাকুড়, সেই গিয়ে ঘাঁটুক, না ব'লে পারলাম না। কে ও মেয়েকে ঘরে জায়গা দিয়ে কালকে আবার একটা হাঙ্গামা বাধাতে যাবে?

আমি এতক্ষণ চুপ ক'রে ছিলুম, কথা বলি নি—কোন পুরুষমানুষ উপস্থিত ছিল না ব'লে। চেঁচামেচি শুনে আচার্যি-মশায়, সাতকড়ি ও সনাতন রায় ঘটনাস্থলে এসে দাঁড়াতেই আমি এগিয়ে গিয়ে বললুম—আপনারা আমার মায়ের মত—আপনাদের কাছে একটা অনুরোধ, হিরণকে এ ঝগড়ার মধ্যে মিথ্যে আনবেন না। ও আমার ছাত্রী, ছেলেমানুষ, আমার কাছে যায় সন্ধ্যেবেলা গল্প শুনতে—কোনদিন পড়েও। রাত নটা বাজতেই চলে আসে। একটা নিষ্পাপ নিরপরাধ মেয়ের নাম এ-সবের সঙ্গে না জড়ানোই ভাল। মা, আপনি ওকে বাড়িতে নিয়ে যান।

এতে ফল হ'ল উল্‌টো। ঝগড়া না থেমে বরং বেড়ে উঠল। মজুমদার মশায়ের দুই ছেলে ও ছোট ভাই এসে মজুমদার-গিন্নীকে বকাবকি করতে লাগল—তিনি কেন ওপাড়া থেকে এসে এই-সব ছেঁড়া ল্যাঠার মধ্যে নিজেকে জড়াতে যান? এ বয়সেও তাঁর জ্ঞান যদি না হয় তবে আর কবে হবে···তিনি চলে আসুন বাড়ি। এ-পাড়ার ব্যবস্থা এ-পাড়ার লোকে বুঝবে, তিনি কেন মাথাব্যথা করতে যান—ইত্যাদি।

যাকে নিয়ে এত গোলমাল, সে ভয়ে ও লজ্জায় কাঠ হয়ে দাঁড়িয়েই আছে ওদের বাড়ির সদর দরজায়। ওর চোখে একটা দিশেহারা ভাব, লজ্জার চেয়ে চোখের চাউনিতে ভয়ের চিহ্নই বেশী। ওর সেই কথাটা মনে পড়ল—জানেন মাস্টার মশায়, আমায় সবাই ভয় করে, সবাই মানে এ পাড়ায়—আমার সঙ্গে লাগতে এলে দেখিয়ে দেব না মজা?

বেচারী মুখরা হিরণ্ময়ী!

শেষ পর্য্যন্ত কৈলাস মজুমদারের স্ত্রী ওকে না নিয়েই চলে গেলেন। তাঁর দেওর ও ছেলেরা একরকম জোর করেই তাঁকে সরিয়ে নিয়ে গেল।

আমি তখন এগিয়ে গিয়ে বললুম—হিরণ, তুমি কিছু ভেবো না। আমি এতক্ষণ দেখছিলাম এরা কি করে। যে ভয়ে তোমাকে ডাকতে পারি নি, সে ভয় আমার কেটে গিয়েছে। তুমি একটু একলা থাক—আমি কাওরাপাড়া থেকে মোহিনী কাওরাণীকে ডেকে আনছি। সে তোমার ঘরের বারান্দাতে শোবে রাত্রে। তাহ'লে তোমার রাত্রে একা থাকবার সমস্যা মিটে গেল। আর এক কথা—তুমি রান্না চড়িয়ে দাও; চাল-ডাল সব আছে তো?

কাওরাপাড়া থেকে ফিরে আসতে আধ ঘণ্টার বেশী লাগল। মোহিনী বুড়ীকে চার আনা পয়সা দিয়ে রাত্রে হিরণদের বাড়িতে শোবার জন্য রাজী করিয়ে এলুম। ফিরে এসে দেখি দালানের চৌকাঠে বসে হিরণ্ময়ী হাপুস নয়নে কাঁদছে। অনেক ক'রে বোঝালুম। বড় কষ্ট হ'ল ওকে এ অবস্থায় দেখে। বললে—মার আর দিদির কি হবে মাস্টার মশায়? আপনি কালই বাবাকে একটা চিঠি লিখে দিন। ওদের ফাঁসি হবে না তো?

হেসে সান্ত্বনা দিলাম। বললাম—রাঁধ হিরণ। খাওয়াদাওয়া কর। কিছু ভেবো না—আমি কাল রাণাঘাট যাব। ভাল উকীল দিয়ে জামিনে খালাস ক'রে নিয়ে আসবার চেষ্টা করব, ভয় কি?

হিরণ কিছুতেই রাঁধতে চায় না—শেষে বললে—আপনিও এখানে খাবেন কিন্তু। ঠিক

তো ?

ও রাঁধছে ব'সে, আমাকে রান্নাঘরেই বসে থাকতে হ'ল—ও যেতে দেয় না, ছেলেমানুষ, ভয় করে। কেবল জিজ্ঞেস করে, মা আর দিদির কি হবে!

রান্না হয়ে গেল, ঠাঁই ক'রে আমায় ভাত বেড়ে দিলে। এদিকে হিরণ বড় অগোছালো, কুটনো-বাটনা, এঁটো-কাঁটা, ভাতের ফেন, আনাজের খোসাতে রান্নাঘর এমন নোংরা ক'রে তুলেছে! ভাত বাড়তে গিয়ে উনুনের পাড়ে আঁচল লুটিয়ে পড়েছে—নিতান্ত আনাড়ি।

বললাম—দিনমানে কোন রকমে একা থেকো। আমি সন্ধ্যের আগেই রাণাঘাট থেকে ফিরবো। রেঁধে খেও কিন্তু। না হ'লে বড় রাগ করব।

মোহিনী কাওরাণী এল রাত ন'টার পরে। তার পরে আমি আমার বাসায় চলে এলুম।

পরদিন রাণাঘাটে গিয়ে দেখি কেস্ ওঠে নি আদালতে। উকীল ঠিক ক'রে তার সঙ্গে জামিনের কথাবার্ত্তা ব'লে এলুম। ফিরবার সময় হিরণ্ময়ীর জন্যে দু-একটা জিনিস কিনে নিলুম ওকে একটু আনন্দ দেবার জন্যে। ফিরে দেখি ও ব'সে ব'সে আবার কাঁদছে কালকের মত। সারাদিন বোধ হয় রাঁধে নি, কিছু খায় নি। স্নানও করে নি, দু-এক গাছা রুক্ষ চুল মুখের আশেপাশে উড়ছে। মহা বিপদে প'ড়ে গেলুম ওকে নিয়ে। কি করি এখন ? ওর বাবাকে আজ রাণাঘাটে পৌঁছেই টেলিগ্রাম করেছি, যদি তা পেয়ে থাকেন, তবে কাল তিনি এসে পৌঁছলেও তো বাঁচি। নইলে হিরণ্ময়ীকে ভাবছি কালীগঞ্জে বৌদিদির কাছে রেখে আসব। কারণ, এসে শুনলুম মোহিনী বুড়ী ব'লে গিয়েছে সে রাত্রে এখানে আর শুতে আসতে পারবে না।

ও আমায় দেখেই ছুটে এসে বললে—মাকে দিদিকে দেখে এলেন মাস্টার মশাই ? তারা কেমন আছে ? খালাস পেলে না ?

আমি ওদের নিজে দেখতে যাই নি, উকীলের মুখে হিরণ্ময়ীর সংবাদ পাঠিয়ে বলেছিলুম হিরণ্ময়ীর জন্যে যেন তারা কিছু না ভাবে। বললাম সেকথা।

তার পর হিরণ্ময়ী আমাকে বালতি ক'রে জল তুলে দিলে স্নানের জন্যে—ঘরে প্রদীপ জ্বেলে উনুন ধরিয়ে চায়ের জল চড়ালে। রাণাঘাট থেকে ওর জন্যে কিছু খাবার এনেছিলুম, তার বেশী অর্দ্ধেক আমায় রেকাবি ক'রে চায়ের সঙ্গে জোর ক'রে খাওয়ালে—তার পর রান্না চাপিয়ে দিলে। ওর মনে সুখ নেই, কেমন যেন মুষড়ে পড়েচে, ছেলেমানুষ, নইলে ওর মত হাস্যময়ী আনন্দময়ী চঞ্চলা মেয়ে এতক্ষণ কত কথা বলত, হাসি-খুশীতে ঘর ভরিয়ে তুলত।

একবার জিজ্ঞেস করলে—রাণাঘাটে নাকি সার্কাস এসেছে সবাই বলে ? দেখেছেন আপনি ? এত দুঃখের মধ্যেও ওর ছেলেমানুষি মন সার্কাসের সম্বন্ধে কৌতূহলী না হয়ে পারে নি ভেবে আমার হাসি পেল।

এ রাত্রে মোহিনী বুড়ী এল না—আমি ওকে ঘরের মধ্যে রেখে বাইরের বারান্দাতে শুয়ে রইলাম। বারান্দায় বিছানা পাতছি, ও আবার এত সরলা নিষ্কলুষ—আমায় অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলে, আপনি বাইরে শোবেন কেন ?

কোন নীতিবাদের সঙ্কোচ এনে ফেলে ওর নিষ্পাপ মনে দাগ দিতে আমার বাধল। বললাম —দেখছ না কি রকম গরম আজ ? বাইরে শোওয়াই আমার অভ্যেস, তা ছাড়া—।

সারারাত দু-জনে গল্প ক'রে কাটালুম। ও ঘর থেকে কথা বলে, আমি বারান্দা থেকে তার উত্তর দিই।—বাবা বোধ হয় কাল আসবেন, না ? মা, দিদি কবে আসবে ? সার্কাসওয়ালা কোথায় তাঁবু ফেলেছে ? কলকাতায় কখনও যাই নি—একবার যাবার ইচ্ছে আছে। কলকাতার থিয়েটার দেখতে কেমন ? চৌধুরীরা বোধ হয় মোহিনী বুড়ীকে বারণ ক'রে দিয়েছে এখানে

আসতে। আমার শীত করছে কিনা। রাত বেশী, ঠাণ্ডা পড়েছে, গায়ে দেবার একটা মোটা চাদর দেবো? আরব্য-উপন্যাসের মত গল্প আর নেই। আচ্ছা, অঙ্ক কতদূর শেখা যায়? বিস্তার শেষ নেই—না? এম-এ পাস করে আরও পড়া যায়, পড়বার আছে?

ওর বাবা এলেন পরদিন সকাল দশটার সময়। তাঁর মুখে শুনলুম পুলিস থেকে তাঁকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছে শীঘ্র বাড়ি এসে মেয়ের ভার নিতে। তিনি অত্যন্ত বদ্‌মেজাজী লোক, দু-একটা কথা শুনেই বুঝতে দেরি হ'ল না। আমার ওপর আদৌ তিনি প্রসন্ন হ'তে পারলেন না—তাঁর মেয়ের তত্ত্বাবধান করার জন্যে একটা ধন্যবাদ দেওয়া তো দূরের কথা, সেটাকেই তিনি আমার একটা অপরাধ ব'লে গণ্য ক'রে নিলেন এবং যে মুখুয্যে ও চৌধুরীরা পরশু সন্ধ্যেবেলা হিরণ্ময়ীকে বাড়িতে জায়গা দিতে চায় নি, তাদেরই বাড়িতে খোশামোদ ক'রে তাদের সঙ্গে এ বিপদে পরামর্শ চাইতে গেলেন।

আরও একটা ব্যাপার দেখলুম, তিনি হিরণ্ময়ীকে আদৌ দেখতে পারেন না। আমার সামনেই তো তাকে তাড়না, তর্জ্জন-গর্জ্জন যথেষ্ট করলেন এ নিয়ে যে সেরাত্রে চৌধুরী-গিন্নীর পায়ে পড়ে কেন অনুরোধ করে নি তাকে জায়গা দেবার জন্যে। কারণ, তারা দেখলুম লাগিয়েছে যে তাদের কি আর ইচ্ছে ছিল না ওকে জায়গা দেবার? ও মেয়ের তা ইচ্ছে নয়। হিরণের অপরাধ সে মুখ ফুটে কারও কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে নি। এ ওরা বুঝল না যে হিরণের বয়সের মেয়েরা মুখে কোন নাটুকে-ধরনের কথা বলে আশ্রয় চাইতে পারে না পরের কাছে—বিশেষ ক'রে হিরণ্ময়ীর মত একটু তেজী মেয়েরা।

আমি হিরণ্ময়ীর ভার থেকে মুক্ত হয়ে কালীগঞ্জে চলে এলুম পরদিন সকালেই। শুনেছিলুম হিরণ্ময়ীর মা ও দিদি রাণাঘাট থেকে প্রমাণাভাবে খালাস পেয়ে এসেছেন।

কালীগঞ্জে এসে বসলুম বটে, কিন্তু বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলুম, মনের কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হয়েছে। হিরণ্ময়ীর সেই শুকনো মুখখানা কেবলই মনে পড়ে, সেদিন সন্ধ্যার সময় ওর যে মুখ দেখেছিলাম, যেদিন ওর মাকে আর দিদিকে থানায় নিয়ে গেল। হিরণ্ময়ীর ব্যথা,… হিরণ্ময়ীর দুঃখ,…ওই রকম বাড়িতে, ওই গাঁয়ের আবহাওয়ায় হিরণ্ময়ীর মত মেয়ে শুকিয়ে ঝরে পড়বে। কে-ই বা দেখবে, বুঝবে ওকে? একদিন মালতীর সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাই ভাবতুম। কত ভেবেছি। এখন বুঝি কি দুর্জ্জয় অভিমান করেই চলে এসেছিলাম ওর কাছ থেকে! কিছুতেই সে অভিমান ভাঙলো না। তার পর দাদা মারা গেলেন, দাদার সংসার পড়ল ঘাড়ে, নইলে হয়ত আবার এতদিনে ফিরে যেতাম। কিন্তু বৌদিদিদের নিয়ে তো দ্বারবাসিনীর আখড়াতে গিয়ে উঠতে পারি নে? একসময় যার ভাবনায় কত বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছি বটেশ্বরনাথ পাহাড়ে, সেই মালতী এখন আমার মনে ক্রমশঃ অস্পষ্ট হয়ে আসছে—হয়ে এসেছে। আর তো তাকে চোখে দেখলুম না? ক্রমে তাই সে দূরে গিয়ে পড়ল। কি করব, মনের ওপর জোর নেই—নইলে আমি কি বুঝতে পারি নে কত বড় ট্র্যাজেডি এটা মানুষের জীবনের? শ্রীরামপুরের ছোট-বৌঠাকরুণ আজ কোথায়? কে বলবে কেন এমন হয়!

॥ ১৭ ॥

একদিন আবার হিরণ্ময়ীকে দেখবার ইচ্ছে হ'ল। তখন মাস দুই কেটে গিয়েছে, কামালপুরে আর যাই নি, সেখানে আমার বাসায় জিনিসপত্র এখনও রয়েছে—সেগুলো আনবার ছুতো

করেই গেলুম সেখানে। মাস দুই পরে, গ্রাম ঠাণ্ডা হয়েছে, কেবল শুনলুম হিরণ্ময়ীরা একঘরে হয়ে আছে। হিরণ্ময়ী আগের মতই ছুটে এল আমি এসেছি শুনে। এখানে ওর চরিত্রের একটা দিক আমার চোখে পড়ল—লোকে কি বলবে এ ভয় ও করে না—এখানে মালতীর সঙ্গে ওর মিল আছে। কিন্তু মালতীর সঙ্গে ওর তফাৎও আমি বুঝতে পারি। হিরণ্ময়ী যেখানে যাবে, সেখানে পেছন ফিরে আর চায় না—মালতীর নানা পিছুটান। সবাই সমান ভালো-বাসতেও পারে না। প্রেমের ক্ষেত্রেও প্রতিভার প্রয়োজন আছে। খুব বড় শিল্পী, কি খুব বড় গায়ক যেমন পথেঘাটে মেলে না—খুব বড় প্রেমিক বা প্রেমিকাও তেমনি পথেঘাটে মেলে না। ও প্রতিভা যে যে-কোন বড় সৃজনী-প্রতিভার মতই দুর্লভ। এ কথা সবাই জানে না, তাই যার কাছে যা পাবার নয়, তার কাছে তাই আশা করতে গিয়ে পদে পদে ঘা খায় আর ভাবে অন্য সবারই ভাগ্যে ঠিকমত জুটছে, সে-ই কেবল বঞ্চিত হয়ে রইল জীবনে। নয়ত ভাবে তার রূপগুণ কম, তাই তেমন ক'রে বাঁধতে পারে নি।

হিরণ্ময়ীর তনুলতায় প্রথম যৌবনের মঞ্জরী দেখা দিয়েছে। হঠাৎ যেন বেড়ে উঠেছে এই দু মাসের মধ্যে। আমায় বললে—কখন এলেন? আসুন আমাদের বাড়িতে। মা বলে দিলেন আপনাকে ডেকে নিয়ে যেতে। কতদিনের ছুটি দিয়েছিলেন পাঠশালাতে, দেড় মাস পরে খুললো?

—ভাল আছ হিরণ? উঃ, মাথায় কত বেড়ে গিয়েছ?

—এতদিন কোথায় ছিলেন? বেশ তো লোক। সেই গেলেন আর আসবার নামটি নেই?

হয়ত দু-বছর আগেও এ কথা কেউ বললে বেদনাতুর হয়ে ভাবতাম, আহা, দ্বারবাসিনীতে ফিরলে মালতীও আমায় এরকম বলত। কিন্তু সময়ের বিচিত্র লীলা। এ সম্পর্কে মালতীর কথা আমার মনেই এল না।

দু-দিন কামালপুরে রইলাম। হিরণ্ময়ী একথা ভাবে নি যে, আমি আমার জিনিসপত্র আনতে গিয়েছি ওখানে, সে ভেবেছিল আমি আবার পাঠশালা খুলব। ওখানেই থাকব। এবার কিন্তু সে আসবার সময় তর্ক, ঝগড়া করলে না, যেমন ক'রে থাকে। শুধু শুকনো মুখে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল আমার যাওয়া। ওর সে আগেকার ছেলেমানুষি যেন চলে গিয়ে একটু অন্য রকম হয়েছে। তবুও কত অনুরোধ করলে ওখানে থাকবার জন্যে—গাঁ এখন ভাল হয়ে গিয়েছে, কেন আমি যাচ্ছি, গাঁয়ের ছেলেরা তবে পড়বে কোথায়?

কামালপুর গাঁ পিছু ফেলেছি, মাঠের রাস্তা, গরুর গাড়ি আস্তে আস্তে চলেছে। কি মন খারাপ যে হয়ে গেল! মাঠের মধ্যে কচি মটর-শাক, খেঁসারি-শাকের শ্যামল সৌন্দর্য্য, শিরীষগাছের কাঁচা শুঁটি ঝুলছে। বাসুদেবপুরের মরগাঙের ভাগাড়ে নতুন ঘাসের ওপর গরুর দল চ'রে বেড়াচ্ছে। হিরণ্ময়ীর নিরাশার দৃষ্টি বুকে যেন কোথায় বিঁধে রয়েছে, খচ্ খচ্ ক'রে বাজছে। বেলা যায়-যায়, চাকদার বাজার থেকে গুড়ের গাড়ির সারি ফিরছে, বোধ হয় বেলে কি চুয়াডাঙ্গার বাজারে রাত কাটাবে। জীবনটা কি যেন হয়ে গেল, এক ভাবি আর হয় এক, কোথায় চলেছি আমিই জানি নে। কেনই বা অপরের মনে এত কষ্ট দিই? এই রাঙা রোদমাখানো মটর-মুসুরির মাঠ যেন বটেশ্বরনাথের দিনগুলোর কথা মনে করিয়ে দেয়। এই সন্ধ্যায় গঙ্গার বুকে বড় বড় পাল তুলে নৌকোর সারি মুঙ্গেরের দিকে যেত, আমি মালতীর স্বপ্নে বিভোর হয়ে পাষাণ-বাঁধানো ঘাটের ওপর বসে বসে অন্যমনস্ক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখতুম। সব মিথ্যে, সব স্বপ্ন। ঐ মরগাঙের ওপারে জমা সন্ধ্যার কুয়াশার মত—ফাঁকা, দু-দিনের জিনিস। এখানে ফল পাকে না। জেরুসালেম পাথরের দেশ।

এর কিছুদিন পরে হিরণ্ময়ীর বাবা আমার কাছে এলেন কালীগঞ্জে। আমায় একবার তাঁদের ওখানে যেতে হবে, হিরণ্ময়ী বিশেষ ক'রে বলে দিয়েছে। আর একটা কথা, মেয়ের বিয়ে নিয়ে তিনি বড় বিপদে পড়েছেন। তিনি গরীব, অবস্থা আমি সবই জানি, গ্রামের সমাজে একঘরেও বটে। দু-তিন জায়গা থেকে সম্বন্ধ এসেছিল, নানা কানাঘুষো শুনে তারা পেছিয়ে গিয়েছে। মেয়েও বেজায় একগুঁয়ে, তাকে দেখতে আসছে শুনলেই সে বাড়ি থেকে পালায়। অত বড় মেয়ে, এখনও জ্ঞান-কাণ্ড হ'ল না, চিরকাল কি ছেলেমানুষি করলে মানায়? সুতরাং তিনি বড় বিপদে পড়েছেন, আমি যদি ব্রাহ্মণের এ দায় উদ্ধার না করি তবে তিনি, কালীকান্ত গাঙ্গুলী, সম্পূর্ণ নিরুপায়। আমার কি মত?

আমি আর কিছুই ভাবলাম না, ভাবলাম কেবল হিরণ্ময়ীর আশাভাঙা চোখের চাউনি আর তার শুকনো মুখ, সেদিন যখন জিনিসপত্র বাঁধছি সেই সময়কারের।

একদিন হিরণ্ময়ী বললে—একটা কথা শোন। যেদিন তুমি প্রথম পাঠশালাতে পড়াতে এলে, আমি তোমার কাছে গেলাম, সেদিন থেকে তোমায় দেখে আমার কেমন লজ্জা করত। সেই জন্যে কাছে বসতে চাইতাম না। তার পর তুমি একদিন রাগ করলে, তাতে আমারও খুব রাগ হ'ল। তুমি তার পর বললে—আমাদের গাঁ ছেড়ে চলে যাবে। সেদিন ভয়ে আমার প্রাণ উড়ে গেল। এত কান্না আসতে লাগল, কান্না চাপতে পারি নে, পাছে কেউ টের পায়, ছুটে পেছনের সজ্‌নেতলায় চলে গেলাম। সব যেন ফাঁকা হয়ে গেল মনের মধ্যে। উঃ মাগো, সে যে কি দিন গিয়েছে!

হিরণ্ময়ী গুছিয়ে কথা বলতে শেখে নি এখনও।

ভগবান জানেন বিয়ের সময় কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলুম। সপ্তসমুদ্র পারের কোন্ দেশে অনেক দূরে এই সব সন্ধ্যার অস্পষ্ট অন্ধকারে একটি হাস্যমুখী তন্বী কিশোরী প্রদীপ হাতে ভাঙা বিষ্ণুমন্দিরে সন্ধ্যা দেখাতে যেত কত যুগ আগে···পুকুরপাড়ের তমালবনের আড়ালে তার সঙ্গে সেই যে সব কত সুখ-দুঃখের কাহিনী, কত ঠাকুর-দেবতার কথা, সে সব সত্যি ঘটেছিল, না স্বপ্ন? কোথায় গেল সে মেয়েটি? আর তাকে তেমন ক'রে তো চাই না? যেন কত দূর-জন্মে তার সঙ্গে সে পরিচয়ের দিনগুলো কালের কুয়াশায় অস্পষ্ট হয়ে এসেছে—তাকে যেন চিনি, চিনি, চিনি না। কেন তার স্মৃতিতে মন আর নেচে ওঠে না? কোথায় গেল সে-সব দিন, সে-সব প্রদীপ-দেখানো সন্ধ্যা?

বছরখানেক পরে একদিন রাণাঘাট স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছি। মুর্শিদাবাদের ট্রেন থেকে অনেকগুলো বৈষ্ণব নামলো। তারা যাবে খুলনার গাড়িতে। তাদের মধ্যে একজনকে পরিচিত ব'লে মনে হ'ল। কাছে গিয়ে দেখি দ্বারবাসিনীর আখড়ার সেই নরহরি বৈরাগী—যে একবার জীবগোস্বামীর পদাবলী গেয়েছিল। সে পয়লা নম্বরের ভবঘুরে, মাঝে মাঝে আখড়ায় আসত, আবার কোথায় চলে যেত। নরহরিও আমায় চিনলে, প্রণাম ক'রে বললে—এখানে কোথায় বাবু? এটা কি দেশ নাকি? আপনি তো অনেক দিন দ্বারবাসিনী যান নি? আর যাবেনই বা কি, সব শুনেছেন বোধ হয়, আখড়া আর সে আখড়া নেই। দিদিঠাকরুণ মারা যাওয়ার পরে—

—কে?

—কেন আপনি জানেন না? মালতী দিদিঠাকরুণ তো আজ বছর চারেক মারা গিয়েছেন।

আমি ওর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলুম। নরহরি আপন মনেই ব'লে যেতে লাগল—এখন উদ্ধবদাসের এক ভাইপো তার সেবাদাসী নিয়ে কোথা থেকে এসে জুটেছে। সে-ই এখন কর্ত্তা। উদ্ধবদাস তো বুড়ো হয়েছে, সে কিছু দেখে-শোনে না। এখন অতিথি-বোষ্টম গেলে আর জায়গা হয় না। মালতী দিদিঠাকরুণ তো মানুষ ছিলেন না, স্বর্গের দেবী ছিলেন, কি বাপের মেয়ে! তিনি স্বর্গে চ'লে গিয়েছেন, এখন তাঁর অত সাধের আখড়ার কি দশা হয়েছে এই চার বছরে, দেখে চোখে জল আসে বাবু। তাই বড়-একটা সেখানে যাই নে।

ওরা চলে গেলে আমি স্টেশনের বাইরে সেগুনবাগানে গিয়ে কতক্ষণ ব'সে রইলাম। কতক্ষণ···কতক্ষণ। হিসেব ক'রে দেখলাম আমি যখন বটেশ্বরনাথ পাহাড়ে তখনই সে মারা গিয়েছে। অর্থাৎ আমি আখড়া ছেড়ে আসবার এক বছর পরেই।

আজ হঠাৎ মনে হ'ল তার ওপর কি সুবিচার করেছিলুম? অভিমান ভাঙবার সুযোগও তাকে আর একবার দিই নি। আমার জীবনে সে মরে গিয়েছে অনেক দিন, যদিও খবরটা আজ পেলাম! আমার মন অলক্ষিতে আত্মরক্ষা করেছে, বেদনার স্থানে শক্ত আবরণ গড়ে তুলেছে—শামুক যেমন আত্মরক্ষার জন্যে খোলা তৈরি করে। আজ সে খোলা হয়ে পড়েছে শক্ত অনুভূতিহীন—অন্ততঃ এতদিন তাই ভাবতাম। কিন্তু খোলার আবরণের তলায় ব্যথার জায়গাটা আজ মনে হচ্ছে একেবারে সম্পূর্ণরূপে সারে নি।

কে আজ উত্তর দেবে—আমি চলে এলে গোপনে একটুখানি চোখের জলও কি ফেলে নি সে কোনদিন? বিষ্ণুমন্দিরে প্রদীপ দিতে গিয়ে কখনো একদিনও কি অন্যমনস্ক হয় নি? দিনের কাজ মিটে গেলে সে যখন 'পাষণ্ড-দলনের অনুকরণে' বই লেখবার উদ্দেশ্যে নিয়ে তার সেই খাতাখানা খুলে বসত, একদিনও কি আমার কথা মনে পড়ে নি?···কত ঠাট্টা যে করতুম তার সেই বই লেখা নিয়ে! আমার যদি আজ দশ হাজার টাকা থাকত, আমি চাইলেই সব টাকাই দিয়ে দিতে পারতাম, যদি এই খবরগুলো আমায় কেউ দিতে পারতো। টাকার মায়া করতুম না—করি নি কোনদিন। এই খবরের বদলে আমি কি না দিতে পারি!

পাগলের মত কি ভাবছি যা'তা বসে! লাভ কি আজ এ-সব ভাবনার? ভালই হয়েছে মালতী, তোমার সঙ্গে আর আমার দেখা হয় নি। সুন্দর জ্যোৎস্নারাতে পল্লীপ্রান্তের বনে মবুচে-লতায় ফুল ফোটে, সুবাসে পথচারীদের মন আনন্দে ভরিয়ে তোলে কিন্তু কতদিন তার আয়ু? জ্যোৎস্না লুকিয়ে আঁধার পক্ষ নামে, বনফুল ঝরে যায়, পুষ্পসুরভি হিমের রাত্রির ঘন কুয়াশায় চাপা পড়ে, নয়ত অকাল বর্ষার বারিধারায় ধুয়ে মুছে যায়। মানুষের অনেক সেবা তুমি করেছিলে, মানুষের মনে তোমার রূপ ভগবান ম্লান হ'তে দিলেন না। ফুলের সুবাস চলে গেলে বনলতা পাছে অনাদৃতা হয়! তোমার বেলা ভগবান তা সহ্য করবেন না।

সেগুনবাগান থেকে উঠে এলুম, তখন রাত হয়ে গিয়েছে।

একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ল। একবার মালতীকে বলেছিলুম—আমাদের গাঁয়ে একটা হাতভাঙা বিষ্ণুমূর্ত্তি আছে। ছেলেবেলায় তাঁকে বড় ভালবাসতুম। ভগবান যদি দিন দেন, তাঁকে নিয়ে এসে তোমার বাবার মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করব।

দেখতে দেখতে কত দিন হয়ে গেল।

তার পর সাত-আট বছর কেটে গিয়েছে।···

আমার সে অল্প বয়সের ভবঘুরে জীবনের পূর্ণচ্ছেদ পড়েছে অনেক দিন। তবু সে-সব

দিনের ছন্নছাড়া মুহূর্ত্তগুলোর জন্যে এখনও মাঝে মাঝে মন কেমন ক'রে ওঠে, যদিও এখন বুঝেছি হারানো-বসন্তের জন্যে আক্ষেপ ক'রে কোন লাভ নেই। মহাকালের বীথিপথ অনাগত দিনের শত বসন্তের পাখির কাকলীতে মুখর, যা পেলুম তাই সত্য, আবার পাব, আবার ফুরিয়ে যাবে··· তার চলমান রূপের মধ্যেই তার সার্থকতা।

মালতীও চলে গিয়েছে কত দিন হ'ল, পৃথিবী ছেড়ে কোন্ প্রেমের লোকে, নক্ষত্রদের দেশে, নক্ষত্রদের মতই বয়সহীন হয়ে গিয়েছে।

কেবল মাঝে মাঝে গভীর ঘুমের মধ্যে তার সঙ্গে দেখা হয়। সে যেন মাথার শিয়রে ব'সে থাকে। ঘুমের মধ্যেই শুনি, সে গাইছে :—

মুক্ত আমার প্রাণের মাঠে
ধেনু চরায় রাখাল কিশোর
প্রিয়জনে লয় সে হরি
ননী খায় সে ননীচোর।

সেই আমার প্রিয় গানটা···যা ওর মুখে শুনতে ভালবাসতুম।

চোখোচোখি হ'লেই হাসি হাসি মুখে পুরনো দিনের মত তার সেই ছেলেমানুষি ভঙ্গিতে ঘাড় দুলিয়ে বলছে—পালিয়ে এসে যে বড় লুকিয়ে আছো? আখড়ার কত কাজ বাকী আছে মনে নেই?

তখন আমার মনে হয় ওকে আমি খুব কাছে পেয়েছি। দ্বারবাসিনীর পুকুরপাড়ের কাঞ্চনফুল-তলার দিনগুলোতে তাকে যেমনটি পেতুম, তার চেয়েও কাছে। গভীর সুষুপ্তির মধ্যেই তন্দ্রাঘোরে বলি—সব মনে আছে, ভুলি নি মালতী। তোমার ব্যথা দিয়ে, ব্যর্থতা দিয়ে তুমি আমাকে জয় করেছ। সে কি ভোলবার?